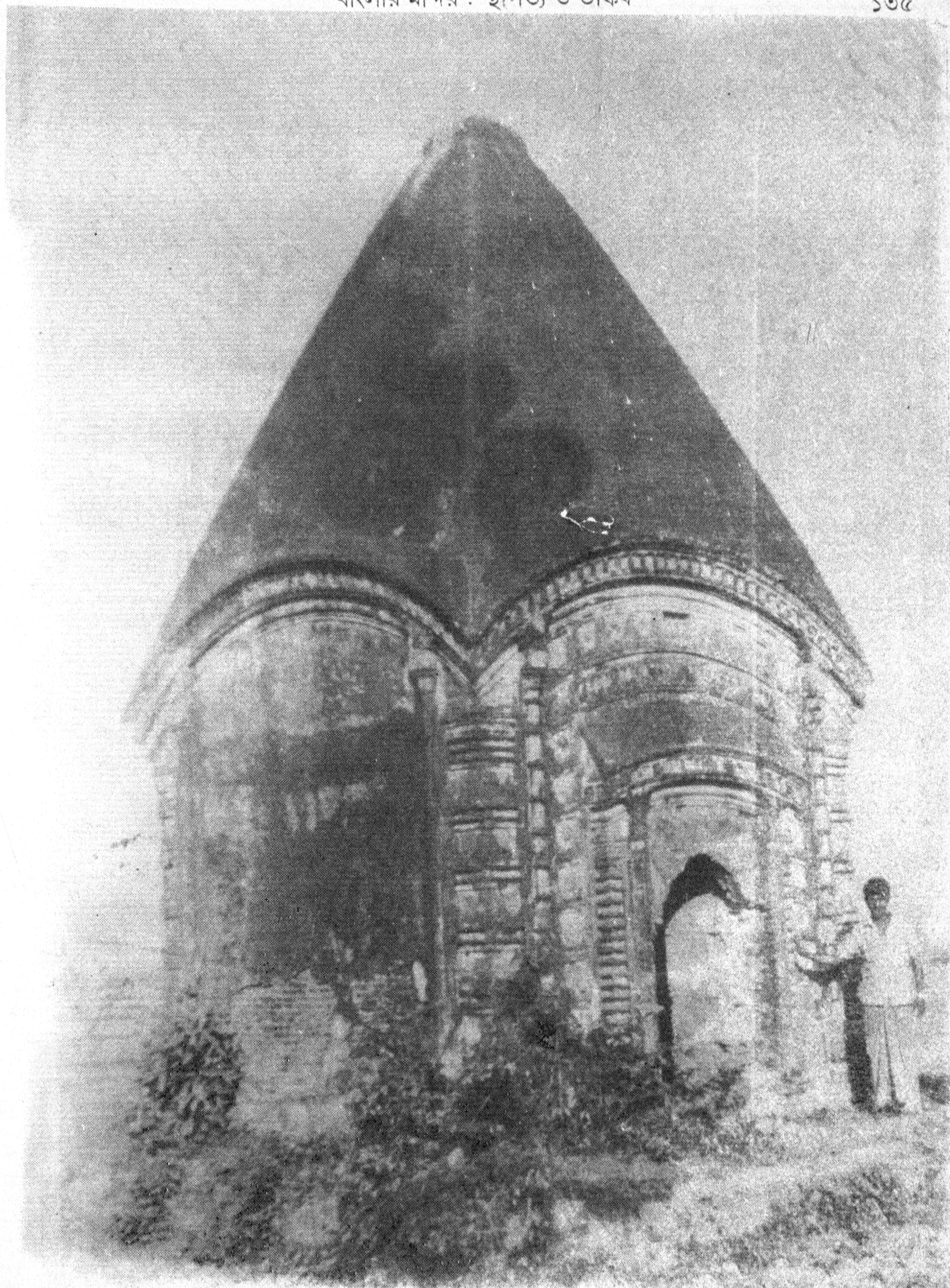
বাংলার মন্দির

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

প্রণব রায়

পূ র্বা দ্রি প্র কা শ নী
তমলুক, মেদিনীপুর



শিবের 'চারচালা' (পরিত্যক্ত, খ্রী ১৮ শতকের শেষ),
বড়নগর (মুর্শিদাবাদ)

Banglar Mandir : Sthapatya O Bhaskarya, Part I & Part II

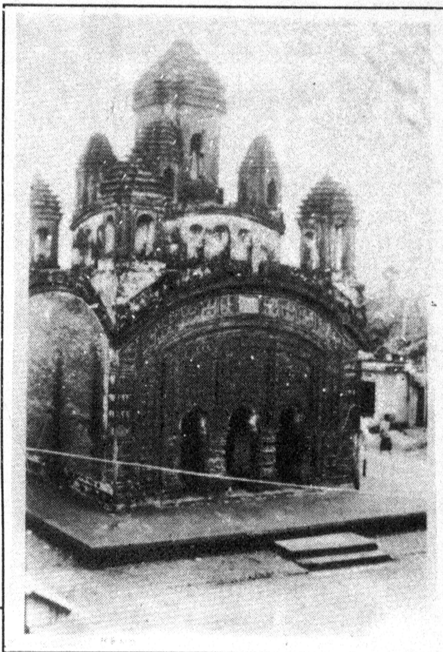
প্রথম প্রকাশ : ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৯, বইমেলা

প্রকাশক : ইন্দুভূষণ অধিকারী
পূর্বাদ্রি প্রকাশনী
তমলুক, মেদিনীপুর

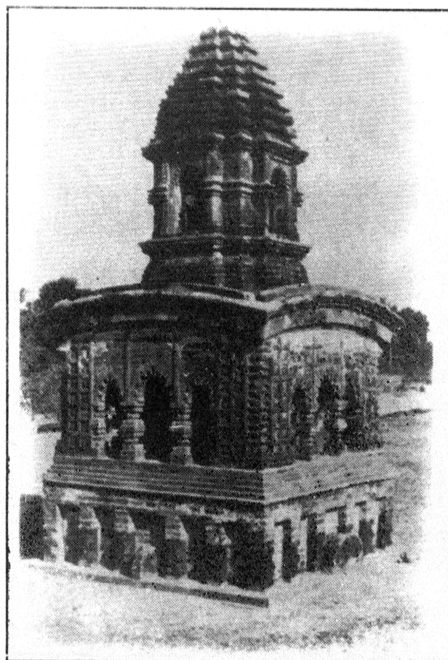
প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

লেজার কম্পোজিং : ইম্প্রেশন
তমলুক, মেদিনীপুর

মুদ্রাকর : ইউরেকা
৯১/এ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা - ৯

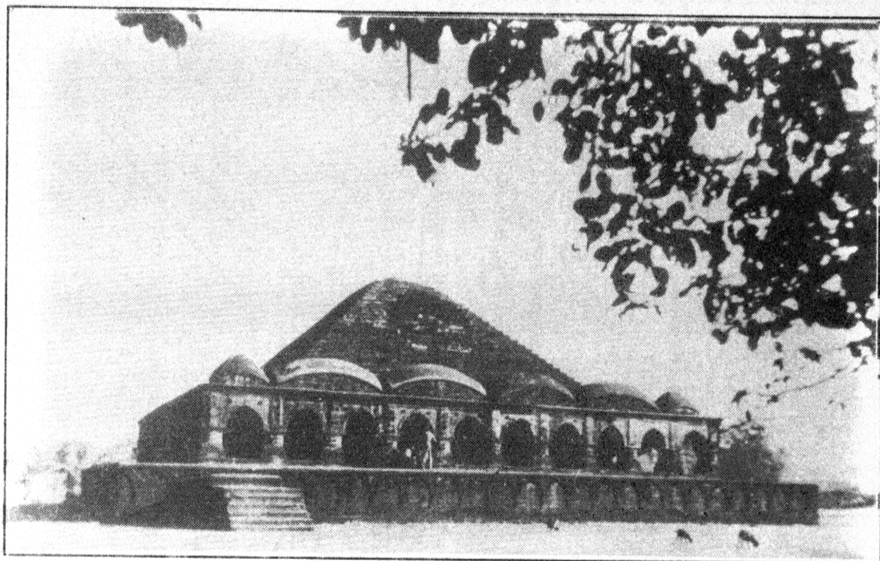


রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' (আ: ১৬৮৩-১৬৯২),
জয়দেব-কেঁদুলি (বীরভূম)

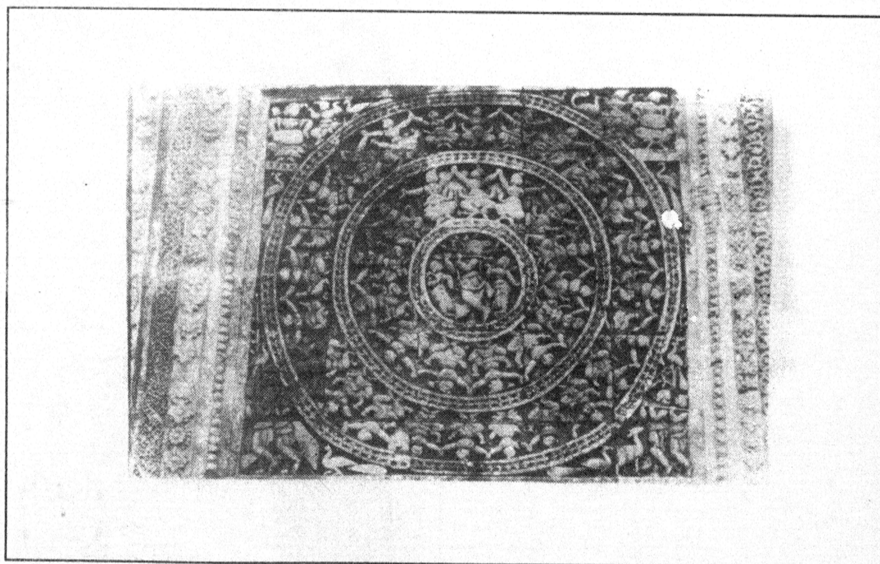


ইঁটের 'একরত্ন' রথ (আ: খ্রী ১৮ শতকের মধ্যভাগ),
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)

পূজ্যপাদ পিতৃদেব
পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ
ও
পূজনীয়া মাতা সুধা দেবী স্মরণে



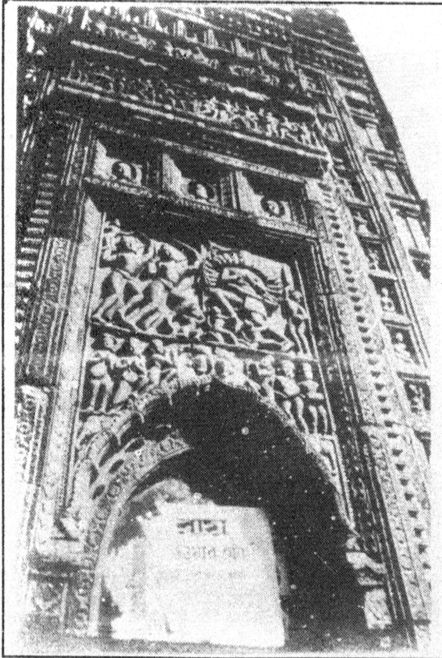
রাসমঞ্চ (আ: ১৬০০ খ্রী)
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)



রাসমণ্ডলচক্র, শ্যামরায়-'পঞ্চরত্ন' মন্দির (১৬৪৩ খ্রী)
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)



সিদ্ধেশ্বর শিবের দেউল (প্রাক্-মুসলিম যুগ),
বহুলাড়া (বাঁকুড়া)



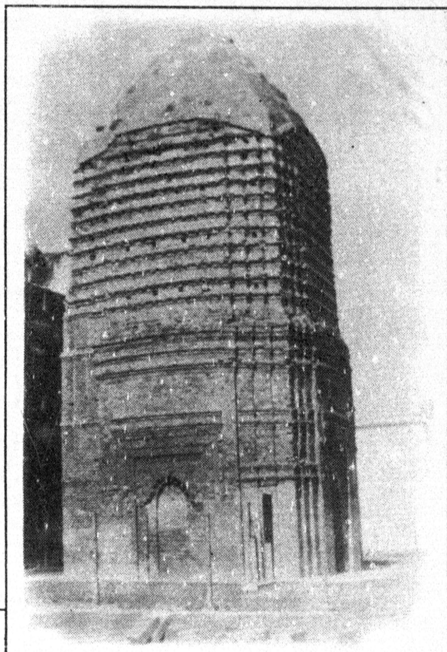
শিবের দেউলের টেরাকোটা,
বনপাস (বর্ধমান)

বিষয়সূচি

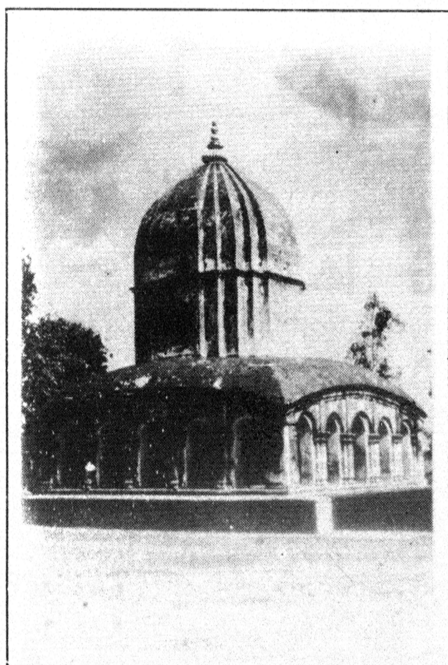
পৃষ্ঠা



বক্রেশ্বর শিবের দেউল (আ: খ্রী ১৭ শতক),
বক্রেশ্বর (বীরভূম)



শ্রীকৃষ্ণের দেউল (১৫৯৮ খ্রী),
বৈদ্যপুর (বর্ধমান)



কালঞ্জয় শিবের 'একরত্ন' (আ: খ্রী ১৮ শতকের মধ্যভাগ),
পাত্রসায়ের (বাঁকুড়া)

মুখবন্ধ

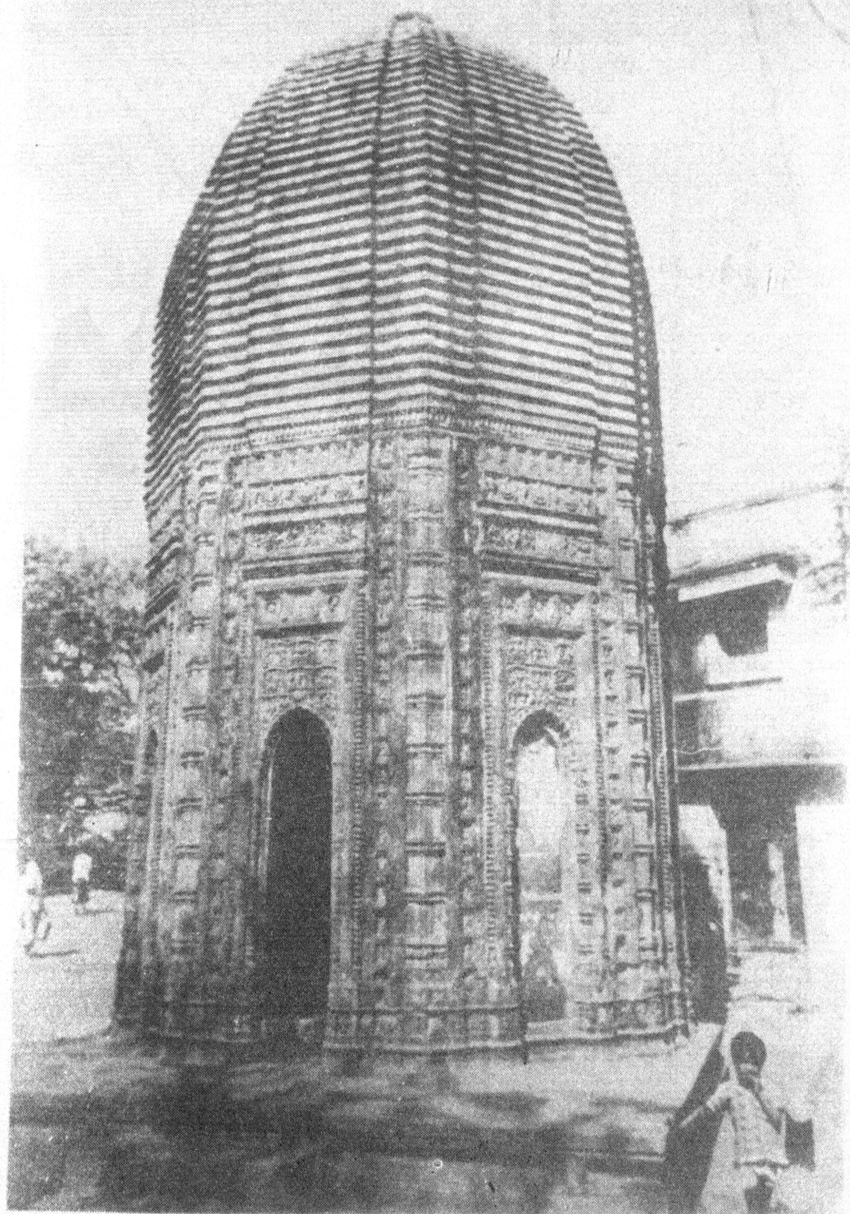
প্রস্তুত গ্রন্থে বাংলার মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মন্দিরগুলি আজ খুবই অবহেলিত ও ধ্বংসের পথে। এগুলি রক্ষা করার তেমন কোন উদ্যোগ আজও নেওয়া হয়নি। তাই বহু মন্দির আজ উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। অনেকগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে এগুলি নির্মিত হয়ে এসেছিল। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থানরূপে নয়, এগুলির মধ্যে স্থাপত্য ও অলংকরণের যে অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তা আজ অনেকের কাছে গবেষণার বিষয়। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলার মন্দির নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে বেশ কিছুকাল আগে থেকে। হিন্দু আমলের বা প্রাক্-মুসলিম যুগের দেউল-দেবালয়ের সংখ্যা অবশ্য খুবই অল্প। ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে প্রাচীন বাংলার এই ধর্মীয় স্থাপত্যের কিছু কিছু নমুনাও উদ্ধার করা গেছে। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ থেকে যে মন্দির-দেবালয় নির্মিত হ'তে থাকে, তার সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। এই সময়ে স্থাপত্য ও অলঙ্করণশিল্পের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে সর্বভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য-ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলার মন্দির এক স্বতন্ত্র পথের ইঙ্গিত দেয়। শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পূর্বভারতেও এই মন্দিরশৈলী স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক।

গ্রন্থটির প্রথমভাগ 'পূর্বাদ্রি'র ১৯ বর্ষ ২য় বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগে পশ্চিমবাংলার মন্দিরের এক সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 'পূর্বাদ্রি'র সম্পাদক শ্রী ইন্দুভূষণ অধিকারী গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। পাঠকেরা গ্রন্থটি পাঠ ক'রে সামান্যতম উপকৃত হলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

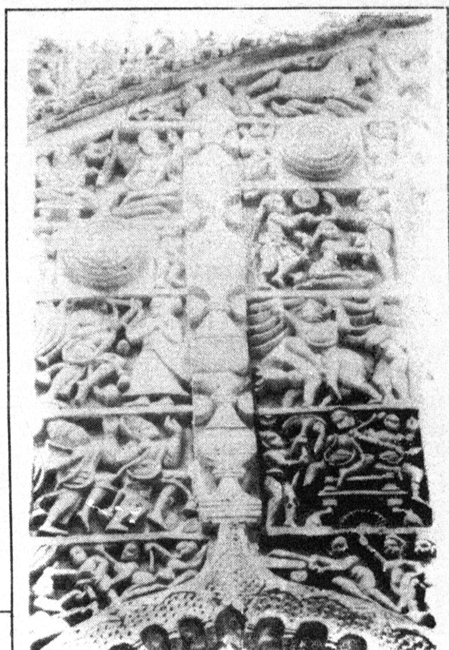
মহালয়া

অক্টোবর, ১৯৯৮

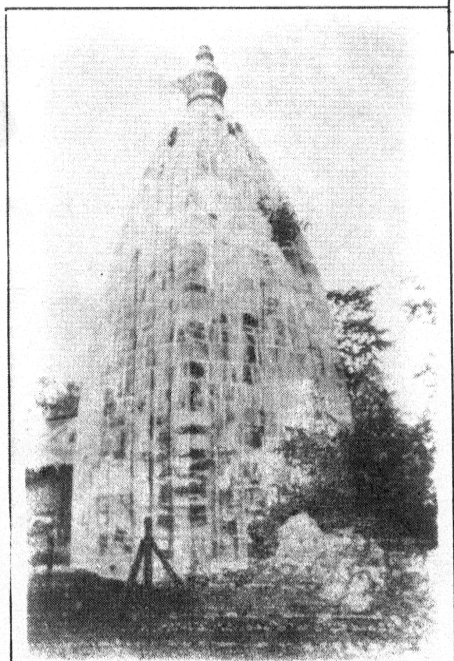
প্রণব রায়



শিবের দেউল (১৮২৬),
বনপাস (বর্ধমান)



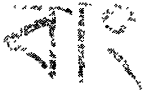
শ্রীধরজীউর 'নবরত্নে'র (১৭৮৯ খ্রী) টেরাকোটা,
আসণ্ডা (হাওড়া)



ধর্মরাজের দেউল (১৬৪৩ খ্রী)
কবিলাসপুর (বীরভূম)

১

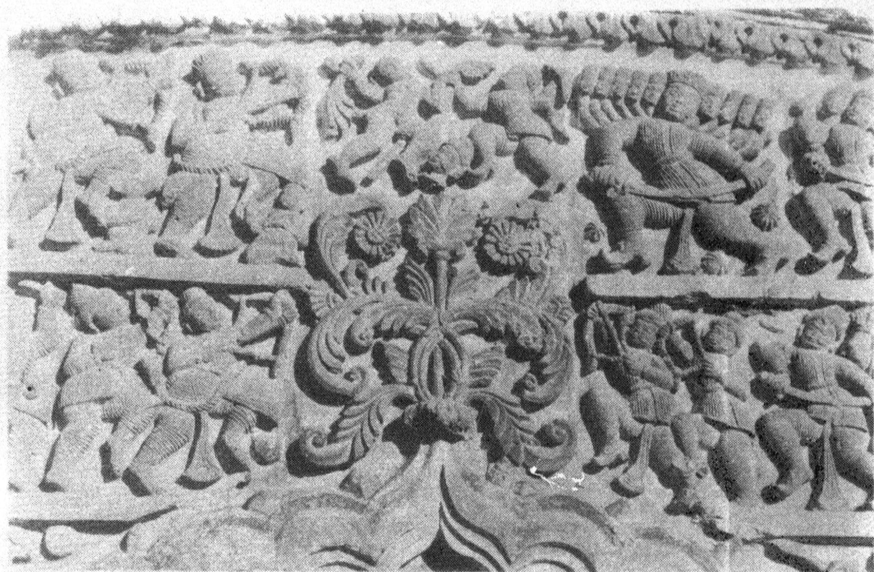
বাঙালি-সত্তার বিকাশ ও মন্দিরস্থাপত্যের আঞ্চলিক রীতি



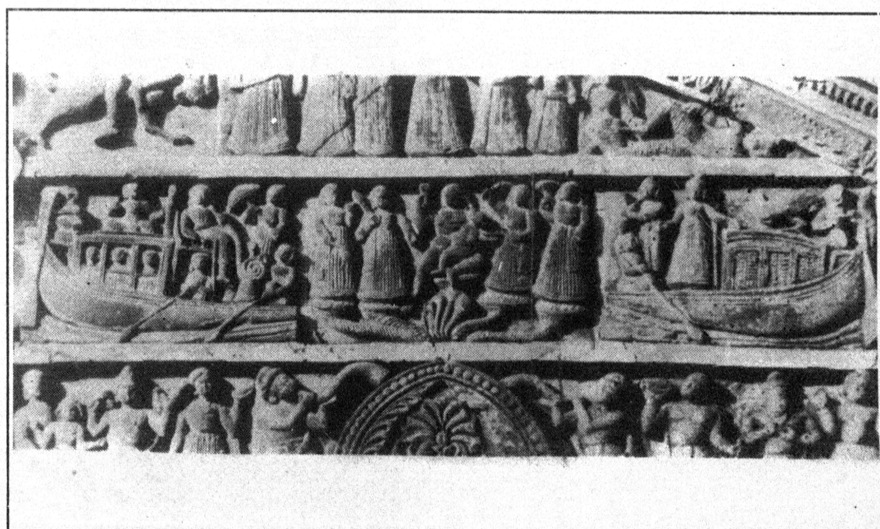
লার ধর্মীয় স্থাপত্য নিয়ে আলোচনার আগে অখণ্ড বাংলা দেশ ও বাঙালিসত্তার উদ্ভব প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বাঙালিচরিত্র গড়ে ওঠে, তার ফলে সে সৃষ্টি করে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। তার জীবনচর্যা, ধ্যানধারণা থেকে জন্ম নেয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন। এক স্বতন্ত্র সত্তায় সে আত্মপ্রকাশ করে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্ব এসবের উৎসমূলে থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাবও তার সৃষ্টিকর্মে বহুলাংশে ইন্ধন জুগিয়েছে।

সমগ্র ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে এই দেশ একসময় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। এখনও তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্তু এক বিশেষ পরিবেশ - পরিমণ্ডল, জলবায়ু, মাটি, নদনদী এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র সত্তার। সেই সত্তাকে বিকশিত করে তুলতে তার নিজস্ব ভাষার জন্ম হয়েছে। অবিরত মননের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন। এই স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ঘটেছে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের মধ্যেই।

ভারতের পূর্বভাগে অবস্থিত বর্তমান বাংলা বা বাংলাদেশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত — এইসব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজ্য বা জনপদগুলিই পরবর্তী কালে এক অখণ্ড বাংলা বা বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন যুগে ঐ সব জনপদের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার। প্রাচীন বঙ্গ জনপদের ভূভাগ মোটামুটিভাবে গঠিত ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে, যদিও নানা সময়ে এর পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক বাংলা বা বাংলাদেশ প্রাচীনকালে চারটি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল — বরেন্দ্রী, সুহ্ম (বা রাঢ়া), বঙ্গ ও কামরূপ। 'গৌড় বলতে সাধারণত রাঢ় - বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা আর বঙ্গ শব্দে বঙ্গ-কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরপূর্ব বাংলা বোঝাত। (সেন, সুকুমার ঃ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৯৭২ পৃ. ৮)। প্রাগার্য বিভিন্ন জাতি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল এখানকার অধিবাসী ছিল। এদের ছিল নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। মৌর্যবিজয়ের পর থেকে (আঃ খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) এই অঞ্চলে আর্যীকরণ শুরু হয় এবং তা চলে আঃ ৫০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তার আগে এখানে 'আর্যভাষার এবং আনুষঙ্গিক উত্তর ভারতের গাঙ্গ উপত্যকার সভ্যতার বিকাশ ঘটে নাই' বলে কারও কারও অভিমত[১]। এই সময়ের মধ্যে এখানকার অধিবাসীরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভাষা ও আচার - ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতা ও ভাষার ক্ষেত্রে মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে দেশজ অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে বিকশিত হতে থাকে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 'আর্যীকরণ' বলতে প্রাচীন বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদের প্রচার ও প্রসারই মুখ্যত অভীপ্সিত। ঐ মতবাদগুলির আলোকে এখানকার বাসিন্দাদের জীবন আলোকিত করার চেষ্টা চলে এই সময়ে। জৈন 'আয়ারঙ্গ সুত্তে' অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, এই কাজ করতে এসে জৈন প্রচারকদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তাঘাট-বিহীন জাঙ্গল ভূভাগে জৈন সন্তদের পিছনে



মন্দির টেরাকোটা
রামরাবণের যুদ্ধ



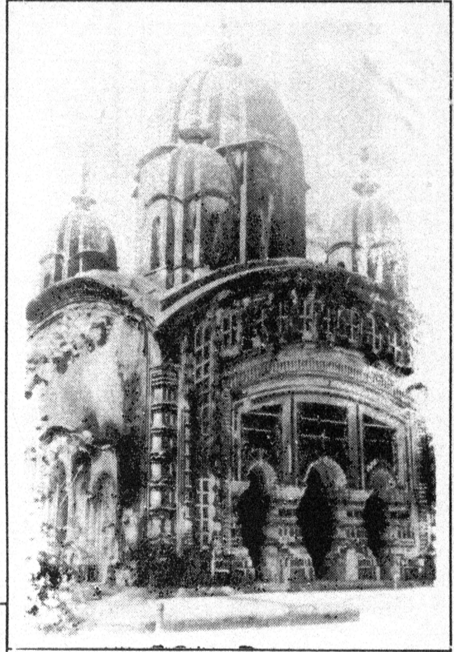
টেরাকোটায় কমলে কামিনী,
রাধাকান্তপুর (দাসপুর)

কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। হয়তো এই গোটা অঞ্চলের মানুষেরা এরূপ ছিল না। জৈন সাধুপ্রচারকেরা মগধের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার উত্তরপশ্চিমে বর্তমান পুরুলিয়ায় প্রবেশ করেন এবং আদি বাসিন্দাদের তাদের মতে এনে অহিংস করে তোলার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা খারাপ ছিল না। তবুও প্রথম দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা বহিরাগত জৈন প্রচারকদের বিরোধিতাই করেছিল। কিন্তু কালক্রমে তারা ধীরে ধীরে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণে এক আমূল পরিবর্তন আনে। সংস্কৃতজ মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষার মিশ্রণে এক নতুন ভাষা জন্ম নেয়। অবশ্য, এই পরিবর্তন ঘটেছিল দীর্ঘকাল ধরে। জীবনযাত্রার ধরণধারণ ও ভাষার পরিবর্তনের সাথে 'উত্তরভারতীয় মিশ্র আর্য'দের সঙ্গে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হোল, তাদের বংশধর বর্তমান বাঙালি। এই সংমিশ্রণে তাদের মধ্যে দেখা গেল উন্নততর পর্যায়ের মানসিক পরিবর্তন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

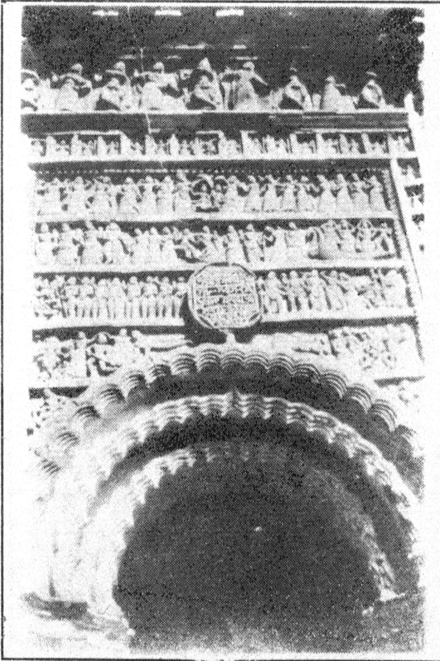
'এইরূপে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য্য— এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন নবসৃষ্ট আর্য্যভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্মনীড় হইল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অনার্য্য ছিল। যেটুকু আর্য্যরক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য্যমিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য্যভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটি,যাহাকে ইংরেজিতে discipline বলে, তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্যমনের-ব্রাহ্মণ্যের-এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।' ('বাঙ্গালীর সংস্কৃতি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ পৃ. ৭-৮, ১৯৯০)

এই অঞ্চলে মৌর্যদের আধিপত্য বিস্তারের প্রথমদিকে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনে মৌর্য শাসনব্যবস্থা যে ভালো রকম কায়েম হয়েছিল, তা স্থানীয় শাসকের একটি লিখিত আদেশ থেকে জানা যায়। এই আদেশটি প্রাকৃত ভাষায় অশোকের সময়ের ব্রাহ্মীহরফে একটি লেখে খোদিত এবং আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ। লেখটি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত মহাস্থানগড় (বগুড়া জেলা) থেকে পাওয়া গেছে। আদেশটি পুণ্ড্রনগরের 'মহামাত্র'কে দেওয়া হয়। কাজেই ঐ সময় বা তার আগে থেকে অশোকের স্তম্ভ অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃতের চলন পুণ্ড্রবর্ধনে (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ছিল। খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তসম্রাটদের আমলে সমগ্র বাংলাদেশ তাদের অধীনে আসে এবং সেসময় এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা স্থানে বেশ কিছু মন্দিরাদি নির্মিত হয়, যার ধ্বংসাবশেষ ঐ সব স্থানে পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে গুপ্তসম্রাটদের সুশাসনে বর্তমানের অখণ্ড বাংলা ভালোভাবেই শাসিত হয়েছিল। তার প্রমাণ, এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া কয়েকটি শিলালেখ ও তাম্রশাসন। এই লেখ ও শাসনগুলিতে গুপ্তরাজাদের সময়ে বাংলাদেশ যে নানা বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তা জানা যায় এবং এই সব বিভাগ ও উপবিভাগের শাসনকর্তার কিছু কিছু নাম ও উপাধিও জানা যায়। 'লেখ' ও 'শাসন' সবই সংস্কৃতে রচিত। কাজেই সংস্কৃত যে তখন রাজভাষা ছিল,তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ-কোন সময় পাটলিপুত্র ও কখনও বা উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্ধন) থেকে শাসনকার্য সম্পন্ন করতেন। মাগধী প্রাকৃত ছিল পূর্বাঞ্চলের কথ্যভাষা।

গুপ্তশাসনের অবসানে শশাঙ্কের সময়েও (খ্রী. সপ্তম শতকের প্রথম পাদ) বাংলায় তাঁর সুশাসন



রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন',
চেঁচুয়া গোবিন্দনগর (দাসপুর)



মাইতিদের রাধাদামোদরজীউ ১৭ চূড়া রাসমঞ্চের
টেরাকোটা ও লিপি, মাংলোই

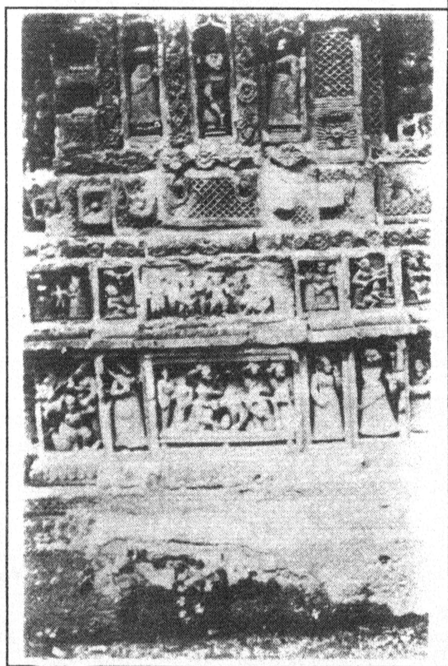
প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী ছিল। শশাঙ্কের রাজ্যসীমা দক্ষিণপশ্চিমে দণ্ডভুক্তি (বর্তমান মেদিনীপুর ও ওড়িশার বালেশ্বর) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে তাঁর আমলের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে জানতে পারা যায়, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও গ্রামমুখ্যের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হোত। তাম্রশাসনে বহু গ্রাম, কোন কোন 'বিষয় (জেলা) এবং 'অধিকরণের' নাম পাওয়া যায় । ভুক্তিপতি, বিষয়পতি ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের নাম ও উপাধিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা অনেকেই স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। আবার, কখনও বা রাজধানী থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করা হোত। ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনুরক্ত পরমশৈব শশাঙ্কের সময়ে গৌড়বঙ্গে যে আর্যব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অনুমেয় ।

তাম্রলিপ্ত সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর ও বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র তাম্রলিপ্ত অন্তত অষ্টম শতকে পালরাজত্ব শুরু হওয়া পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই তাম্রলিপ্তে বহু হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধ বিহার যে ছিল, চীনা পরিব্রাজক ফা-সিয়েন ও সুয়াঙ্ সাঙ্ (হিউয়েন সাঙ্)-এর বিবরণী থেকে তা পরিস্ফুট। সেকালে সুহ্মদেশের রাজধানী যে তাম্রলিপ্ত বা 'দামলিপ্ত' ছিল, তা সপ্তম শতকের লেখক কবি দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' থেকে জানা যায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসস্তূপ প্রাচীন 'গাঙ্গে' নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার মহাস্থানগড়ের ধ্বংসস্তূপকে কেউ কেউ প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। এছাড়া আরও অনেক ধ্বংসস্তূপ বা ধ্বংসাবশেষ আছে যেমন, মঙ্গলকোটে (বর্ধমান) এবং মহানাদে (হুগলি) যেগুলি প্রাচীন কোন সমৃদ্ধ নগরীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

এগুলি থেকে প্রাচীন বাংলার খণ্ড খণ্ড চিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। কিন্তু একটি অখণ্ড বাংলা বা একটি সামগ্রিক বাঙালিসত্তা তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। এমনকি, তার ভাষাও পূর্ণরূপ লাভ করেনি। পালবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে বেশ কিছুকাল ধরে চলেছিল রাজনীতির অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের প্রধমার্ধে ৭৪০ খ্রীস্টাব্দে বরেন্দ্রভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হোল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্য ধর্মমতে উদারহৃদয় পালসম্রাটরা এক নবযুগের সূচনা করলেন। তাঁদের রাজত্বকালে বাংলাভাষা তার নিজস্বরূপ নিতে শুরু করে। মাগধী প্রাকৃত ও বাংলায় প্রচলিত অপভ্রংশ— উভয়ের সংমিশ্রণে এক নতুন দেশীয় ভাষার উদ্ভব হোল আনুমানিক দশম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বর্তমান বাংলাভাষার এটিই হোল আদিরূপ। রচিত হোল বৌদ্ধ গুরুদের দ্বারা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য— চর্যাপদ। পরবর্তীকালে চর্যাপদের এই ভাষা যাকে 'সন্ধাভাষা' বলা হয়, আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং এই ভাষায় রচিত হোল উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য। পালসম্রাটরা বাঙালি ছিলেন, এটা অনেকের ধারণা। তাঁদের সুশাসনে বাংলায় পূর্ববর্তী অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দূর হোল। পুণ্ড্রবর্ধনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সম্রাট রামপালদেবের সময়ে গৌড়ের 'রামাবতী'তে রাজধানী নতুন করে তৈরি করা হয়। পাল-বংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী দেদ্দদেবীর বিবাহ হয় এবং তার ফলে গোপালদেব গৌড়সিংহাসন লাভ করেন। গোপালদেবের পুত্র বিখ্যাত ধর্মপালদেব তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন এবং পাহাড়পুরে (রাজশাহী জেলা) প্রসিদ্ধ সোমপুর মহাবিহার স্থাপন করেন। পরবর্তী প্রসিদ্ধ সম্রাট মহীপালও (৯৭৭ খ্রীঃ - ১০২৭ খ্রীঃ) ছিলেন বিরাট যোদ্ধা। রামপালদেব গৌড়ে রামাবতী নামে যে রাজধানী স্থাপন করেন, তা ছিল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থান। পাল-বংশের পর সেনরাজবংশের রাজধানী এরই কাছাকাছি ছিল গঙ্গা ও মহানন্দার মধ্যবর্তী



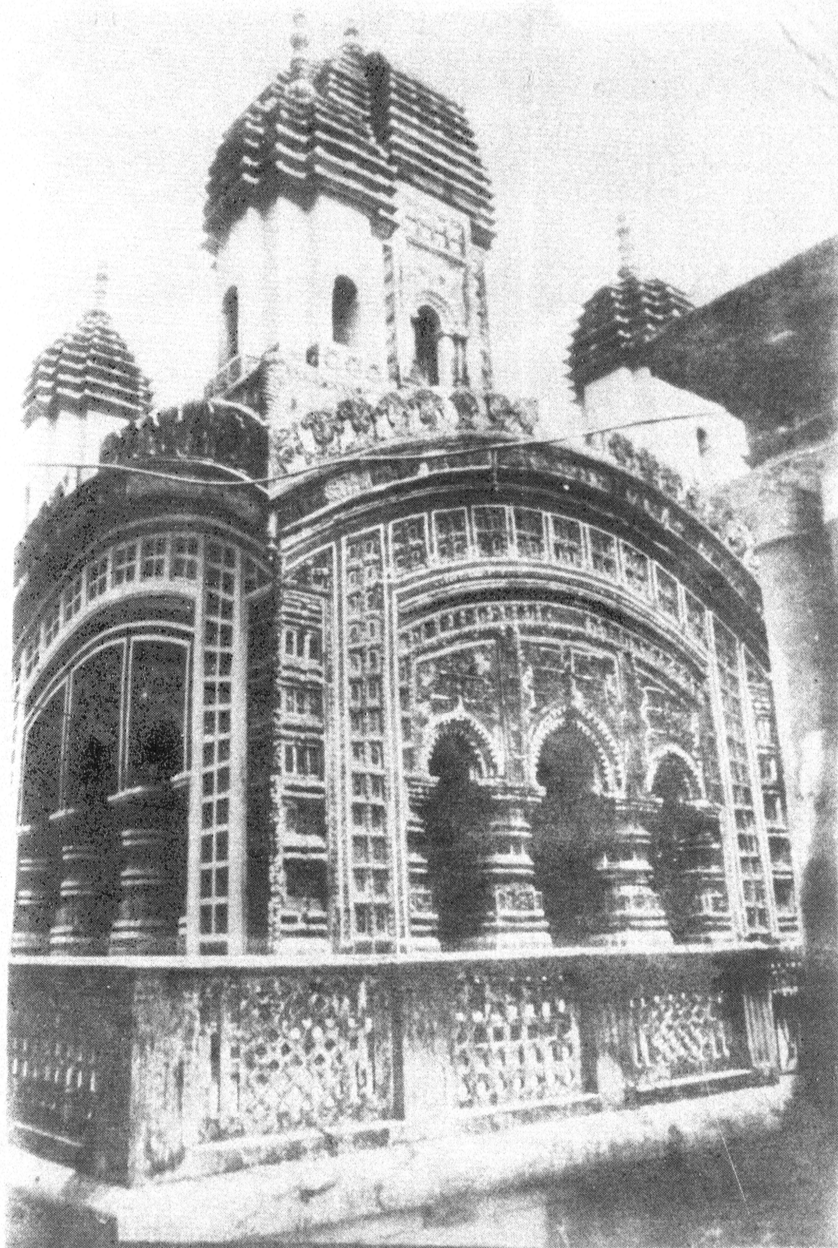
হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির,
বাঁশবেড়িয়া (হুগলী)



বারেন্দ্রগলির শিবমন্দিরে নীচের টেরাকোটা

স্থান। পরে তা 'লক্ষ্মণাবতী' নামে পরিচিত হয় শেষ সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের নামে। মুসলমানবিজয়ের পর এরই কাছাকাছি গৌড় নগরী ও বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

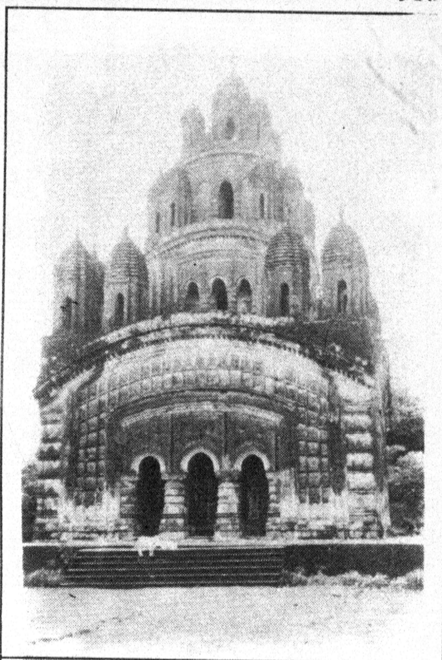
পাল-বংশের দীর্ঘশাসনে বাঙালি এক পৃথক জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার আপন ভাষায় চর্যাপদের মতো সাহিত্যসম্পদ সৃষ্ট হওয়া ছাড়াও স্থাপত্যশিল্পে এক নতুন যুগের উদ্ভব হয়। গুপ্তযুগে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল, পালযুগে তা সমৃদ্ধতর হয় ও এক নতুন শৈলী জন্মলাভ করে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এই শৈলীকে আমরা 'পূর্বী ধারা' বা 'ইস্টার্ন স্কুল' নামে অভিহিত করতে পারি। বিটপাল, ধীমানের মতো শিল্পী তাঁদের অসংখ্য মূর্তিভাস্কর্যে এই নতুন শিল্পরীতিকে অমর করে রেখেছেন। টেরাকোটা-শিল্পেরও এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে। পাহাড়পুর-মন্দিরের (আঃ খ্রী. নবম শতক) ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব 'টেরাকোটা'- ফলক পাওয়া গেছে, সেগুলি বৃহদায়তন এবং এগুলির কারুকার্যে স্বাচ্ছন্দ্য, পরিচ্ছন্নতা ও সজীবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেযুগের সামাজিক চিত্রও এখানকার অনেক টেরাকোটা - ফলকে প্রতিফলিত। প্রস্তরমূর্তিগুলির মধ্যে গুপ্তযুগের মতো দেহসৌষ্ঠব ও ভাবপ্রকাশের প্রাধান্য থাকলেও অলঙ্করণের দৈন্য নেই। তবে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন-আমলের মূর্তির মতো অলঙ্করণ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় না। গুপ্তযুগে 'দালান' মন্দির থেকে এবং 'দালানের' ওপর 'শিখর' স্থাপন করে যে 'নাগর' -শৈলীর মন্দিরস্থাপত্যের উদ্ভব হয় এবং উত্তর ও মধ্য ভারতে এবং ওড়িশায় বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করে , পালযুগে পূর্বভারতের মগধে তার এক নিজস্ব ধারার উন্মেষ ঘটে। ইঁটের মন্দিরগুলিতেই ঐ রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল। বাংলায় এইরূপ অনেক মন্দির নির্মিত হয়— ইঁট ও পাথর এই দুই উপাদানেই। সেন-যুগে ঐ একই স্থাপত্য-শৈলী অব্যাহত থাকে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন বাংলায় মন্দিরস্থাপত্যের এই 'শিখর' রীতিকে 'পাল-সেন রীতি' নামেই অভিহিত করা যায়। এই সব নয়নাভিরাম মন্দিরগুলি বন্ধুবর্মার 'মান্দাসোর শিলালেখে' উল্লিখিত দশহর নগরের 'কৈলাসতুঙ্গ-শিখরের' মতো ছিল। পরবর্তী আলোচনায় তা পরিস্ফুট হবে। মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ স্থাপত্যালঙ্কারের অপরূপ সৌন্দর্য (বিশেষ করে, ইঁটের মন্দিরে, রেখাবিন্যাস ও স্বতঃস্ফুর্ত 'অঙ্গশিখর', 'ভূমি আমলক' এবং 'রিলিফে' উৎকীর্ণ অন্যান্য নক্শা বা অল্পস্বল্প মূর্তি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালেখে উল্লিখিত আছে , প্রাচীন বাংলা মন্দিরগুলির শিখর ছিল খুবই উচ্চ, তাদের শিরোভাগে থাকত স্বর্ণকলস, এরা যেন সূর্যের গতিকে বাধা দিত। মন্দিরগুলি ছিল যেন পৃথিবীর ভূষণ বা অলঙ্কার।[২] এই ধরণের মন্দির যা প্রাসাদের একটি শৈলী, সেটি 'পুণ্ড্রবর্ধনক' নামে 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' নামক শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থে স্বীকৃত হয়।[৩] প্রাসাদ ছিল 'হল'-ঘরযুক্ত অট্টালিকা এবং এর ছাদের চারদিকে থাকত শিখর।[৪] এরূপ মন্দির ছিল হরির প্রিয়। 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' গ্রন্থের বিবরণী থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে বা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে এইরূপ অনেক মন্দির যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর একটি নিজস্ব শৈলীর সৃষ্টি হয় যা 'পুণ্ড্রবর্ধনক' নামে পরিচিত হয়। সুয়াঙ সাঙের (হিউয়েন সাঙ) বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেইসময়ে (খ্রীঃ সপ্তম শতকের প্রথম পাদ) তিনি সারা বাংলা ভ্রমণ করে তিনশ'রও বেশি মন্দির লক্ষ্য করেছিলেন।[৫] তিনি ভিতরগাঁও-এর (কানপুর জেলা, মন্দিরটি এখনও বর্তমান ও অক্ষত) ইঁটের 'শিখর'-মন্দিরটিও দর্শন করেন। বিশাল মহাবোধি মন্দিরও তিনি দেখেন। পালযুগে অতলায়তন সরোবর বা দীঘি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চ 'শিখর'-মন্দিরও অধিক সংখ্যায় নির্মিত হ'ত।[৬] সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' শোণিতপুরের (দেবীকোট, বাণগড়) ঐশ্বর্যবর্ণনার



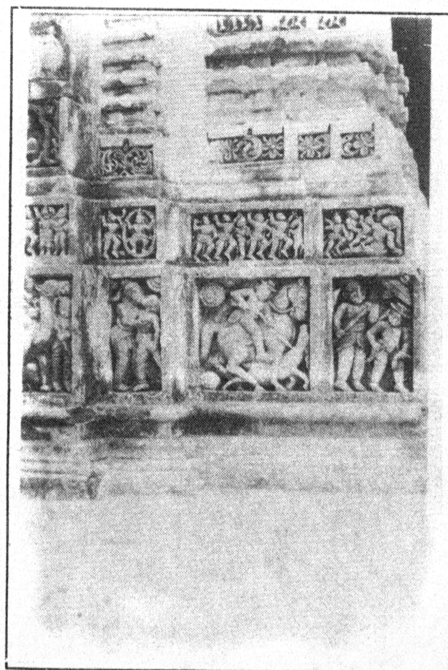
গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯ খ্রী),
দশঘরা (হুগলী)

মধ্যে বলা হয়েছে, এখানকার বহু মন্দির ভক্ত-উপাসকদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত এবং দীঘিগুলো প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে পূর্ণ ছিল।[৭] 'রামচরিতে' 'রামাবতী' নগরীর বর্ণনায় তাকে 'সুরেশ্বরপুরী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৮] অর্থাৎ নগরীটি ছিল 'মন্দিরপুরী' এবং এখানে সারিবদ্ধ প্রাসাদ ছিল। গৌড়ে রামাবতী ছিল পালরাজবংশের শেষ রাজধানী।

পাল-সেন যুগে বাংলায় আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এই আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্য ছাড়া উত্তর ভারতীয় 'নাগর'- শৈলীর ওড়িশা রাজ্যে বিবর্তিত 'রেখ'-দেউল নামে পরিচিত মন্দির স্থাপত্যও দক্ষিণ - পশ্চিম বাংলায় একই সময়ে প্রচলিত হয়। কোন কোন শিলালেখে (হোলাল থেকে প্রাপ্ত) 'নাগর', 'দ্রাবিড়' এবং 'বেসর'-শৈলীর সঙ্গে 'কালিঙ্গ' এর উল্লেখ আছে।[৯] ওড়িশী রীতির মন্দিরগুলিকে এই শৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু শিল্পশাস্ত্র 'মানসার' গ্রন্থে 'কালিঙ্গ' হোল এক প্রকার সৌধ, পরন্তু কখনই একটি পৃথক শৈলী নয়, একথা বলা হয়েছে। অতএব 'কালিঙ্গ' যে শুধু 'নাগর'-শৈলীর অন্তর্ভুক্ত, তা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যেহেতু, উক্ত শৈলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও এই রীতি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং কলিঙ্গের স্থপতিদের হাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং ওড়িশার বিখ্যাত মন্দিরগুলি ঐ রীতিতে তৈরী হয়েছিল, তাই পৃথব মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য শিল্পশাস্ত্র ও শিলালেখে একে 'কালিঙ্গ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রীতির শুধুমাত্র 'রেখ'-দেউল (জগমোহন-বর্জিত) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বেশ কিছু নির্মিত হয়েছিল প্রাক্-মুসলিম যুগে, যার কোন কোন নিদর্শন এখনও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী আলোচনায় তা জানা যাবে। তাই পাল-সেন যুগে আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্যের সঙ্গে আঞ্চলিক ওড়িশী 'রেখ'- স্থাপত্য দুটিই পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। এর পিছনে রাজনীতিক একটি কারণ হোল, পাল ও সেনবংশীয় সম্রাটরা উত্তর, পূর্ব, কামরূপ (প্রাগ্‌জ্যোতিষ) ও মধ্য বঙ্গে এবং মগধ, এমনকি, বারাণসী পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রলেও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ওড়িশার গঙ্গ-বংশীয়দের শাসন অব্যাহত ছিল। গঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ একাদশ শতকের শেষভাগে ত্রিবেণী (হুগলি) পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তার করেন। অবশ্য, মুসলমান-বিজয়ের পর ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ দিকে কিছু অংশ হাত ছাড়া হয়ে যায়। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গঙ্গরাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ওড়িশী সংস্কৃতির প্রসার ও ওড়িশী শৈলীর বহু মন্দির ঐ অঞ্চলে নির্মিত হয়। এর মধ্যে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের 'ভৌমকর'রাও কিছুকাল মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তা জানা যায়, কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত একটি খন্ডিত শিলালেখ থেকে। ভৌমকরদের রাজধানী ছিল খিচিং-এ। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার মাধবপুরে প্রাপ্ত এই খন্ডিত শিলালেখটি আঠার সারির এবং এতে 'ভৌমকর' অব্দাঙ্ক ৩৬৮ উৎকীর্ণ বলে অনুমান করা যায়, যা ১১০৪ খ্রীস্টাব্দের সমাঙ্ক। শিলালেখের অক্ষরের ছাঁদ বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্ট (আ. ১১৫৯ - ১১৭৯) এবং লক্ষ্মণসেনের (আঃ ১১৭৯ - ১২০৬) আনুলিয়া তাম্রপট্টলেখের অক্ষরের সদৃশ। আবিষ্কৃত শিলালেখটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, 'সুবর্ণ' নামে এক নির্মাণদক্ষ ব্যক্তি শিবমন্দিরের ওপর একটি 'শিখর' নির্মাণ করেন। 'রাঢ়াশ্রী' বিশেষণযুক্ত অর্থাৎ 'রাঢ়ের গৌরব' এক ভক্তিমতী মহিলা 'সহাস্য' অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে মন্দিরটি শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। সেই শিবলিঙ্গটি ছিল 'বঙ্গের অলঙ্কার'। খণ্ডিত এই লিপি থেকে একটি শিবমন্দিরে 'শিখর' যোগ করার ('যদ্‌বিমানীকৃতং শিবমন্দিরম্') কথা জানা যায়। অতএব ঐসময় মেদিনীপুরের ঐ স্থানে মাধবপুর বা তৎসন্নিহিত স্থানে বা নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানে 'শিখর'-দেউল নির্মাণের কথা আমরা জানতে পারি।[১০]



আনন্দভৈরবীর ২৫ চূড়া মন্দির,
সুখাড়িয়া (হুগলী)



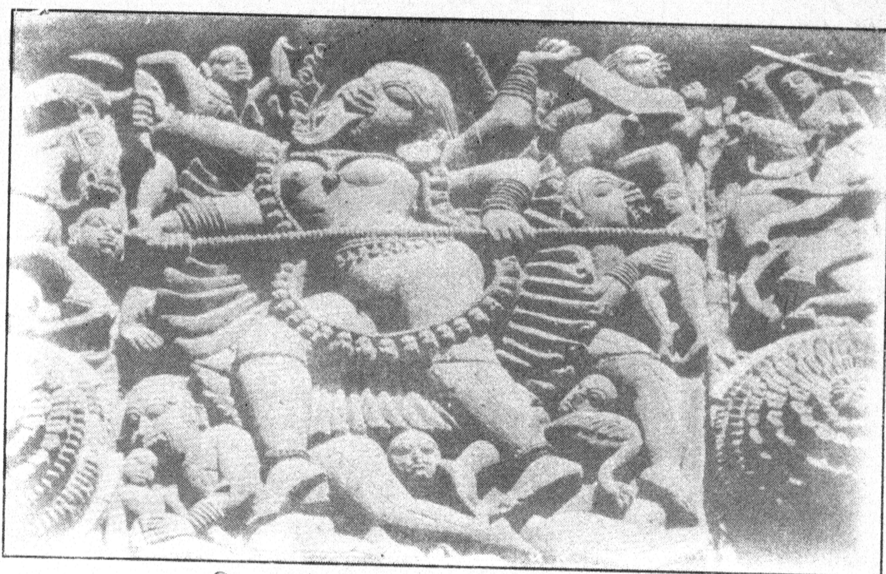
পঞ্চরত্নের টেরাকোটা,
তিলন্তপাড়া (সবং)

লেখের হরফ 'প্রায়-বঙ্গাক্ষর'। কিন্তু কথায় ও অঙ্কে ৩৬৮ বা 'অষ্টাষষ্ঠ্যধিক- ত্রিশতবৎসরপ্রগতে' থাকায় এটি 'ভৌমকর' অব্দ বলে অনুমান। এই অব্দের প্রচলন হয় ৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে। আলোচ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১১০৪ খ্রীস্টাব্দ। তখন বাংলায় রামপালদেবের শাসন অপ্রতিহত। গৌড়ের 'রামাবতী'তে তাঁর রাজধানী। সেন-বংশের শাসন তখনও বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

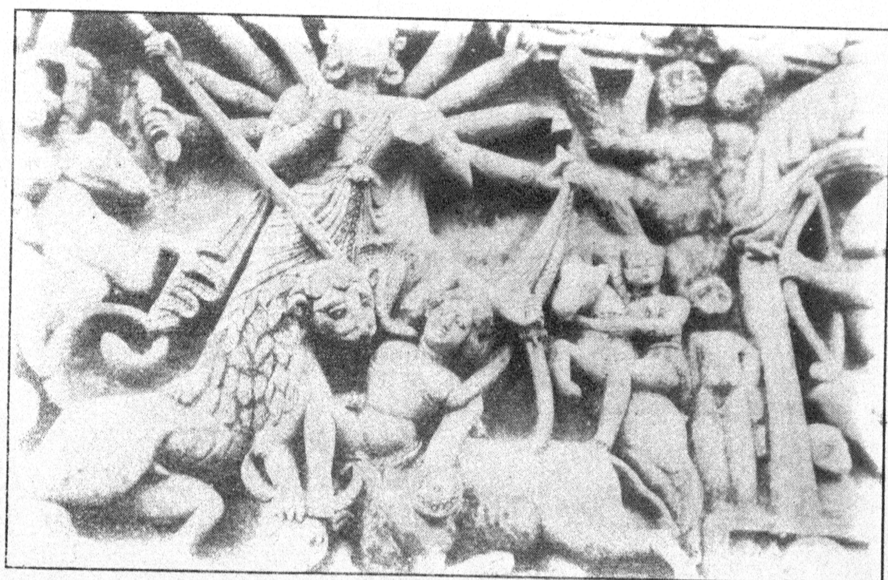
উপরি আলোচিত 'শিখর' বা 'রেখ'- স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে অপর যে শৈলীর স্থাপত্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে, তা ছিল 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' রীতির। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের ছাদ ওপরে ক্রমহ্রস্বায়মান 'পিঢ়া' বা 'থাক' যুক্ত হয়ে শীর্ষদেশে মিলিত হোত। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে বা শিলালেখে 'শিখর'-শৈলীর মন্দিরের উচ্চ প্রশংসা করা হলেও 'পিঢ়' রীতির মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই শৈলীর মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনও তেমন পাওয়া যায় না। তবুও বহু মূর্তিভাস্কর্যে এর আদর্শ প্রতিরূপ উৎকীর্ণ থাকায় (এই বিষয় পরে আলোচ্য) এই শৈলীর মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা কঠিন নয়। তবে এই পিঢ়-রীতির মন্দিরসম্পর্কে সরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন ঃ বাংলার পিঢ় - মন্দিরগুলির 'পিঢ়া' বা 'থাক' ওড়িশার পিঢ়ের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, প্রতিটি 'পিঢ়া' এক একটি তল বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া এগুলিতে 'রথ' - বিন্যাসও আছে। প্রাচীন বাংলার 'পিঢ়'-দেউলগুলি যে 'রথ' যুক্ত ছিল, তা বোঝা যায় (Temples of Bengal, J. I.S.O.A., Vol. II, 1934, P. 132)।

পালযুগে আলোচ্য এই স্থাপত্যরীতির আঞ্চলিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অখণ্ড ভারতের অংশরূপে এই অঞ্চলে এইসময় বাঙালি জাতির উদ্ভব এবং এই সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষা মাগধী অপভ্রংশে সাহিত্যরচনার সূচনা হলেও সংস্কৃত গুপ্তযুগের মতো উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের ভাষা ছিল। পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতিধর প্রভৃতি যেসব কবি ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা সকলে সংস্কৃতেই তাঁদের সাহিত্য রচনা করেন। সেই সব কাব্য ও রচনা কালের গণ্ডী পেরিয়ে আজও সমাদৃত। সেসময়ের বাঙালির মাতৃভাষা সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে নি। সন্ধা-ভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলি উচ্চ বিদ্বৎসমাজেও বিশেষ সমাদর লাভ করতে পারে নি। অবশ্য, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় সেন-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে হিন্দুযুগও শেষ হোল। মুসলমান - বিজয়ের ফলে বাংলায় এল এক নতুন যুগ। গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগের অবসান পর্যন্ত স্থাপত্যশিল্পে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের যে এক ধ্রুপদী রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেও যা ছিল সমুজ্জ্বল, তার বিকাশ ও গতি রূদ্ধ হয়ে পড়ল। সু-উচ্চ 'শিখর' ও অন্যান্য দেউলগুলি যা ছিল প্রাচীন বাংলার সম্পদ ও গৌরব, সুলতানী শাসনের প্রথম প্রায় দু'শ বছরে সেগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে সেই ধ্বংসাবশেষ দিয়ে মসজিদ, মাজার তৈরী করাই ছিল মূল লক্ষ্য। সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলি ভেঙ্গে তার অবশিষ্ট অংশে ফারসী আরবী লিপিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হোল। বাংলার গৌড়, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী এবং হুগলির পাণ্ডুয়ায় নির্মিত হ'তে থাকল বিশালায়তন মসজিদ ও কবরসৌধ। কিন্তু সে ইতিহাসে আসার আগে প্রাক্-মুসলিম বাংলায় পূর্বোক্ত মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর বিকাশধারার স্বরূপটি আমাদের জানা প্রয়োজন।



রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' মন্দিরের (১৭৮৬) টেরাকোটা কালীমূর্তি,
আঁটপুর (হুগলী)



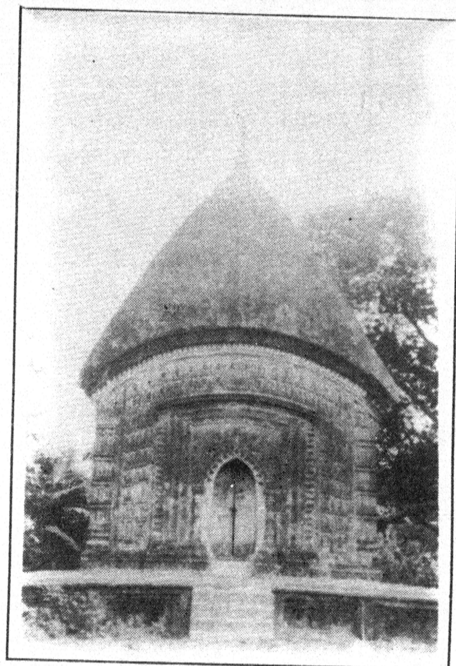
দশভুজা মহিষমর্দিনী, প্রতাপেশ্বর দেউল,
কালনা (বর্ধমান)

২

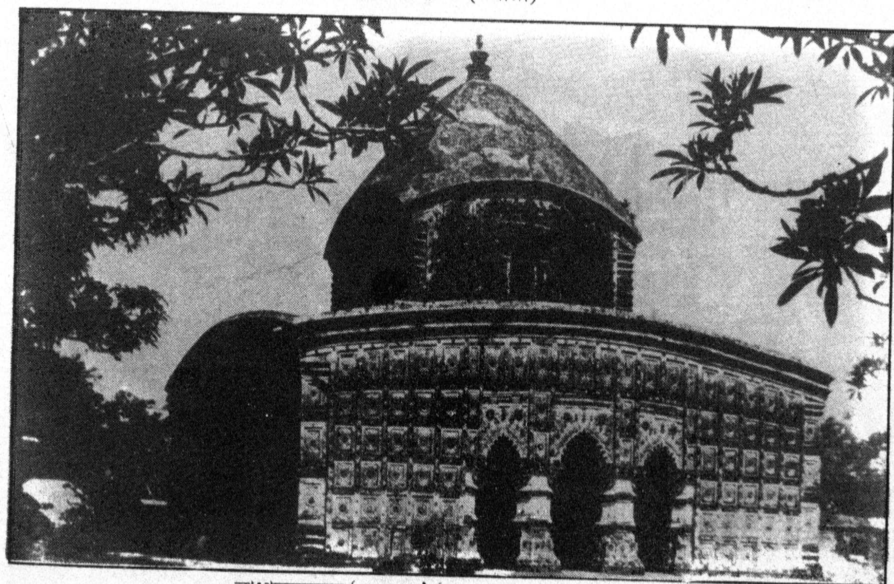
প্রাচীন মন্দিরস্থাপত্যের বিকাশধারা : প্রবাহ ও প্রকৃতি

বাংলায় মুসলমান-পূর্ব যুগে প্রাচীন মন্দিরস্থাপত্য-শৈলী সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা হলেও এই স্থাপত্য-শৈলীকে চারটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই চার প্রকার শৈলীর মন্দির আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকে সুলতানী আমলের মধ্যেও খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত কমবেশি নির্মিত হতে থাকে । এগুলির মধ্যে প্রথমটি হোল ,'ইন্দো-আর্য ' বা উত্তরভারতীয় 'নাগর'-শৈলীর যে বিশুদ্ধ রূপটি আমরা ভুবনেশ্বরের আদি মন্দিরগুলিতে পাই, যেমন পরশুরামেশ্বর, স্বর্ণজালেশ্বর, বৈতাল প্রভৃতি মন্দিরে, যেগুলির সঙ্গে তৎসমসাময়িক আইহোলের হুচ্চপ্পাইয়া বা পত্তাদাকলের জম্বুলিঙ্গ মন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উক্ত দুটি মন্দিরই খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত। এই সময়ে গুপ্তযুগে উদ্ভাবিত উত্তরভারতীয় 'শিখর'-এর রূপটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[১১] খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে বর্তমান কানপুর জেলার ভিতরগাঁওয়ে ইঁটের মন্দিরটিতে প্রাচীনতম 'শিখরের' সম্পূর্ণ রূপটি আমরা পাই। খ্রীস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠশতকে উত্তরভারতীয় 'নাগর'-শৈলীর মন্দিরের ওপরে ক্রমশ 'শিখরে'র ঈষৎ অবস্থান লক্ষ্য করা যেতে থাকে[১২] যা পরবর্তীকালে উত্তরভারতের নানাস্থানে বিকাশলাভ করে। ভুবনেশ্বরের পূর্বোক্ত খ্রীষ্টীয় অষ্টম- নবম শতকের মন্দিরগুলিতে 'শিখরে'র পূর্ণ রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। মূল মন্দিরের সামনে একটি 'মুখমণ্ডপ'ও যুক্ত হতে থাকে এই সময়ে। পশ্চিমবাংলার বরাকরের 'বেগুনিয়া'গোষ্ঠীর খর্বাকৃতি চতুর্থ মন্দিরটির সঙ্গে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর-মন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ এটি ঐ সময়ের বলে মনে করেন। কিন্তু সম্ভবত এটি আরও পরবর্তীকালের বলে কারও কারও ধারণা।[১৩]

ওড়িশায় বিকশিত 'নাগর'-শৈলীর আদি মন্দিরগুলি পরবর্তীকালের ওড়িশার মন্দিরের (বিশেষ করে ভুবনেশ্বর ও পুরীতে) তুলনায় অনেকটা সাদামাটা। পূর্বোক্ত বরাকরের চতুর্থ মন্দিরটিতে যেন তার ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু ঐ মন্দিরটির কাছেই আর তিনটি 'শিখর'-মন্দির, যেগুলি খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়, সেগুলি চতুর্থটির তুলনায় অনেক উচ্চ এবং আকার ও ভঙ্গীতেও কিছুটা পৃথক। ওড়িশার 'নাগর'-শৈলীর মন্দিরের ময়ূরভঞ্জের খিচিং-এ 'মুখমণ্ডপ' বা 'জগমোহন' বর্জিত এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জরাজাদের রাজধানী ছিল খিচিং-এ। এখানে খ্রীস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত যে অল্প কয়েকটি মন্দির আজও বর্তমান, সেগুলি লক্ষ্য করলে মুখমণ্ডপ-বিবর্জিত 'শিখর'-দেউলের যে সৌন্দর্য, তা উপলব্ধি করা যায়। এই রীতির দেউল দক্ষিণবাংলার জেলায়, বিশেষ করে বাঁকুড়া ও বর্ধমানে লক্ষ্য করা গেছে যেমন, বরাকরের 'বেগুনিয়ার' মন্দিরগুলিতে, একথা কেউ কেউ মনে করেন এবং এগুলি পালযুগে আঃ খ্রী. নবম-দশম শতকে নির্মিত বলে তাঁদের ধারণা।[১৪] কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তা প্রমাণিত হয় 'বেগুনিয়া'-গোষ্ঠীর পূর্বোক্ত তিনটি মন্দিরের একটিতে যে লিপি আছে তা থেকে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৬১ খ্রীস্টাব্দ বলে জানা যায়। এই তিনটি মন্দিরের সঙ্গে খিচিং-এর মন্দিরগুলির (একাদশ-দ্বাদশ খ্রীস্টীয় শতক) অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার তেলকূপিতেও (সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত'-এ তৈলকম্পা নামে উল্লিখিত) এ ধরণের কিছু কিছু



রাঘবেশ্বরের 'চারচালা',
দিগনগর (নদীয়া)



রাধাবল্লভের 'একরত্ন' (আ: ১৭ শতকের প্রথম)
কৃষ্ণনগর (হুগলী)

মন্দির নির্মিত হয়েছিল (যেগুলি আজ দামোদরপাঞ্চেৎ-বাঁধের জলে নিমজ্জিত)। এই মন্দিরও 'মুখমণ্ডপ'-বিবর্জিত ছিল। শুধুমাত্র এককক্ষযুক্ত গর্ভগৃহে বিগ্রহের অধিষ্ঠান ছিল।[১৫] এইরূপ 'শিখর'-মন্দিরে শুধুমাত্র গর্ভগৃহছাড়া আর অন্য কোন কক্ষ লক্ষ্য করা যায় না, কদাচিৎ কোন কোনটিতে সামনে নামমাত্র 'মুখমণ্ডপে'র অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ-প্রসঙ্গে মন্দির-সমালোচক পার্সি ব্রাউন বলেছেন যে, 'কিন্তু(এর মধ্যে) বাঁকুড়ার বহুলাড়ায় দশম শতকের সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরটি অলঙ্করণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। এই ধরণের অসংখ্য মন্দির দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এবং বিহারের মানভূম জেলায় (বর্তমান পুরুলিয়া জেলা) দেখা যায়। এগুলি মোটামুটিভাবে পালরাজাদের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। অতএব এদের সময়কাল অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে।[১৬]

কিন্তু পার্সি ব্রাউনের উপরি উক্ত মন্তব্য স্বীকার করা যায় না। প্রথমত, বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরকে পূর্বোক্ত খিচিং-শৈলীর সঙ্গে একীভূত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ইঁটের ওপর খোদিত অলংকরণে ভূষিত এই মন্দিরটি মণ্ডপ-বর্জিত হলেও এর শৈলী পূর্বোক্ত খিচিং-শৈলীর থেকে পৃথক। পরবর্তী আলোচনায় তা পরিস্ফুট হবে। দ্বিতীয়ত, এই ধরণের মন্দির দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় অসংখ্য ('যেগুলি অষ্টম থেকে একাদশ শতকের') একথাও ঠিক নয়। কারণ, বাঁকুড়ার সোনাতপল (ভগ্ন সূর্যমন্দির), বর্ধমানের সাতদেউলিয়া,পুরুলিয়ার বড়াম, তেলকূপির নিমজ্জিত মন্দির, পাড়া, ছররা প্রভৃতি স্থান এবং দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার জটার মন্দিরগুলি ছাড়া এই ধরনের মন্দির পাওয়া যায় না। মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এ ধরণের কোন মন্দির লক্ষ্য করা যায় না। পক্ষান্তরে, খ্রীস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতকের কোন মন্দির পূর্বোক্তগুলি ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও পুরুলিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। মেদিনীপুর জেলায় প্রাক-মুসলিম যুগের বলে অনুমিত দু'একটি মন্দির, যেমন,জিনশহরের পাথরের ভগ্ন ও জীর্ণ দেবালয় এবং ডাইনটিকরির পাথরের 'পিঢ়'-রীতির ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে পূর্বোক্তগুলির অপেক্ষা পৃথক। ইঁটের একটি উচ্চ 'শিখর' দেউল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সেটি অজয়নদতীরবর্তী বর্ধমান জেলার গৌরাঙ্গপুরের 'ইছাই ঘোষের দেউল' নামে পরিচিত। কিন্তু মন্দিরটি আরও পরবর্তীকালের। আনুমানিক খ্রীঃ ষোড়শ শতকে নির্মিত। পূর্বোক্ত আলোচ্য মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর দ্বিতীয় ধারাটি হোল, পাল-সেন শাসনাধিকারে বিহার ও বাংলায় 'নাগর' শিখর শৈলীর একটি স্বতন্ত্র রূপ। এর সঙ্গে পূর্বোক্ত ওড়িশী-রীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইঁটের মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট। এই রীতির মন্দিরে চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপরিভাগে যে 'শিখর' নির্মিত হয়েছিল তার গাত্রদেশে 'রিলিফে' খোদিত ভাস্কর্যের মধ্যে হরতনের আকারে 'চৈত্য' বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। মূর্তির বাহুল্য তেমন ছিল না, শুধুমাত্র 'কৃত্তিমুখ' বা পুরুষসিংহমূর্তি কোন মুখ। এছাড়া, হংসলতা,অলঙ্কৃত বাঁকানো রেখা, ঘট, পল্লবশীর্ষ ঘট, লতাপাতা, বিশেষ ধরণের ফুলও লক্ষ্য করা যায়। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর দেউল বা বর্ধমানের সাতদেউলিয়ার মন্দিরগাত্রে এরূপ দেখা যায়। অলংকরণ ও খোদাইকাজগুলি খুবই প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। নীচের চতুষ্কোণ 'গর্ভগৃহ' ('বাঢ়') ও তার ওপরের 'শিখরে'র (গণ্ডী) বিভাগ সুস্পষ্ট। একমাত্র প্রবেশপথ অনেকক্ষেত্রে ত্রিভুজাকৃতি, যেমন, বড়াম (পুরুলিয়া)[১৭], সোনাতপল (বাঁকুড়া) এবং সাতদেউলিয়া(বর্ধমান)। মন্দিরের নীচের অংশের চেয়ে 'শিখরে'র ভাস্কর্য-অলঙ্করণ অধিকতর পরিস্ফুট। বড়ামের মন্দিরের 'শিখর'-গাত্রের সম্মুখে 'রিলিফে' খোদিত 'অঙ্গশিখর'-টি যেন ঐ মন্দিরেরই প্রতিচ্ছবি। এর শীর্ষে 'বেকি', 'আমলক', 'কলস' চিহ্নিত রয়েছে দেখা যায়। কিন্তু আসল 'শিখর'টির অগ্রভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। বহুলাড়ার 'শিখর'-মন্দিরটির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

সাতদেউলিয়ার 'শিখর'-মন্দিরের 'শীর্ষ' ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলেও তা অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 'জটা'র দেউলে কয়েকবার সংস্কারের চিহ্ন থাকলেও এটিও প্রাক্-মুসলিমযুগের পূর্বোক্ত দেউলগুলির ন্যায় একটি স্বতন্ত্রগোষ্ঠীভুক্ত। আয়তন, আকার, অলংকরণ এবং উচ্চতার ক্ষেত্রে পূর্বকথিত ওড়িশী স্থাপত্যশৈলীর মন্দিরের সঙ্গে এই গোষ্ঠীভুক্ত মন্দিরগুলির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। এ প্রসঙ্গে, 'ওড়িশী'-শৈলীর অনুসরণে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার আরও কয়েকটি মন্দিরের নাম (যেগুলির প্রায় সবই পাথরে তৈরি) উল্লেখ করা যায়, যেমন দেউলভিড়্যা অম্বিকানগর(উপরিভাগ সম্পূর্ণ ভগ্ন), আটবাইচণ্ডী (ভগ্ন), ময়নাপুরের হাকন্দমন্দির এবং হাড়মাসরার মন্দির। শেষোক্তটি এখনও অক্ষত এবং ক্ষুদ্রাকৃতি। দেউলভিড়্যার মন্দিরে জৈন 'তীর্থঙ্কর' পার্শ্বনাথ ছিলেন জানা যায়। এতে ওড়িশী মন্দিরস্থাপত্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। দেউলভিড়্যার মন্দিরেও 'ওড়িশী' প্রভাব স্পষ্ট। এই মন্দিরগুলি সবই পাথরে তৈরি এবং আনুমানিক নবম-দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়ে থাকবে। আলোচ্য দ্বিতীয় ধারার পাল-সেন পর্বের মন্দিরগুলিকে উপরি উক্ত কারণে এগুলির সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না। মন্দিরগুলি প্রায় সবই জৈনমন্দির ছিল বলে অনুমান করা যায়। এগুলির সন্নিহিত স্থানে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে অনেক জৈনমূর্তিও পাওয়া গেছে যেগুলি স্বাভাবিকভাবেই উক্ত মন্দিরসমূহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালে জৈনধর্মের প্রভাব কমে এলে ঐসব মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরমন্দিরও আদিতে জৈনমন্দির ছিল। এখান থেকে জৈনমূর্তিও পাওয়া গেছে এবং মন্দিরসংলগ্ন এলাকায় 'নিবেদনস্তূপ'ও লক্ষ্য করা গেছে। পুরুলিয়ার বড়াম ও বর্ধমানের সাতদেউলিয়ার মন্দিরদুটিও জৈনমন্দির ছিল মনে করা যায়।

প্রাক্-মুসলিমযুগের উপরি উক্ত দেউলগুলি তাই সবই ওড়িশী মন্দিরস্থাপত্যরীতির ছিল, একথা মনে করা ভুল হবে। পক্ষান্তরে,পাল-সেন রাজাদের আনুকূল্যে পূর্বভারতে 'নাগর'-শৈলীর মন্দিরস্থাপত্যের এক 'পূর্বী রীতি'র উদ্ভব হয়েছিল। মন্দিরস্থাপত্যের এই ঐতিহ্য মগধ অঞ্চল থেকে উত্তরপূর্বে প্রসারিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশী প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই কারণে ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন বলেছেন, 'এইগুলিকে (পূর্বোক্ত পাল-সেন) আকর্ষণীয় ওড়িশী স্থাপত্যের অনুসারী বলা প্রথাগত হয়ে দাঁড়ালেও বাংলার এই প্রাক্-মুসলিম 'রেখ' দেউলগুলি মগধের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য-পরম্পরায় এসেছে। কারণ, প্রাচীনকালে এই দুটি রাজ্যই একই সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।'[১৯] ব্রাউনের মতেও 'ইস্টার্ন স্কুল' বা 'পূর্বী রীতি'র স্থাপত্য-ভাস্কর্য বাংলায় পাল-সেন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভূত হয় এবং সংলগ্ন অঞ্চলের শিল্পকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। এই শিল্পরীতিপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায় মুসলমান-আক্রমণের পর থেকে[২০] অর্থাৎ খ্রী. ত্রয়োদশ শতক থেকে। কিন্তু মুসলমানবিজয়ের পরও দূরবর্তী স্থানে দেউল মন্দির নির্মাণ চলেছিল বিক্ষিপ্তভাবে। যেমন, আনুমানিক চতুর্দশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়ার ডিহরে সারেশ্বর ও শৈলেশ্বরের মন্দির। এই দুই মন্দিরের 'শিখর'- অংশের বেশির ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে (শুধু নীচের গর্ভগৃহটি বর্তমান)।

পাল-সেন আমলে, বিশেষভাবে, সেন-শাসনাধিকারে এই আঞ্চলিক 'পূর্বী রীতি'র শিখর - দেউল যে নেহাৎ কম ছিল না, তার অজস্র প্রমাণ পূর্বোক্ত মন্দিরগুলি ছাড়াও পাওয়া গেছে হুগলি জেলার ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়ায় এবং (মালদহের) গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে। এই ধরণের বেশ কিছু মন্দির ও প্রাসাদ-সৌধ ছিল, যেগুলি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয় এবং মসজিদ-মাজারের নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে সুবিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি

ভেঙে ফেলে সেগুলি দিয়ে গৌড় ও পাড়ুয়ার রাজধানী এবং বিশালাকার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়।[২১] এই ভাবে পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদ'-টি সম্পূর্ণ হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও লক্ষ্মণাবতীতে সেন-রাজাদের প্রাসাদের ভগ্ন অংশ থেকে নির্মিত হয়েছিল। (নির্মাণকাল ৭৭০ হিজিরা বা ১৩৬৯ খ্রীস্টাব্দ) এই মসজিদে যে তিনশ'টি কারুকার্যযুক্ত স্তম্ভ বর্তমান, সেগুলি সবই পাওয়া যায় হিন্দু সৌধ থেকে। তাছাড়া, 'বাদশাহ-কা-তখ্ত' এর প্রবেশদ্বার পথটিও কোন হিন্দুসৌধের বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। এ বিষয়ে পার্সি ব্রাউন বলেছেন : '..... the Adina Mosque presents a certain grave and stately dignity .... None of the stone work is original, it was all stripped from pre-existing Hindu structures at Lakhnauti and places in its immediate neighbourhood . It is very doutful whether the Moslem overlords ever obtained any of their stone from the natural sources of the Rajmahal quarries, all their masonry being evidently composed of ready-made spoils. Proofs of this may be seen in many parts of the Adina mosque, of carved blocks being inserted with their figure-surfaces embedded in the interior of the walls, as in the nimbar of the sanctuary; of whole door-ways being placed wherever required as in the entrance to the Badshah-Ka-Takht, and there is good reason to believe that all the three hundred pillars have been appropriated from Hindu structures. Many temples and places appear to have been dismantled to provide the amount of stone required and it is not improbable that the finest monuments of the Hindu capital of Lakhnauti were demolished in order to produce this one Mohammedan mosque.'[২২]

পাল-সেন আমলে তৈরি কিছু কিছু উচ্চ 'শিখর' দেউল-মন্দির হুগলি ও বর্ধমান জেলায় ছিল বলে জানা যায়। মুসলমানবিজয়ের পর বিশেষভাবে হুগলির কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে পাড়ুয়ায় (হুগলি) সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরদুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরদুটির ধ্বংসাবশেষ দিয়ে পাড়ুয়ার 'বাইশ দরওয়াজা' মসজিদ ও পার্শ্ববর্তী পঞ্চতলযুক্ত বিজয়স্তম্ভটি তৈরি হয়। 'বাইশ দরওয়াজা' মসজিদের ভিতর কালো বেসল্ট পাথরে নির্মিত ও সুন্দর খোদাই কাজ যুক্ত যে বহু থাম লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি সূর্যমন্দিরেরই অংশ এবং ঐ স্থানেই মসজিদটি নির্মিত হয়। বর্তমানে ভগ্ন ঐ মসজিদটি খুবই বিশাল আকারে সেসময় নির্মাণ করা হয়। মসজিদটি সম্পর্কে পার্সি ব্রাউন অনুমান করেন, যদি এটি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়েরও আগে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে এই বাইশগম্বুজ মসজিদটি পূর্বোক্ত বিশালায়তন প্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের আদর্শস্থানীয় ছিল। কারণ, আদিনা মসজিদটি তৈরি হয় ১৩৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৩৭৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সিকন্দর শাহের সময়।[২৩] অবশ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মসজিদটি নির্মিত হয় হিজিরা ৭৭০ বা ১৩৬৯ খ্রীস্টাব্দে। (দ্র. 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ')। নারায়ণ মন্দিরটির স্থানে যে বিজয়স্তম্ভ (মিনার) নির্মিত হয়, সেটি সম্ভবত মুসলিম সন্ত শাহ্ সুরি-উদ্দীনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। তিনি সে সময় পাড়ুয়ার রাজাকে পরাজিত করে এই স্মারক বিজয়স্তম্ভটি স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভ বা মিনারের প্রবেশপথের ইঁটের দেওয়ালের একস্থানে প্রায়-বঙ্গাক্ষরে (প্রোটো-বেঙ্গলি) খোদিত একসারি লিপি উল্টো করে বসানো আছে দেখা যায়। সম্ভবত সেটি কোন হিন্দুমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শাহ্ সুরি-উদ্দীন বা শাহ্ সুফীর প্রসিদ্ধ মাজার নিকটেই অবস্থিত। একগম্বুজযুক্ত কতকটা 'চারচালা'-রীতির এই 'আস্তানা'র প্রাঙ্গণে কালো বেসল্ট পাথরে খোদিত তিনটি আরবী লিপি লক্ষ্য

করা যায়। বড় শিলালিপির পিছনদিকে মস্তকবিহীন ভগ্ন একটি সূর্যমূর্তি বর্তমান। সারথি অরুণ সূর্যের সাতটি অশ্বকে বল্গা আকর্ষণ করে সংযত করেছেন। রথে সূর্যদেব দন্ডায়মান। তাঁর দু'পাশে দুই পার্শ্বদেবতা এবং নীচে বৈতালিক। সূর্যের দুই পদযুগলে হাঁটু পর্যন্ত জুতো পরা দেখা যায়। মূর্তিটির অলঙ্করণ লক্ষ্য করে এটি নিশ্চিতরূপে সেন-আমলের মনে করা যায়। মূর্তিটি নিশ্চয়ই পূর্বোক্ত ধ্বংস -প্রাপ্ত সূর্যমন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল। আরও যে দুটি ক্ষুদ্র শিলালিপি-খন্ড আছে তারও পিছনদিকে দেবদেবী মূর্তি যে ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই 'আস্তানা'র পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসায় ও আস্তানার প্রবেশপথে বেসল্ট পাথরের সুন্দর থাম লক্ষ্য করা যায়। এগুলি সবই হিন্দুমন্দিরের অংশ, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে উক্ত দুটি মন্দিরকে রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৫-১৪৭৪ খ্রী) পুত্র শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রী.) সময়ে যথাক্রমে মসজিদ ও মিনারে রূপান্তরিত করা হয়।[২৪]

পাণ্ডুয়ার আরও দক্ষিণে ভাগীরথী-তীরবর্তী ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর যে কবরটি আছে সেখানেও বিধ্বস্ত প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের 'রিলিফে' খোদিত বহু বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তি উল্টো করে কবরের ইঁটের দেওয়ালে বসানো আছে। এছাড়া আরও অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেওয়ালে স্থাপিত। তাছাড়া, প্রায়-বঙ্গাক্ষরে খোদিত 'সীতাবিবাহঃ' প্রভৃতি মূর্তিভাস্কর্যের পরিচয়জ্ঞাপক ফলকও বসানো আছে। এই কবরের পাশে একটি মসজিদে যে আরবী লিপিফলক পাওয়া যায়, তার পাঠোদ্ধার থেকে ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দ প্রতিষ্ঠাকাল বলে জানা যায়। মসজিদটি যদিও অত পুরানো নয় বা পরবর্তী বহুবার সংস্কারের চিহ্ন এতে আছে, তবুও এই সময়ের আগে এই স্থান যে মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। জাফর খাঁ গাজী সম্ভবত এই অঞ্চল জয় করেন। বিজয়ী মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দুমন্দির ধ্বংসকর্ম অন্তত পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মধ্যে হুগলি, বর্ধমান ও অন্যান্য স্থানের বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীমূর্তিগুলি ভগ্ন ক'রে নদী বা দীঘিতে নিঃক্ষিপ্ত করা হয়। পাল-সেন পর্বের যে মন্দির-স্থাপত্যরীতি পূর্ব ভারতে বিকশিত হয়েছিল, তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায় মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে। বস্তুতঃপক্ষে, মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে পাল-সেন আমলের 'শিখর'-মন্দিরনির্মাণ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমানে যে ক'টি ঐ শৈলীর মন্দির টিকে রইল, সেগুলিও ছিল সেসময়ে পরিত্যক্ত জৈন মন্দির। তাই হয়তো সেগুলি কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে গেল। সেগুলি আমাদের কাছে সেযুগের শিখর-মন্দিরশৈলীর মূল্যবান দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে রইল। পরবর্তীকালে ঐ মন্দিরগুলিতে কোন কোন হিন্দুদেবদেবীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত হয়েছিল। অপরপক্ষে, দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষ করে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ওড়িশী স্থাপত্য-শৈলীর মন্দির বেশী সংখ্যায় নির্মিত হ'তে থাকল। এই দিকে ওড়িশার গঙ্গ-বংশীয় রাজাদের খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে যে প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়, তা অন্তত ওড়িশায় পাঠান-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বজায় থাকে। মুসলমান-আক্রমণের হাত থেকে সেকারণে এই অঞ্চলের অনেক মন্দির রক্ষা পেয়ে যায়।

ওপরের আলোচনায় এটা বোঝা যায়,বাংলায় সুলতানী শাসনকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সব থেকে বেশি বিশেষ করে, সু-উচ্চ 'শিখর'-মন্দিরগুলি। এই ধরণের উচ্চ মন্দির-নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয় এবং যেগুলি ছিল, সেগুলিও ধ্বংস করা হয়। (দ্রষ্টব্য, 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী, ফাল্গুন ১৩১২) তার ফলে, প্রাক্‌মুসলিম যুগের এইরূপ মন্দিরের ঐতিহ্য পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্যোত্তর যুগে নতুন রীতির মন্দিরগুলিতে আর

অনুসৃত হয় নি। সেইজন্য সেনযুগের ঐতিহ্য একেবারে হারিয়ে গেল। নতুন রীতির মন্দির সম্পর্কে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হলেও এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরশিল্পে যে নতুন ধারার উদ্ভব হোল, সে এক অন্য ইতিহাস।

মন্দিরশৈলীর আলোচ্য পূর্বোক্ত চারটি ধারার মধ্যে তৃতীয় ধারাটি হোল হিন্দুবৌদ্ধ, যেগুলির নিদর্শন প্রাচীন বিহারগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিহিত। এই মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী-সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা করা কঠিন। বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুরে (রাজশাহী জেলা) পালসম্রাট ধর্মপালদেবের প্রতিষ্ঠিত 'সোমপুরবিহার' নামক মহাবিহারে মন্দিরপ্রাচীর ও মন্দির-দেওয়ালে পোড়ামাটির বহু মূর্তিফলক পাওয়া গেছে। এখানে একটি বিশালায়তন প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এটি 'শিখর'-শীর্ষ ভদ্র-রীতির ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা: সরসীকুমার সরস্বতী, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৩৯)। বিহারটি বিখ্যাত পালসম্রাট ধর্মপাল- কর্তৃক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়। এই মহাবিহারটি ছাড়া বাংলাদেশের মহাস্থানগড় (বগুড়া) রংপুরের বিরাটে পাহাড়পুর মন্দিরের সদৃশ একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও ময়নামতীর (কুমিল্লা) বিহারের ধ্বংসাবশেষও উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবাংলার কর্ণসুবর্ণে 'রক্তমৃত্তিকা' বিহার ছিল। এখানকার 'রাজবাড়িডাঙ্গা'য় একটি পঞ্চায়তন মন্দিরেরও চিহ্ন পাওয়া গেছে। এটি আনুমানিক গুপ্ত বা তার কিছু পরবর্তী কালের বলে অনুমান। ('পঞ্চায়তন' বলতে মূল মন্দিরের চারকোণে চারটি মূলমন্দিরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দির একই পীঠিকায় স্থাপন করা হোত।) কেন্দ্রের প্রধান মন্দিরটি ছিল 'ত্রিরথ'। 'রাজবাড়ীডাঙ্গা'র এই 'পঞ্চায়তন' মন্দিরগৃহ (টেম্পল কমপ্লেক্স) গঠিত হয়েছিল এইভাবে। (১) (একটি প্রশস্ত চত্বরের চারদিকে) আয়তক্ষেত্রাকার বহিঃপ্রাচীর (২) চারকোণে চারটি বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির (৩) প্রধান (কেন্দ্রীয়) মন্দিরটি ছিল 'ত্রিরথ' (৪) উত্তর দিকে ছিল একটি আয়তক্ষেত্রাকার মণ্ডপ, সুরকির দ্বারা গঠিত একটি মঞ্চ প্রভৃতি। চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের পশ্চিমদিকের দৈর্ঘ্য ২০·৮৭ মি. এবং এর দক্ষিণ দিকের সামনে পীঠিকায় কয়েকটি 'অভিক্ষেপ', এদিকে আছে কয়েকটি সুন্দর কুলুঙ্গি।

আয়তক্ষেত্রাকার প্রধান মন্দিরের আয়তন ৭·৮৪ x ৭ মি.। এর উত্তরদিকে প্রবেশপথ বাদ দিয়ে তিন দিকের দেওয়ালে 'রথ'-বিন্যাস থাকায় এটি 'ত্রিরথ'-শ্রেণীর ছিল। প্রধান মন্দিরটির ভিতরের আয়তন ৪·৪১ x ৩·৪ মিটার, মেঝে সুরখিতে গঠিত হ'য়ে ইঁট বিছিয়ে উঁচু করা হয়েছিল। প্রধান মন্দিরটির উত্তরদিকে আয়তক্ষেত্রাকার মণ্ডপটি, যার আয়তন ৬·০৯ x ৪·৫৭ মিটার, পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের দক্ষিণদিকে অপর একটি লম্বাকার আয়ত (অবলং) মন্দিরগৃহ ছিল। তার মধ্যে ছিল দেওয়াল, মঞ্চ এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবেশপথমঞ্চ। এগুলি ছিল একটি আয়তক্ষেত্রাকার ভিত্তির উপর। চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ে একটি বিশাল-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও লক্ষ্য করা গেছে। মন্দিরটির 'গর্ভগৃহ' ছিল বড়ো এবং বর্গক্ষেত্রাকার। এর তিন দিকের দেওয়াল ছিল উদ্‌গত বা ত্রিরথযুক্ত এবং চারপাশ প্রদক্ষিণপথযুক্ত। সম্মুখে সংলগ্ন একটি আবৃত আয়তক্ষেত্রাকার অন্তরাল ('ভেস্টিবিউল') ও তৎসম্মুখে একটি আয়তক্ষেত্রাকার উন্মুক্ত 'মণ্ডপ'-এ ওঠার জন্য ছিল সোপানশ্রেণী প্রভৃতি।[২৫] এই ধরণের মন্দির গুপ্তযুগের গোড়ার দিকের মন্দির-স্থাপত্যে বহুল প্রচলিত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পূর্ব দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামে যে প্রাচীন একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল, সেটি জনৈক শিবনন্দীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ-স্বামীর মন্দির বলে সনাক্ত করা গেছে। ১২৮ গুপ্তাব্দে লিখিত একটি তাম্রপট্টে (খ্রী.৪৪৭-৪৪৮) একথা জানা যায়। এর বর্গক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের

চারপাশে বেষ্টিত ছিল একটি প্রদক্ষিণপথ। এর চারদিকে ছিল দেওয়াল। পশ্চিমদিকে ছিল এর একমাত্র প্রবেশদ্বার। ভূমি-নকশা থেকে এটা স্পষ্ট। গুপ্তযুগের আদি মন্দিরগুলির একটি বিশেষ শৈলী, যা ছিল সমতল ছাদযুক্ত এবং চারদিকে একটি প্রশস্ত লম্বা প্রদক্ষিণপথযুক্ত বহিঃকক্ষের দ্বারা আবৃত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মন্দিরটির ছাদের গঠন সম্পর্কে জানা যায় না।[২৬]

বাংলার মন্দিরশিল্পধারার চতুর্থ বিভাগটি হোল, তার নিজস্ব রীতি— 'চালা'। এর উদ্ভব বহু প্রাচীনকালে হলেও শেষ-মধ্যযুগের বাংলায় এই 'চালা' নতুন ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার গ্রামাঞ্চলের কাঠ, বাঁশ, খড়ের চাল দেওয়া 'মেটে' ঘর বা পাতার ঘর বা খড়ের ঘর বহু প্রাচীন কাল থেকেই সাধারণ মানুষের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই এই ধরণের লোকপ্রচলিত ও ব্যবহৃত আবাসগৃহ দেবমন্দিররূপেও স্বীকৃত হয়েছিল। একে কেউ কেউ 'লোকায়ত'বা 'লোক- স্থাপত্য' বা 'ফোক্ আর্কিটেকচার' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭] পার্সি ব্রাউনের মতে, বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্থাপত্যভাবনার 'দেশজ রূপ' ('ইণ্ডিজিনাস ফর্ম') এই সৌধ-শিল্প বা 'চালা'। এর ঢালু চাল, বাঁকানো কার্ণিশ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এসেছে সুদীর্ঘ কালের কাঠ, বাঁশ ও খড়ের 'চালা' থেকে। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের নয়, বাংলার সর্বাংশেই 'চালা'-কুটির সাধারণ মানুষের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তবে দক্ষিণ বাংলায় এই 'চালা' ঘর বড়ো সুঠাম, সাবলীল ও প্রাণবন্ত, কার্ণিশের বা ছাঁচার বক্র আকার নয়নাভিরাম — এরূপ আর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। তাই এদিকের 'চালা'-শৈলীর মন্দিরগুলির খুবই ঢালু চাল ও ধনুকের মতো বাঁকানো কার্ণিশ (যাকে চলতি কথায় 'ছাঁচা' বলা হয়) এত স্বাভাবিক মনে হয়, অন্য কোথাও সেরূপ মনে হয় না। অন্যান্য জেলায় যেমন, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে চালার চাল কতকটা খাড়া হয়ে উপরে উঠে যায়। বিশেষ করে 'চারচালা'র ক্ষেত্রে। শুদ্ধভাষায় এটি 'গৌড়ীয় রীতি'র অন্তর্গত। পুরীর 'মার্কণ্ডেয় সরোবরে'র কাছে একটি সুদৃশ্য 'চারচালা'-রীতির মন্দির এই শৈলীর এক পরিচ্ছন্ন রূপ। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বহু স্থানে, যেমন, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলিতে 'চালা'-শৈলীর অজস্র মন্দির আছে।

প্রাচীন বাংলায় বহুল প্রচলিত 'শিখর'-দেউলের পূর্বোক্ত নিদর্শনগুলি থেকে যেমন আমরা ঐ রীতির স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা করতে পারি, সেরূপ 'চালা'-শৈলী সম্পর্কে করা যায় না। কারণ, এই স্থাপত্য-শৈলী বেশ প্রাচীন হলেও বাংলায় প্রাক্-মুসলিম যু.গর এর কোন নিদর্শন আমরা পাই না। কিন্তু প্রাচীনকালে এই শৈলীর মন্দির ভারতে অপরিচিত ছিল না। 'চালা'র এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, তামিলনাড়ুর মামল্লপুরম-এ (মহাবলীপুরম) দ্রৌপদীর 'চারচালা'-শৈলীর 'রথ', যা খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে 'পল্লব'রাজাদের আমলে নির্মিত। এছাড়া, সারনাথ থেকে পাওয়া শুঙ্গযুগের একটি স্তম্ভে 'রিলিফে' খোদিত 'দোচালা'-মন্দিরের প্রতিকৃতিও লক্ষ্য করা গেছে।[২৮] এর থেকে 'চালা'র প্রাচীনত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু সুলতানী আমলে নব-উদ্ভাবিত 'চালা'র মতো প্রাচীন বাংলায় 'ভদ্র' রীতির মন্দির যে জনপ্রিয় ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য মূর্তিভাস্কর্যে। এইসব মূর্তিকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির দেউলে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা গেছে। 'পিঢ়ে'র সর্বপ্রাচীন রূপটি ঢাকার আশরফপুর ব্রোঞ্জ চৈত্যে লক্ষ্য করা যায়। এটি আনুমানিক খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের। এর রূপটি হল, দুটি থামের ওপর ছাদ ক্রমহ্রস্বায়মান দুটি 'পিঢ়া' বা 'থাকের' সমষ্টি। সর্বশেষ থাকের ওপরে 'স্তূপিকা' ('ফিনিয়েল') ক্রমে এই ছাদের 'থাক' আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অলঙ্কৃত হয়। যেমন, দিনাজপুরের হিলি থেকে

পাওয়া কল্যাণসুন্দরের মূর্তি যা বর্তমানে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদে' অবস্থিত।[২৯] এতে তিনটি 'পিঢ়া' লক্ষ্য করা যায়। তার ওপরে একটি ক্ষুদ্র 'বেকি'(ঘাড়), ওপরে একটি গোলাকার পাথর (কিন্তু 'আমলক' নয়) এবং সকলের ওপরে 'মোচাকৃতি' 'স্তূপিকা' ('কনিক্যাল ফিনিয়েল')। এগুলির সব ক'টিরই একটিমাত্র প্রবেশপথ আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধরণের প্রতিকৃতি মন্দিরগুলির সামনে তিনটি 'খিলান'-প্রবেশপথ ও ছাদে তিন, চার ও পাঁচটি করে 'পিঢ়া' স্থাপিত হ'তে থাকে। এর সকলের ওপরে স্থাপিত হয় 'আমলক' ও তার ওপরে 'কলশ', বৌদ্ধ মন্দির হলে 'স্তূপ' শীর্ষদেশে থাকে। এই ধরণের কয়েকটি নিদর্শন হোল, চব্বিশ পরগণার কুলদিয়ায় সূর্যমূর্তি, রাজশাহীর (বাংলাদেশ) বড়িয়ায় সূর্যমূর্তি, ঢাকা বিক্রমপুরের রত্নসম্ভবমূর্তি, মধ্যপাড়া (ঢাকা) থেকে বুদ্ধমূর্তি, মন্দৈল (ঢাকা) থেকে দ্বারপ্রস্তরের কুলুঙ্গীতে খোদিত ঈশানের মূর্তি এবং কুমারপুর (ঢাকা) থেকে পাওয়া কোন স্থাপত্যের ভগ্ন অংশ যাতে পিঢ়-মন্দিরের 'পঞ্চরথ' বিন্যাস আছে। উল্লিখিত প্রায় সব মন্দির-প্রতিকৃতিতেই 'রথপগ' বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীন বাংলায় এই ধরণের মন্দির 'রথপগ'-বিন্যাস যুক্ত হয়েই নির্মিত হোত। কুমারপুর থেকে পাওয়া নিদর্শনটিতে দেখাযায় মন্দিরের ছাদ চারটি 'পিঢ়া'র সমষ্টি, 'বেকির' ওপর বৃহৎ 'আমলক'-শিলা বিসদৃশ আয়তনের। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরচত্বরে যে 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির 'নন্দীমণ্ডপ'-টি আছে, তার ছাদ ক্রম-হ্রস্বায়মান তিনটি থাকের সমষ্টি; চারটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের ওপর এটি অবস্থিত। এটির শীর্ষদেশে কোন 'আমলক'-শিলা বা কোন 'স্তূপিকা' নেই। তবুও এর থেকে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, আমাদের প্রাচীন বাংলায় এই রীতির মন্দিরগুলির আকৃতি কীরূপ ছিল। ব্রহ্মদেশে (বার্মা) যে বহু 'থাক'-বিশিষ্ট 'প্যাথ্যাৎ' (সংস্কৃত 'প্রাসাদ') বা 'প্যাগোডা' লক্ষ্য করা যায় এবং নেপালেও এ ধরণের অনেক মন্দির দেখা যায়, তা প্রাচীন বাংলার এই 'ভদ্র'-রীতির দেউলগুলির অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল, একথা কেউ কেউ মনে করেন। এ সম্পর্কে সরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন ঃ "This lost temple-type of Bengal travelled further. In Siam, Cambodia, Campa, Java and Bali a series of temples closely approximates in general shape and outline, this pyramidal type. These temples or towers are simple sanctuaries which rise in storeys, each storey set back, so as to form the stepped pyramidal roof to be seen in the Bengali sculptures described above. These storeyed pyramids appear to be derived from the terraced roof of the ancient Bengali temples we have noticed before. The contact of Bengal with the Indonesian countries is a well known fact ....."(S.K. Saraswati. 'Temples of Bengal', Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol II,1934. PP 136 -140)

উপরিউক্ত প্রতিকৃতি দেউলগুলির ভূমি-নক্শায় চতুষ্কোণ গর্ভগৃহটির প্রতিদিকের দেওয়ালে এক বা দুই 'রথ'-বিন্যাস থাকায় ক্রুশাকারের বা 'রেখে'র (Cruciform) সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও সর্বপ্রাচীন আশরফপুর ব্রোঞ্জ চৈত্যের 'পিঢ়া'য় এই বক্রাকার রেখা-বিন্যাস ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে এই বক্ররেখা-বিন্যাস বা 'রথ'-বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এটাও বাংলার খোড়ো চালের আদলে তৈরি বলে কারও কারও ধারণা। কেননা, সেকালে মাথার সঙ্গে ওপরে খড়ের চালকে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে বহু ক্ষেত্রে এইভাবে বাঁধা হোত[৩০] প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে চালকে রক্ষা করার জন্য। 'পিঢ়া'য় 'রথ'-বিন্যাসগুলির সৃষ্টি সম্ভবত এই কারণেই হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার উপরিউক্ত মূর্তিগুলি ছাড়াও পাণ্ডুলিপিতে চিত্রিত কোন কোন মন্দিরের প্রতিকৃতি

থেকে আমরা সেকালের স্থাপত্যশৈলী-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ক'রতে পারি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপিতে কুমিল্লা জেলার (বাংলাদেশ) চম্পিতলার লোকনাথদেবের দণ্ডায়মান চিত্রটি রয়েছে একটি 'আটচালা' কুটিরে। পাণ্ডুলিপির অনুলিপি হয় নেপালে ১০১৫ খ্রীস্টাব্দে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন বাংলায় আমাদের মন্দিরশৈলী কীরূপ ছিল। বাংলার গ্রামাঞ্চলে একালের মতো সেকালেও খোড়ো 'দোচালা', 'চারচালা', 'আটচালা' প্রভৃতি প্রচুর তৈরি করা হোত। একটি উচ্চ 'চারচালা' খোড়ো ঘরের নীচের চারপাশের দেওয়াল থেকে আরও চারটি চাল তৈরি ক'রে 'আটচালা'র সৃষ্টি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এর অনুকরণেই 'আটচালা' মন্দিরের সৃষ্টি।[৩১] প্রাচীন বাংলার এই ধরণের দুটি 'পিঢ়া'-বিশিষ্ট মন্দির পরবর্তীকালে 'আটচালা'য় রূপান্তরিত বলে কারও কারও অভিমত। এই দুটি 'পিঢ়া'র মধ্যে ওপরের 'পিঢ়া'টি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, এখনকার 'আটচালা'য় যেমনটি দেখা যায়।

সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় এই 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির দেউল থেকেই শেষ-মধ্যযুগে আমাদের বাংলার 'চালা'-র পরিণত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। বাঁশ, কাঠ, খড় ও দড়ি দিয়ে যখন মাটির বা 'ছিটেবেড়া'র ঘরের ওপরের দুটি চাল বা চারটি চাল ছাওয়া হয়, তখন কাঠ,বাঁশ ও দড়ি দিয়ে চারচালা কাঠামো তৈরি করে নীচ থেকে প্রতিদিকের চালে এক একটি ক'রে 'থাক' বাঁধা হতে থাকে। প্রতি থাকের ওপরে ওপরে সব থাকগুলি বাঁধা হলে একেবারে শীর্ষস্থানে (Apex) 'মটকা' বাঁধা হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই 'থাক'গুলিকে তখন আর আলাদা ক'রে চেনা যায় না। সব থাকগুলি সমষ্টিগতভাবে একটি চালের সৃষ্টি ক'রে। 'দোচালা' ঘর হ'লে সামনে ও পিছনে এই ধরণের বহু থাকযুক্ত দুটি 'চাল' এবং 'চারচালা' হ'লে চারদিকে এইরূপ চারটি 'চাল' হয়। 'আটচালা' ঘর হলে বহু ক্ষেত্রে মাটির দ্বিতল ঘর তৈরি ক'রে ওপরের চারটি চাল তৈরি করে নিতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওপরের কোন তল না করে একটি উচ্চ চারচালারই চারপাশ কৌশলে এমনভাবে কাটা হয়, যাতে ওপরে একটি ছোট চারচালের সৃষ্টি হয়। একে কাটা 'আটচালা' বলা হয়। বহু গ্রামে এই ধরণের কাটা 'আটচালা' লক্ষ্য করা গেছে। এইরূপ কাটাচালের 'আটচালা' পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছে অনেক, যাকে 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' বলা হয়।

প্রাচীন 'ভদ্র'-রীতির দেউলগুলি উপরিউক্ত চালের 'থাক'-গুলির সুস্পষ্ট নির্দেশক। কোন কোন ক্ষেত্রে, নীচের ও ওপরের থাকের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা রেখে একটি তলের সৃষ্টি করা হয় এবং সেই তলে কখনও কখনও মূর্তিও বসানো হয়। বর্তমানের টালির ছাওয়া চালে থাকগুলি স্পষ্ট থাকে বলে 'পিঢ়া'-দেউলগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য স্পষ্ট। তাছাড়া, 'পিঢ়া'গুলির প্রান্তদেশের উদ্‌গত অংশ (অফসেট) টালিতেও দেখা যায়। তাই, এখনকার টালির ছাওয়া ঘরের সঙ্গে 'পিঢ়া'-দেউলের নিকট-সাদৃশ্য স্পষ্ট। প্রাচীন বাংলার 'পিঢ়া' বা 'ভদ্র'রীতির দেউলগুলি এই 'থাক'-বিশিষ্ট খড়ের বা পাতার ছাওয়া 'চালা' ঘরের আদলে তৈরি হয়েছিল, ওপরের আলোচনা থেকে এই ধারণা করা যেতে পারে। কারণ, সে সময়ে যেসব কুটির ছিল, তার চাল ঐরূপ 'থাক'-যুক্ত নিশ্চয়ই ছিল। যেমন, এখনও অনেক গ্রামের ঐরূপ থাকযুক্ত চাল আমরা লক্ষ্য করছি। যোল-সতেরো শতকে তৈরি এইরূপ 'থাক' যুক্ত বহু মন্দির আছে, বিশেষ ক'রে, মেদিনীপুর জেলায় এগুলি বেশি দেখা যায়। ওড়িশী স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব এগুলিতে পড়লেও বাংলার চালু খড়ের চালের আকার এতে ধরা পড়েছে। তাই এদের থাকগুলি খাড়া ও সোজা না হয়ে কতকটা ঢালু হয়েছে। যেমন, পঁচেটের কিশোররায়ের 'জগমোহন' বা মালঞ্চের নন্দেশ্বরের 'জগমোহন'। সাঁকোয়ার (খড়্গপুর লোক্যাল) চন্দনেশ্বরের দেউলের 'পিঢ়া' কতকটা ঢালু

হয়ে গেছে ঠিক 'চালা'র মতো। তবে নেড়াদেউলে (কেশপুর থানা) কামেশ্বরের 'জগমোহনে' চালার ছাপ বেশ স্পষ্ট।

প্রাক্-মুসলিম যুগের একটি পিঢ়া-দেউলের সন্ধান আমরা পেয়েছি।[৩২] মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার ডাইনটিকরি গ্রামের তথাকথিত রঙ্কিণীদেবীর মন্দির। মন্দিরটি বহু কাল পরিত্যক্ত। রঙ্কিণী এই মন্দিরে পরে অধিষ্ঠিতা হলেও আদিতে এটি একটি জৈনমন্দির ছিল বলে অনুমান করা যায়। মন্দিরটি কাঁসাই নদী-তীরবর্তী। মন্দির জীর্ণ হলেও এখনও মোটামুটি অক্ষত। তবে ছাদের সাতটি 'পিঢ়া' ভগ্ন ও খুবই জীর্ণ। মন্দিরের চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের চারদিকের দেওয়ালে 'রথ'-বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত ছাদের 'পিঢ়া'গুলিতেও 'রথ'-বিন্যাস ছিল। এখন আর বোঝা যায় না। এটি প্রাচীন বাংলার 'পিঢ়'-দেউলের একটি নিদর্শন। তবে এটিকে সম্পূর্ণ ওড়িশী প্রভাব বর্জিত বাংলার নিজস্ব 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির দেউল বলে মনে করা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত মূর্তিভাস্কর্যগুলিতে উৎকীর্ণ 'পিঢ়' দেউলগুলির স্বরূপ আলোচনা ক'রে প্রাচীন বাংলায় এ ধরণের যে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের পর সেগুলির প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে, বিশেষ ক'রে হুগলি, বর্ধমান ও গৌড়ে। এই রীতির মন্দির ঐ অঞ্চলে ছিল বলে অনুমান করা যায়।

'শিখর' ও 'পিঢ়'-রীতির মন্দিরের পর আর একটি রীতির মন্দির সম্পর্কে জানা যায়, কোন কোন প্রাচীন মূর্তিভাস্কর্য ও চিত্র থেকে। এটি 'ভদ্র' ও 'শিখর' পরস্পর যুক্ত ক'রে নির্মাণ করা হোত। এটিকে 'শিখর-ভদ্র' বলা চলে। এই রীতির মন্দির প্রাচীন বাংলায় যে ছিল, তা নলিনীকান্ত ভট্টশালী কোন কোন মূর্তিভাস্কর্য থেকে আবিষ্কার করেন। একটি ভদ্ররীতির মন্দিরের ওপরে একটি 'রেখ' বা 'শিখর'-রীতির মন্দিরকে চূড়ারূপে মূর্তিভাস্কর্যে দেখানো হয়েছে। ফুসার (Foucher) তাঁর Iconographic Bouddhique গ্রন্থে লেখযুক্ত যে প্রতিকৃতি মন্দিরের চিত্র দিয়েছেন, তাতে আছে, পুণ্ড্রবর্ধনের ত্রিশরণবুদ্ধ ভট্টালক এরূপ একটি মন্দিরে অধিষ্ঠিত। এটিও প্রাক্-মুসলিম বাংলার মন্দিরের অন্যতম একটি নিদর্শন। আরও তিনটি মূর্তিভাস্কর্য — অরপচন মঞ্জুশ্রী (বাংলার কোন এক স্থান থেকে পাওয়া যায়), দ্বিতীয়টি হোল বুদ্ধের, যা ঢাকা জেলার মহাকালী থেকে পাওয়া গেছে এবং তৃতীয়টি খুলনা জেলার শিববাটী থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি। ঐগুলিতেও ঐ একই ধরণের মন্দিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা গেছে। ডুরোসিল (Duroiselle) একসময় এই রীতির মন্দিরের উদ্ভব উত্তরভারতীয় মন্দির থেকে বলে উল্লেখ ক'রে পরে তা দক্ষিণভারতীয় মন্দিরের আদর্শে উদ্ভূত হয় বলে বলেন। কিন্তু বাংলায় পূর্বোক্ত মূর্তিগুলিতে এই রীতির মন্দিরের মূল আদর্শপ্রতিরূপ উৎকীর্ণ থাকায় বাংলাতেই এই রীতির উদ্ভব, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।[৩৩]

এই রীতির মন্দিরের কোন নিদর্শন আজ আর নেই। কিন্তু মূর্তিভাস্কর্য ও চিত্রে এর অবিকল প্রতিরূপ (Replica) এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, এই রীতির মন্দির সেসময় বাংলায় প্রচলিত ছিল। সরসীকুমার সরস্বতী এই রীতিকে 'শিখরশীর্ষভদ্র' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া তাঁর মতে চার শ্রেণীর মন্দির প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল ঃ ভদ্র বা পিঢ়া দেউল, রেখ বা শিখর দেউল, স্তূপশীর্ষ পিঢ়া বা ভদ্র দেউল এবং শিখর শীর্ষ 'পিঢ়া' বা 'ভদ্র' দেউল।[৩৪] এর মধ্যে প্রথম দু শ্রেণীর অল্প যে কয়েকটি নিদর্শন এখনও বর্তমান, তা পূর্বে বলা হয়েছে। পরবর্তী শ্রেণীর স্থাপত্য সম্ভবত তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 'শিখরশীর্ষভদ্র' দেউলকে আমরা শেষ মধ্যযুগে উদ্ভাবিত 'রত্ন'-মন্দিরের মূল আদর্শ বা আদিরূপ (archetype) বলে মনে করতে পারি।

৩

মধ্যযুগের মন্দিরস্থাপত্যের উদ্ভব ও ইসলামী ধর্মীয় স্থাপত্য

প্রাক্-মুসলিম যুগে বাংলায় মন্দির স্থাপত্যশৈলীর বিকাশধারার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে কয়টি রীতির মন্দিরের কথা জানা গেল, সেগুলির উদ্ভব ও বিকাশ — এই দুটির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা। পালরাজাদের দীর্ঘকালের রাজত্বে বাঙালির জাতিত্ববোধের উন্মেষের ফলে সাহিত্য ও মন্দিরস্থাপত্যশিল্পের যে ঐতিহ্যভিত্তিক আঞ্চলিক বিকাশ আশাতীতভাবে সংঘটিত হয়, তার ছেদ পড়ে মুসলমানবিজয় থেকে। বাংলার ইতিহাসে এ এক ক্রান্তিকাল বা যুগ-সন্ধিক্ষণ। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের ইতিহাসেও এল এক নবযুগ।

দিল্লী এবং সারা ভারতে ও বাংলায় সুলতানী শাসনের প্রথম দু'শ বছর ছিল ঘৃণা, ধর্ম-বিদ্বেষ ও ধ্বংসের যুগ। সে সময় বাংলার সুলতানেরা ছিল দিল্লীর তুর্কী সুলতানের অধীন। তাদের অঙ্গুলি-সংকেতে চলত সারা দেশ। তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল হিন্দুদের বিশালকায় দেবমন্দিরগুলি একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলা এবং তার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে বড়ো মসজিদ ও মাজার তৈরি করা। কতো পবিত্র ও প্রসিদ্ধ মন্দির যে তারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এবং অপরূপ ভাস্কর্য নিদর্শন বিভিন্ন দেবমূর্তিগুলিকে তারা বীভৎসভাবে ধ্বংস করেছিল, তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ-সম্পর্কে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ' নামক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বাংলাতে এই ধ্বংসকার্য চলেছিল পুরোদমে। বাংলায় সর্বপ্রাচীন মুসলমান বসতি গড়ে ওঠে হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে। এখানকার বহু স্থান মুসলমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরবর্তী একটি বিষ্ণুমন্দিরকে জাফর খান গাজীর সমাধিস্থানে পরিণত করা হয়, যার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য মন্দির ও দেবস্থানগুলি কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সে ইতিহাস পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পার্সি ব্রাউন বলেছেন ঃ ভারতে মুসলমানদের আগমনে একটি যুগের শেষ হোল। পুরানো নিয়ম চলে গেল। আর কোন দেশে ইসলামীকরণের আন্দোলন এতখানি যুগান্তকারী ছিল না। কারণ, মুসলমানেরা তাদের বিশ্ববিজয়ের যাত্রাপথে যে নানা সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, তার মধ্যে আর :কউ ভারতীয়দের মতো মুসলমান আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিল না।[৩৫]

তুর্কী আক্রমণে বাঙালির কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ এল না। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে 'তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই-তখনকার দিনের বাঙ্গালির সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালি নিজেকে এক অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত বা প্রদেশবাসী বলিয়া মনে করিত। ..... তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই বৈতসী বৃত্তির মধ্যে তাহার জীবনী শক্তি অটুট রহিল।[৩৬] পাল-আমলে নবসৃষ্ট বাঙালি জাতির ভাষা ও স্থাপত্যশিল্প-ভাবনার যে বিকাশ ঘটছিল, মুসলমান-বিজয়ের পর তার গতি রুদ্ধ হোল। তার ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু, বিধর্মী সুলতানদের ভয়ে এগুলির চর্চা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিরত থাকে, যদিও মল্লভূম (বাঁকুড়া) ও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চল মুসলিম শাসনের আওতার বাইরে থাকায় এই দিকে ওড়িশা-প্রভাবিত মন্দিরাদির নির্মাণ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেও চলছিল।

তুর্কী বিজেতাদের রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল প্রথম দিকে গৌড়ে এবং পরে পাণ্ডুয়ায়। লক্ষ্মণ-সেনের রাজধানী 'লখনৌতি' বা 'লক্ষ্মণাবতী' নগরী ও সেখানকার দেবমন্দিরাদি ধ্বংস ক'রে তার সুন্দর সুন্দর অংশ, যেমন, কালো বেসল্ট পাথরের কারুকার্য করা দ্বারপথ বা কালো বেসল্টের কারুকার্য করা অসংখ্য স্তম্ভ, মন্দিরগাত্রের মূর্তিসহ বিভিন্ন অংশ দিয়ে বড়ো বড়ো মসজিদগুলো গড়ে ওঠে, যাদের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বহু দেবমূর্তি মসজিদের প্রবেশপথের সোপানশ্রেণীতে স্থাপন করা হয়, আবার কখনও বা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপিত বৃহদাকার মূর্তিগুলির অঙ্গহানি ক'রে তাদের পিছনের দিকে আরবী বা ফারসী লিপি খোদাই ক'রে মসজিদের সামনে স্থাপন করা হোত। এইভাবে বাংলায় সুলতানী শাসনের প্রথম দুশ' বছরের মধ্যে শেষ একশ' বছর কেটে যায় বড় বড় মসজিদ নির্মাণের মধ্যে। এই সময়ের ধর্মীয় স্থাপত্য বলতে প্রাদেশিক মসজিদ-স্থাপত্য ও কবর-সৌধ।

বাংলায় ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্পের তিনটি পর্বের অনুসন্ধান করেছেন পার্সি ব্রাউন। প্রথম দিকে, গৌড়ে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্য হোল রাজধানী থেকে অনেক দূরে হুগলির ত্রিবেণীতে এক বৃহৎ মসজিদ এবং জাফর খান গাজীর কবর এবং এর কিছু দূরে পাণ্ডুয়ায় বাইশগম্বুজযুক্ত বিশাল মসজিদ। (এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। এর পর চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে পাণ্ডুয়ায় (মালদহ) যখন রাজধানী স্থানান্তরিত হোল, তখন নির্মিত হোল বিশালাকার আদিনা মসজিদ (১৩৬৯ খ্রী.)। সুলতান সিকন্দর শাহের দ্বারা এই মসজিদ স্থাপিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ের ইসলামীয় স্থাপত্য ছিল আরব-ইরাণ (পারস্য) থেকে আমদানী করা স্থাপত্যশিল্পের থেকে পৃথক। পঞ্চদশ শতকের গোড়া থেকেই এই ধরণের ইসলামীয় স্থাপত্যের সূচনা হয়। বাংলাদেশের জলবায়ু, মাটি, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এ সবের কথা চিন্তা ক'রে কিছুটা এদেশীয় প্রচলিত 'চালা'র অনুকরণে যাতে ধর্মীয় সৌধগুলির স্থায়িত্ব বেশীদিন হয় সেভাবে তৈরি হয়েছিল। মোটামুটিভাবে ১৪০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় দেড়শ বছরের মধ্যে পূর্ববর্তী বৃহদায়তন ধর্মীয় সৌধ অপেক্ষা ছোট ছোট মসজিদ, কবর বা অন্যান্য সৌধগুলি নির্মিত হয়।[৩৭] এই সময় পাণ্ডুয়া বা গৌড়ের সুলতান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার ক'রে প্রায় স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে থাকেন। ধর্মীয় সৌধগুলির মধ্যে প্রথমেই পাণ্ডুয়ার একলাখী কবরসৌধের উল্লেখ করতে হয়। এর সম্ভাব্য নির্মাণকাল ১৪১২-১৪১৫ খ্রীস্টাব্দ। কারও কারও মতে ১৪২৫ খ্রী.। এই সৌধের কার্ণিশের ঈষৎ বক্রভাব দেশীয় চালার 'ছাঁচা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বাধীন সুলতানদের আমলে গৌড়ে এ ধরণের অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়। এগুলি প্রায় সবই পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। গৌড়ের কয়েকটি একগম্বুজযুক্ত মসজিদ, যেমন লত্তন মসজিদ (খ্রী. ১৪৭৫), কদম রসুল (এতে পয়গম্বরের পদচিহ্ন রক্ষিত), চিকা মসজিদ প্রভৃতি বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন যেগুলির মধ্যে দেশীয় প্রয়োগ-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এগুলির আদর্শ ছিল যদু বা জালালুদ্দীনের কবর 'একলাখী সৌধ'। এটিকে কেউ কেউ আঞ্চলিক ইসলামীয় স্থাপত্য রীতির আদি নিদর্শন বলে মনে করেন। পরবর্তী মুসলিম স্থাপত্যের (মসজিদ ইত্যাদির) আদিরূপ বলে এটিকে মনে করা হয়।[৩৮]

বাংলায় ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর তৃতীয় ও সর্বশেষ ধারাটি হোল, সুলতানদের রাজধানী পাণ্ডুয়া (মালদহ) থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পর যেসব মসজিদ ও মাজার তৈরী হয়েছিল,

তার মধ্যে। ওপরের আলোচনায় এগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়সীমা মোটামুটি ধরা যায় আনুমানিক ১৪৪২ খ্রী. থেকে ১৫৭৬ খ্রী. পর্যন্ত।[৩৯] এই সময়ের মধ্যে মসজিদগুলি 'একলাখী' সৌধের আদর্শে নির্মিত হলেও (অর্থাৎ বেশিরভাগই একগম্বুজযুক্ত ও ঈষৎ বক্রাকার কার্ণিশযুক্ত), বহু গম্বুজযুক্ত বিশালাকার মসজিদও নির্মিত হয়, যেমন, গৌড়ের 'বড় সোনা মসজিদ' (সুলতান নসরত শাহের নির্মিত, ১৫২৬ খ্রী.) এবং ফিরুজপুরে (গৌড়) 'ছোট সোনা মসজিদ' (সুলতান হুসেন শাহের সময়ে ওয়ালি মুহম্মদ কর্তৃক নির্মিত, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.)। এর গম্বুজগুলির মধ্যে একটি সুন্দর 'চারচালা'ও স্থাপিত।[৪০] এর থেকে প্রমাণিত হয়, সুলতানী আমলের শেষের দিকে চিরপরিচিত বাংলার 'চালা'-শৈলী মুসলিম স্থাপত্যে স্থান ক'রে নিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন এর কৃতিত্ব মুসলিম শাসকদের।[৪১] গৌড়ে কদম রসুলের পার্শ্ববর্তী ফৎখানের সমাধিগৃহ পূর্ণ 'দোচালা' রীতির। এটি পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় রাজা কংসের সময় নির্মিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। রাজা কংস (মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভাষায় 'কানস্') বা দনুজমর্দনদেব সুলতানী আমলে একমাত্র হিন্দুরাজা (১৪১০ খ্রী.-১৪১২ খ্রী.) ছিলেন। মন্দিরটিতে হিন্দু দেববিগ্রহ স্থাপিত ছিল। তাব প্রমাণও আছে।[৪২] এই 'দোচালা' সৌধটি বহু আগে তৈরি হলেও এর মধ্যে ঔরঙ্গজেবের কর্মচারী দিলির খানের পুত্র ফৎখানের সমাধিটি স্থাপিত হয় আনুমানিক খ্রী. ১৬৫৭ থেকে ১৬৬০ খ্রী. এর মধ্যে।[৪৩] এই 'দোচালা'টির ওপরের চাল খুবই ঢালু এবং সাধারণ বাংলা কুটিরের মতো। চালের 'ছাঁচা' দেওয়াল ছড়িয়ে কিছুটা নীচে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। এই ধরণের 'দোচালা'কে 'একবাংলা'ও বলা হয়। এটি যদি সত্যই রাজা কংস-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমন্দির হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত এটিই হোল সব থেকে প্রাচীন 'দোচালা' সৌধ যা মুসলমান-পরবর্তী যুগের একটি আদর্শ 'চালা'-শৈলীর নিদর্শন।

উপরি উল্লিখিত ফিরুজপুরের 'ছোট সোনা মসজিদে'র ওপর 'চারচালা' ও ফৎখানের 'দোচালা' কবর থেকে এটা স্পষ্ট যে, সুলতানী আমলের শেষভাগে এই স্থাপত্যশৈলী শুধুমাত্র যে প্রচলিত ছিল তাই নয়, এটি একটি পরিণত রূপও পেয়েছিল। কাজেই মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে প্রথম একশ বছর তুর্কী শাসকদের এদেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হলেও এবং এই সময়ের মধ্যে সু-উচ্চ ও সুদৃশ্য হিন্দু মন্দিরগুলির প্রায় সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও ইসলামীয় ধর্মীয় সৌধের পাশাপাশি বাংলার একান্ত নিজস্ব পল্লীবাংলার চালাকুটির দেবমন্দিরে রূপান্তরিত হতে থাকে। বাঙালি হিন্দুরা পরাক্রান্ত মুসলমান শাসকদের কাছে 'বৈতসী বৃত্তি' অবলম্বন করে থাকলেও তাদের প্রাণশক্তি অটুট ছিল। তাই অত্যাচারের ভয়ে তুর্কী বিজয়ের গোড়ার দিকে খড়ের চালাঘরে হিন্দুরা দেব-দেবীর আরাধনা করছিল. 'চালা'র অনুকরণে। পরে তারা অনুচ্চ 'চালা' মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল। বাংলার দেশজ স্থাপত্য 'চালা'র উদ্ভব সম্পর্কে আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করলেও পরবর্তী আলোচনায় তা আরও বিশদীকৃত হবে। তবে দেশজ 'চালা'র স্থাপত্যে রূপায়ণসম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন যে, গ্রামের 'চালা' কুঁড়ে ঘরে বাংলার যে সব লোকপ্রিয় বা লৌকিক দেবতাদের পুজোপাট হোত, তারা শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করার পর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা যখন তাদের পূজোয় নিযুক্ত হলেন বা তাদের পুজোর জন্যে যখন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের দরকার হোল, তখন সেইসব দেবদেবীর মূর্তি পাকা ইঁটের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোল। আর মন্দিরের আকৃতি তৈরি হোল আসল খড়ের চালার অনুকরণে। এই ভাবেই দেশীয় রূপটি পাকা মন্দিরে এসে গেল।[৪৪]

৪

মন্দির-স্থাপত্যের বিকাশ ও পরিণতি : মধ্যযুগ

মুসলমান শাসনাধিকারে বাংলার দেশীয় স্থাপত্যের উদ্ভবের পশ্চাতে অন্য এক ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস নতুন বাঙালি-সংস্কৃতির উদ্ভবের ইতিহাস। পঞ্চদশ শতকের সুরু থেকেই বাঙালির সেই নবসংস্কৃতির উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। এই সময় থেকে বাংলায় রাজনীতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র — সাহিত্য ও শিল্পে এক আমূল পরিবর্তনের আভাস মেলে। একে পরবর্তীকালের শ্রীচৈতন্য-আন্দোলনের ফলে বাংলার 'নবজাগরণ' না বললেও এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু, গৌড়ের রাজনীতি সে সময়ের বাংলাকে নিয়ন্ত্রিত করছিল, সে-কারণে চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে এক রাজনীতিক পরিবর্তন এল, তার ফলে অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দে সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহ্ অবিভক্ত বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে একটি একক রাজ্যে পরিণত করেন এবং স্বাধীন সুলতানী শাসনের পত্তন করেন। এই প্রথম একটি ঐক্যবদ্ধ বাংলা স্বাধীন সুলতানের শাসনাধীন হোল। এই ঐক্যবদ্ধ বাংলা সেই থেকে ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। বাংলার এই রাজনীতিক অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা করা অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পালযুগের আদিপর্বে বাংলার তদানীন্তন পরাক্রান্ত শাসকদের ঈপ্সিত ছিল। পাল-বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাঙালি-চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ও বাঙালিরূপে তার আত্মসত্তার বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা চলছিল। সমগ্র বা বৃহত্তর বাংলাকে এক রাজনীতিক ছত্রচ্ছায়ায় বাঁধবার জন্য পাল ও সেনবংশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজগণ সে চেষ্টা করলেও সফলকাম হতে পারেন নি। অথবা এ-বিষয়ে তাদের আংশিক সাফল্য লাভ হলেও তা ছিল নেহাতই অস্থায়ী। যখনই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে দুর্বলতার আভাস পাওয়া যেত, তখনই সংকীর্ণ স্থানীয় শক্তিগুলি নিজেদের স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইত এবং এর ফলে অখণ্ডতা বিঘ্নিত হোত। বাংলা দেশকে স্থায়ীরূপে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে অখণ্ড রাজনীতিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে এবং কেন্দ্রীয় (নিজেদের) কর্তৃত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বাধীন সুলতানেরা এর একটি সুনির্দিষ্ট রাজনীতিক ও ভৌগোলিক আয়তন ও আকার দান করলেন। তাঁরা বাংলার অধিবাসীকে উপহার দিলেন একটি আঞ্চলিক সত্তা এবং ঐক্যবদ্ধতার প্রয়াস।[৪৫]

দিল্লীর সুলতানের কর্তৃত্বকে অস্বীকার ক'রে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনের পত্তন হোল। স্বাধীন সুলতানরা তাঁদের রাজনীতিক কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং তাদের চারপাশে যেসব প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পশ্চিমে জৌনপুরে, দক্ষিণপশ্চিমে ওড়িশায় ও উত্তরপূর্বে কামরূপে সক্রিয় ছিল, তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের রাজ্যের স্থানীয় রাজা, জমিদার বা ঐরূপ ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের নিজের নিজের এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করলেন। বাংলার অধিবাসীদের ধর্মীয় স্থাপত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এবং সৃজনশীল সাহিত্যসৃষ্টির জন্য উৎসাহ দিলেন। এটা এই সময় বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, দিল্লীর হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের আশঙ্কা তখনও ছিল, যদিও তিমুরের আক্রমণে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় দিল্লীর শাসন কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সময় বাংলায় যে সব ইসলামী স্থাপত্য সৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলিতে

আঞ্চলিক হিন্দুস্থাপত্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এসে যায়, বিশেষ ক'রে, 'চালা'র অনুকরণটা মসজিদে, মাজারে লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আবার, হিন্দু-স্থাপত্যেও ইসলামী স্থাপত্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদে গম্বুজাকৃতি 'ভল্ট', 'খি... ...র ব্যবহার প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান স্থপতিরা ইসলামী স্থাপত্যকলার এই বৈশিষ্ট্যগুলি এদেশে যেসব মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তাতে ফুটিয়ে তোলেন এবং হিন্দু মন্দির-স্থাপত্যের 'চালা'র বক্রাকৃতি কার্ণিশ বা মূর্তিবিহীন 'টেরাকোটা' নকশা, যেমন, ফুল, লতাপাতা বা জ্যামিতিক নকশা মসজিদ বা মাজারের দেওয়ালে অলংকরণরূপে ব্যবহার করেন। পক্ষান্তরে, হিন্দু স্থপতিরা মন্দিরস্থাপত্যে 'খিলান' ও 'ভল্টে'র ব্যবহার ক'রে মন্দির নির্মাণে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন।

এটা বর্তমানে কেউ কেউ স্বীকার করেন, খ্রী. ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানবিজয়ের পর ধর্মীয় বা অন্য কোন সৌধনির্মাণে মুসলমানরা আরব-পারস্য (বর্তমানের ইরাণ) দেশ থেকে স্থাপত্যগত বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে 'খিলান' ও 'ভল্টে'র (ওপরের ছাদ বা ভিতরের ছাদ) নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছিল। এতে স্থাপত্যকর্মের স্থায়িত্ব হিন্দুদের উদ্ভাবিত 'কর্বেলিং' বা 'সরদল' বা 'লহরা' পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি ছিল। মুসলমানরাই প্রথম এদেশের সৌধে 'ভল্ট' ও 'খিলান'-পদ্ধতির সূত্রপাত করেন। এ সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন, ভারতীয় সূত্রধরেরা শত শত বৎসর ধরে সুন্দর সুন্দর আকৃতির বিরাট বিরাট পাথরের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাদের এই শিল্পসৃষ্টির জন্যে বিজেতারা (মুসলমান) তাদের কৃতিত্ব নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এইসব দেশীয় কারিগরেরা এই দীর্ঘ সময়ে আর কোন উন্নত পদ্ধতি অথবা বিজ্ঞানসম্মত সৌধ-নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই তাদের নির্মাণকৌশল একই রকম থেকে গেছে ক্রমাগত একই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। অপরপক্ষে, বিজেতাদের সঙ্গে কেবলমাত্র যে নতুন রক্তের উদ্দীপনা বা প্রেরণা এসেছিল তাই নয়, পক্ষান্তরে তারা নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশল সঙ্গে আনে যা তারা অন্যান্য দেশ থেকে লাভ করেছিল।[৪৬] মুসলমান স্থপতিদের প্রয়োগকৌশল বলতে খিলান বা ভল্টের ব্যবহারের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হলেও ভারতীয় স্থপতিরা এইরূপ প্রয়োগবিজ্ঞানে যে অজ্ঞ ছিলেন, তা নয়। সুপ্রাচীন কালে সিন্ধুসভ্যতায় (আঃ ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) এই খিলান ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় স্থপতি- কারিগরেরা এই খিলানপদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে জানতেন। তার নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তযুগে নির্মিত ভিতরগাঁও এর (পূর্বে উল্লিখিত) ইঁটের দেউলমন্দিরে (আঃ খ্রী. পঞ্চম শতক), মীরপুর খাসএর স্তূপে এবং বুধগয়ার মন্দিরে। ভিতরগাঁও এর মন্দিরের সামনের মণ্ডপে ইঁটের তৈরি গোঁজাকৃতি গোলাকার খিলান পাওয়া যায়। আবার গর্ভগৃহের একস্থানে ভল্টের ব্যবহার আছে।[৪৭] বুধগয়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারেও ইঁটের তৈরি খিলানের সুস্পষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, স্থাপত্যবিদ মনোমোহন গাঙ্গুলী একে 'খিলান' বলে মনে করেন না। (দ্রষ্টব্য, 'স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা', ১৯৫৯, পৃ. ৩৭)।

ভারতীয় কারিগরেরা এই 'খিলান' বা 'ভল্টে'র ব্যবহার বা প্রয়োগ প্রাচীনকালে খুব ভালই জানতেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল, খিলান বেশীদিন স্থায়ী হয় না। 'The arch never sleeps' — বাস্তুবিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশলের এই নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সৌধনির্মাণে 'খিলান' বা ভল্টের প্রয়োগ থেকে তাঁরা সরে আসেন এবং সু-উচ্চ মন্দিরনির্মাণে 'করবেলিং'-পদ্ধতির প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। একটার ওপরে একটা চাপিয়ে পাথরখণ্ড বা ইঁটের গাঁথনিতে তাঁরা অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং এই পদ্ধতিই যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। প্রাচীন দেবালয়ের অনেকগুলিই

আজও দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি, সতের-আঠার শতকের কিছু মন্দিরেও এই 'করবেলিং' বা 'লহরা'-পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে।

সুলতানী আমলে মুসলমান কারিগরেরা বিভিন্ন সৌধনির্মাণে চুন-সুরকি মশলার ব্যবহার চলিত করেন। তার পূর্বে গাঁথনির এইরূপ মশলার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না— এটিও মধ্যযুগের সৌধনির্মাণে মুসলমানদের অবদান,একথা কেউ কেউ বলে থাকেন। কিন্তু চুনসুরকির এবং চুনের মিহি প্রলেপের বহুল ব্যবহার আমাদের দেশে প্রাচীন কালেও ছিল। কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ) 'রক্তমৃত্তিকা বিহারে'র ধ্বংসস্তূপ ও কর্ণসুবর্ণের কয়েকটি স্থানে উৎখনন ক'রে 'র‍্যামিং' করা চুনসুরকির মেঝে বা দেওয়ালের গাঁথনিতেও মশলার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। আঃ খ্রীস্টীয় সপ্তম শতক বা তারও পূর্বে এখানকার সৌধ নির্মিত হয়েছিল।[৪৮] চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকেও এ ধরণের জিনিস লক্ষ্য করা গেছে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের আমলে ইসলামীয় ও হিন্দু—উভয়প্রকার ধর্মীয় সৌধনির্মাণে খিলান, ভল্ট এবং গাঁথনির মশলার নতুন ক'রে ব্যবহার হ'তে থাকে। হিন্দু আমলের পুরানো প্রয়োগকৌশল পরিত্যক্ত হয়। মুসলিম স্থাপত্যের প্রয়োগকৌশল ও উপাদান বিজ্ঞানসম্মত ছিল। সহজসাধ্য ও দীর্ঘফলদায়ী হওয়ায় তা হিন্দুকারিগরদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে নির্মিত অসংখ্য মন্দিরে কারিগরেরা এগুলির প্রয়োগ করতে থাকেন। ঐতিহ্যবাহী উচ্চ 'শিখর'-মন্দির বা শাস্ত্রানুমোদিত অন্যান্য মন্দিরনির্মাণ এইসময় একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। এখন তা সম্ভবও ছিল না অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ ও একটি রাজনীতিক বৃত্তের মধ্যে অখণ্ড বাংলাদেশে বাঙালির নিজস্ব ঘরানায় মন্দিরশৈলীর এক নতুন যুগের সূচনা হোল। প্রথমে 'চালা' নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকল। কারণ, 'চালা'ই ছিল সাধারণ বাঙালির একান্ত আপন প্রিয় আবাসগৃহ। চালার ঢালু চাল, বাঁকানো 'ছাঁচা' ও কাঠামোর ভিতরের ফাঁকা জায়গা—এসবই 'চালা' মন্দিরে অনুসৃত হোল। এসময় ইসলামীয় স্থাপত্যেও এগুলি সাদরে গৃহীত হয়েছিল। কারণ, সুলতানেরা এদেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম এসিয়াব ইসলামীয় সংস্কৃতির এক সমন্বয় সাধনে তখন আগ্রহশীল, কতকটা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী ক'রে নেওয়ার জন্য। তারা তখন সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী করার জন্যে এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিলে-মিশে চলার নীতি অনুসরণ করছিল। এর ফলেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এল ভাববিপ্লব। বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের নবজন্ম দেখা দিল। কিন্তু এর সঙ্গে পূর্বতন প্রাক্-মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর তেমন কোন মিল ছিল না। প্রাচীন বাংলার সেই 'থাকে থাকে' উঠে যাওয়া চাল, যা 'পিঢ়'-দেউলের সমগোত্রীয় মন্দির এখন আর তৈরি হতে দেখা গেল না। পরিবর্তে,চতুষ্কোণ বা আয়তক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের দেওয়ালের ওপর গোলগম্বুজ বা আয়তক্ষেত্রাকার খিলানের ('দোচালা' ও 'জোড়বাংলা'র ক্ষেত্রে) ওপর ভাঙাচোরা ইঁট বা 'খোয়া' এবং চুনসুরকির মশলা দিয়ে ঢালু চাল তৈরি করা হোত; বৃষ্টির জল থেকে দেওয়ালকে রক্ষা করার জন্যে চালের 'ছাঁচা' (কার্ণিশ) দেওয়ালের মাথা থেকে কিছুটা নীচে বিস্তার করা হোত, যেমনটি আমরা গৌড়ের পূর্বোক্ত ফৎ খানের সমাধিতে লক্ষ্য করেছি। মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যেও 'চালা'র এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসৃত হয়ে একটি আঞ্চলিক ইসলামীয় স্থাপত্যের সৃষ্টি করে। পঞ্চদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নির্মীয়মান ধর্মীয় ইসলামীয় স্থাপত্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাঙালির আঞ্চলিক সত্তার উন্মেষ, এক অখণ্ড বাংলাদেশের সৃষ্টি

এবং পরিশেষে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইসলামীয় ধর্মীয় স্থাপত্যের আবির্ভাব এবং আঞ্চলিক হিন্দুস্থাপত্যে মুসলিম স্থাপত্যের গঠনকৌশলের প্রয়োগ —এ সবই সাংস্কৃতিক বিকাশের নতুন দিগন্ত সূচিত করে। হিন্দু বাঙালি ও মুসলমানের মধ্যে 'সংস্কৃতি-সহযোগিতা' এ সময়ে শুরু হয়।

দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার বিকাশের যে গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার পুনরুজ্জীবন ও বিবর্ধন হ'তে থাকে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয় (আঃ খ্রী.পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ), চণ্ডীদাস ও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদাবলী এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্য (রচনাকাল আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগ) জনমানসে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গৌড়ের এক সুলতান কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতও রচিত হয় এর পরে। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুলতান রুকন-উদ্দিন বারবক শাহের(১৪৫৫-১৪৭৪খ্রীঃ) আনুকূল্যে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যরচনা ক'রে 'গুণরাজ খান' উপাধি পান। বাঙালির মনে গভীর ধর্মভাব জাগ্রত হয়। 'লোকভাষা' বাংলা এইভাবে সাহিত্যের উপযোগী হয়ে ওঠে। সংস্কৃত পুরাণের আদলে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। এই সময়ে মুসলমান সুফী,পীর,দরবেশ,আউলিয়াদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালিদের তেমন কোন সংঘাত দেখা দেয়নি। বরং, মুসলমান পীর-ফকিরেরা অহিংস ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁরা অর্জন করেছিলেন। তুর্কীবিজয়ের পর প্রথম দিকে যে সব মুসলমান সন্ত বাংলায় ইসলামের ধ্বজা জোর ক'রে তুলে ধরতে সক্রিয় ছিলেন জালালুদ্দিন তাব্রেজী, আলাওল হক, নুর কুতব উল আলম এবং যাঁদের পিছনে পরাক্রান্ত রাজশক্তির বিরাট সমর্থন ছিল এবং তার ফলে দলে দলে লোক মুসলমান হয়ে যায়, এখন সেই ধরণের প্রচারক ছিলেন না। পক্ষান্তরে, পীর-সুফী-দরবেশ-আউলিয়াদের ধর্মের সঙ্গে বাংলার লোকধর্মের একটা সমন্বয় ঘটেছিল।

বাংলায় এই রাজনীতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন চতুর্দশ শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হতে থাকে। এর মধ্যে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব এক যুগান্তকারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাববন্যা বাংলার সংস্কৃতি-জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। সাহিত্য ও শিল্প বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হোল। স্বাধীন সুলতানদের আমলেও গোড়ার দিকে মন্দিরস্থাপত্যে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার অবকাশ ছিল না। অতিসাধারণ 'চালা'তেই বাঙালির স্থাপত্যচিন্তা সীমাবদ্ধ রাখতে হোত। তাই 'দোচালা', 'চারচালা'র মধ্যেই এসময়ের হিন্দু স্থাপত্যচর্চা সীমিত থেকে যায়। হিন্দু 'চালা'-মন্দির মসজিদের থেকে কোনক্রমেই উঁচু করা যেত না। এমনকি, এই 'চালা'-মন্দিরও ছিল সংখ্যায় নগণ্য। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা গণেশ (রাজা কংস) বা দনুজমর্দনদেবের সময়ে নির্মিত বলে অনুমিত 'দোচালা'টি সাধারণ 'চালা'স্থাপত্যের একটি একক দৃষ্টান্ত। ঘাটাল-কোন্নগরের (মেদিনীপুর জেলা) সিংহবাহিনীর 'চারচালা'মন্দির ও সংলগ্ন 'চারচালা' 'জগমোহন' ১৪১২ শকাব্দ বা ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত বলে সংস্কারকালীন লিপিতে উল্লিখিত হলেও স্থাপত্যদৃষ্টে এটি আরও পরবর্তীকালের মনে করা যায়। যদি ধরাও যায়, এটি ঐসময়েই তৈরী হয়েছিল, তাহলেও এটি ছিল নেহাতই সাদামাটা। দু'একটি ছোট-খাটো 'রিলিফে' উৎকীর্ণ মূর্তি ও প্রাচীন কয়েকটি ফুলকারি নকশা ছাড়া ও গোটা দুই তিন টেরাকোটা মূর্তি এবং ফুল ছাড়া তেমন কোন অলংকরণ ছিল না। উচ্চতাও সাধারণ। পক্ষান্তরে, এই সময়ের বা

কিছু পরবর্তী কালের মসজিদগুলি উচ্চতা ও স্থাপত্যসৌকর্যে এই সাধারণ মানের মুষ্টিমেয় 'চালা'র থেকে উৎকৃষ্ট ছিল। এটা গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় এই সময়ে নির্মিত পূর্ব আলোচিত মসজিদগুলি দেখলেই বোঝা যায়। মুসলমানরা 'চালা'- স্থাপত্যের কিছু কিছু প্রয়োগকৌশল তাদের মসজিদ ও কবরসৌধে গ্রহণ ক'রে কার্যসাধনের উপযোগী মনে ক'রে। পক্ষান্তরে, হিন্দু কারিগরেরাও তাদের মন্দিরে 'ডোম' বা 'ভল্ট ' এবং 'আর্চ' এর প্রয়োগ করে। এইভাবে 'ইন্দো-মুসলিম' স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব হয়। এই 'চালা'- মন্দিরগুলিতে গোড়ার দিকে টেরাকোটা-ফলকে দেবদেবীর মূর্তিবিন্যাস বর্জন করা হয়েছিল মসজিদের অনুকরণে। শুধুমাত্র ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশা ও পোড়ামাটির ফুল মন্দির-দেওয়ালের অলংকরণরূপে সজ্জিত হয়। অন্তত ষোড়শ শতকের শেষদিকে কয়েকটি মন্দিরে, যেমন, বৈঁচিগ্রাম (হুগলী), বৈদ্যপুর (বর্ধমান) এবং গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ) মন্দিরে খুব সাধারণ অলংকরণ এবং অল্প-স্বল্প মূর্তিবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তি-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, পৌরাণিক দেবদেবীলীলার কথকতা, রামায়ণগান, মহাভারতকথা মঙ্গলকাব্যের পালাগানের জনপ্রিয়তা বাঙালি-মানসে আনে এক ধর্মোদ্দীপনা। এ সময়ে তুর্কী শাসনের শেষ পর্যায়, মুঘল রাজশক্তির অভ্যুদয় বাঙালির স্বাধীন চিন্তায় স্থাপত্য-চর্চার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার সৃষ্টি করল। এখন আর 'চালা'-মন্দিরেই তার স্থাপত্যচর্চা সীমাবদ্ধ রইল না। এল উচ্চশ্রেণীর 'রত্ন'মন্দিরের পরিকল্পনা, দোচালা-চারচালার পর উচ্চ 'আটচালা'র অভ্যুদয় ঘটল।

মুসলমান-বিজয়ের পর বাঙালির শিল্পসৃষ্টির সাময়িক বিরতি ঘটলেও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তা স্ফুর্তি লাভ করতে পারে নি। প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলার নিজস্ব শৈলীর দুই 'থাক' বিশিষ্ট 'পিঢ় '-দেউলের রূপান্তর ঘটল 'আটচালা'- রীতির মন্দিরে। আঠার- উনিশ শতকে 'আটচালা' তার পরিপূর্ণ বা পরিণত রূপ লাভ করার আগে (অর্থাৎ বেশ ঢালু চাল ও কার্ণিশের বক্রভাব) সতেরো শতকের দিকে যেসব দেউল মন্দিরের 'পিঢ়'-রীতির 'জগমোহন' লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিতে চালার ভাবটা অনেকটা ফুটে উঠেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত শিহর গ্রামের (জয়রামবাটীর কাছাকাছি) শান্তিনাথ শিবের দেউলের সংলগ্ন 'জগমোহনে'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এর চালগুলি খুবই ঢালু, কিন্তু কার্ণিশ সোজা। ওপরের চারটি চাল বা 'পিঢ়া' ও নীচের চারটি চালাকৃতি 'পিঢ়া'য় 'আটচালা'র ভাবটি ফুটে উঠেছে। আবার ঐ জেলারই ওন্দা থানার অন্তর্গত বিক্রমপুর গ্রামে রাধাকৃষ্ণের দেউলমন্দিরের সামনেই 'জগমোহনের' ওপর যে 'পিঢ়া'র সন্নিবেশ করা হয়েছে, সেগুলিও পরবর্তীকালের 'চালা'র পরিচয় বহন করে। এই দুটি মন্দিরই সপ্তদশ শতকে তৈরি হয়। প্রথমটির লিপি না থাকলেও স্থাপত্যদৃষ্টে সপ্তদশ শতকে নির্মিত এবং দ্বিতীয়টি মল্লভূমের রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ (বীর হাম্বির বা বীরসিংহের পুত্র) ১৬৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৯] মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় কণ্ঠরেশ্বর শিবের ও নিকটবর্তী কানুরাম দাসের 'পিঢ়' দেউলদুটির 'পিঢ়া'য় চালার ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে।[৫০] এগুলিও ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। এই জেলার কেশপুর থানার কুঁয়াই গ্রামের 'নেড়া দেউল' মন্দিরের 'জগমোহনে'র পিঢ়গুলিও চালার আকার ধারণ করেছে, লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়।[৫১] আরও অনেক 'পিঢ়'-দেউলের চাল ক্রমশ চালার রূপ নিতে সুরু করেছিল। পুরানো 'আটচালা' যেমন, তালডাংরা থানার (বাঁকুড়া) সাব্রাকোণের রাধাকৃষ্ণ মন্দির (১৬৭৭), বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী তেজপালের রাধাকৃষ্ণ মন্দির (১৬৭২),[৫] মেদিনীপুরের

গড়বেতার রাধাবল্লভের মন্দির (১৬৮৬)-গুলিতে কোন তল ছাড়াই 'আটচালা'র সৃষ্টিতে পুরানো পিঢ়-দেউলগুলির বিবর্তনই লক্ষ্য করা যায়। এর আরও অনেক পরে মেদিনীপুরের শিলদায় (বিনপুর থানা) কিশোর-কিশোরীর আটচালাটিও (১৮২০) ঐ একই রীতির। এগুলি পল্লীবাংলার খড়ের ঘরের কাটাচালের অনুকরণেও তৈরি হতে পারে। তবে প্রাচীন পিঢ়-দেউল যে ক্রমশ 'চালা'য় রূপান্তরিত হচ্ছিল, বিশেষ করে, সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে, তা ওপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা যায়। দেউলের 'জগমোহন'গুলির চাল পিঢ়ার আকারে 'থাকে থাকে' ক্রমহ্রস্ব হয়ে ওপরে শীর্ষস্থানে মিলিত হলেও চালগুলিতে ঢালু চালার ভাবটি যে পরিস্ফুট হচ্ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর ওড়িশী-শৈলীর দেউল-মন্দিরের সম্মুখ-সংলগ্ন পিঢ়া-দেউলের স্থান অধিকার করে 'চারচালা' বা কোন কোন ক্ষেত্রে 'দোচালা'। মেদিনীপুর জেলার তমলুকের বর্গভীমা ও পাইকভেড়ির (ভগবানপুর থানা) শ্যামসুন্দরজীউর দেউলের 'চারচালা' জগমোহন লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে 'আটচালা' জগমোহনও লক্ষ্য করা গেছে। সরসীকুমার সরস্বতীও এই প্রাচীন পিঢ় দেউল থেকে 'আটচালা'র উদ্ভব হয় বলে মনে করেন। পূর্বে আলোচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত চম্পিতলার লোকনাথকে একটি দেউলে অধিষ্ঠিত দেখানো হয়েছে যেটি 'আটচালা' বলে তিনি মনে করেন। প্রাচীন বাংলার পিঢ়-মন্দিরগুলির একটি পিঢ়া থেকে অন্যটির ব্যবধান সুস্পষ্ট থাকায় এই ব্যবধান একটি তলের ইঙ্গিত দেয়। তাই এইরূপ দুটি পিঢ়াযুক্ত দেউল পরবর্তীকালে 'আটচালা'য় এবং তিনটি পিঢ়ায় 'বারোচালা' রীতির উদ্ভব হয় বলে মনে করা যেতে পারে। ছোটখাটো চতুষ্কোণ 'আটচালা'গুলি বাদ দিলে বড়ো বা আয়তক্ষেত্রাকার 'আটচালা'-গুলির গর্ভগৃহসংলগ্ন ঢাকা বারান্দা কতকটা সামনের মণ্ডপের কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে এইরূপ বহু 'আটচালা' নির্মিত হতে দেখা গেছে। 'আটচালা'র সামনের ঢাকা বারান্দা ছাড়া অপর দুই বা তিন দিকের কোন বারান্দা সাধারণত লক্ষ্য করা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'আটচালা' বা 'বারোচালা'র (যদিও বারো চালা সংখ্যায় খুবই কম) ওপরের 'চারচালা'গুলি শুধুমাত্র উচ্চতা ও কিছুটা অলংকরণের জন্য তৈরি করা হয়। গ্রামের খড়ের আটচালা ঘরও 'আটচালা'র রূপায়ণে বাংলার মন্দিরস্থপতিদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। একদিকে ঐতিহ্যানুসারী প্রাচীন 'পিঢ়'-শৈলীর মন্দিরনির্মাণের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে খড়ের 'আটচালা' ঘর বাংলার স্থপতিদের 'আটচালা' নামে একটি পৃথক চালারীতির মন্দির সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তার মধ্যে এই রীতিটি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত। এমনকি, বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও এই রীতির মন্দির অনেক তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক কালেও এই রীতির ছোটখাটো মন্দির নির্মিত হতে দেখা গেছে। সমগ্র বাংলায় 'আটচালা' অসংখ্য নির্মিত হয়েছিল, যতটা 'চারচালা' তৈরি হতে পারে নি। কারণ, গ্রামবাংলার বেশির ভাগ লোকের ঘরই খড়ের 'আটচালা' ছিল। একতলায় মুখ্য আবাসগৃহ ছাড়া দ্বিতলেও একটি কক্ষ এই আটচালা ঘরগুলিতে দেখা যায়। সামনে বা দু'পাশে অথবা চারপাশে যে বারান্দা থাকে, তা কোন কোন সময় ঢাকাও থাকে। তবে সামনের বারান্দাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। 'আটচালা' মন্দিরগুলির সামনের ঢাকা বারান্দা বহুক্ষেত্রে মণ্ডপের কাজ করে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দুই বা তিনদিকে এই বারান্দা লক্ষ্য করা যায় না। আবার, দ্বিতলে একটি পৃথককক্ষ বা ওপরে ঐ কক্ষটিতে যাওয়ার সিঁড়ি কোন কোন বৃহৎ 'আটচালা'য় ক্বচিৎ দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রামবাগের 'আটচালা'য় এই ধরণের কক্ষ ও সিঁড়ি আছে। 'চালা'-শৈলীর মধ্যে 'দোচালা' ও 'জোড়বাংলা' 'আটচালা'র তুলনায় তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

এই ধরণের চালাঘর সেকালে কমই নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'জোড়বাংলা'-মন্দির বাংলার নানা স্থানে অনেকটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আকার, আয়তন, প্রাচীনত্ব ও উৎকৃষ্ট অলংকরণের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫খ্রীঃ) আদর্শস্থানীয়। বাংলার আরও বহু স্থানে সতেরো শতকে 'জোড়বাংলা'-রীতির মন্দির তৈরি হয়েছিল এবং এই মন্দির উনিশ শতক পর্যন্ত তৈরি হতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে বাংলায় 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রাক্-মুসলিম যুগে হিন্দু রাজাদের আমলে এই 'রত্ন'-মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। স্বাধীন সুলতানদের আমলেও এই শৈলীর মন্দিরের উদ্ভব হয় নি। ঐ সময়ের মধ্যে নির্মিত কোন 'রত্ন'-মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। 'রত্ন'-মন্দির 'চারচালা' বা সমতলছাদযুক্ত 'দালানে'র ওপর এক বা পাঁচ অথবা নয় প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি 'দেউল'-রত্ন অথবা সমান্তরাল খাঁজযুক্ত দেউলরত্ন বসিয়ে নির্মাণ করা হোত। কোন কোন ক্ষেত্রে দালান বা চালার ছাদের ওপরে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের 'চারচালা'-রত্নও স্থাপন করা হোত। 'রত্ন'-শৈলী' পর্যায়ে 'একরত্ন' থেকে 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' পর্যন্ত মন্দির নির্মিত হ'তে দেখা গেছে নানা স্থানে।

প্রাক্-মুসলিম যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন, স্বাধীন সুলতানী আমলে উদ্ভাবিত ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের ফল হোল এই 'রত্ন'মন্দির। শিখর-দেউলের মতো রত্নমন্দিরেরও দুটি অংশ—নিম্ন ও ঊর্ধ্বভাগ (sub-structure and superstructure)। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছিল, তার ফলে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যে-হিন্দুদের বক্র কার্ণিশযুক্ত 'দালান' যেমন একদিকে মুসলিম স্থাপত্যে গৃহীত হয়, অন্যদিকে দালানের ছাদে গোলাকার গম্বুজ, হিন্দুস্থাপত্যে 'রত্নে'র আদর্শরূপে গৃহীত হয়। এই নীতির প্রয়োগে 'দালানে'র ছাদে ঐতিহ্যাগত 'শিখর'-দেউলের রূপান্তরিত সরলীকৃত ক্ষুদ্রাকার দেউল স্থাপন করার রীতি প্রচলিত হয়। শুধুমাত্র এই ধরনের সরলীকৃত দেউল বাংলায় সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য নির্মিত হয়েছিল। এই যুগে প্রাক্-মুসলিম যুগের সু-উচ্চ 'শিখর' দেউল মন্দির-নির্মাণধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও তার পরিবর্তে ওড়িশা থেকে আগত 'রেখ'-দেউলের অনুকরণে ছোট ছোট 'দেউল' নির্মিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে সেগুলিতে 'চালা'র ভাব অনেকটা এসে গিয়েছিল। এই সরলীকৃত 'রেখ'-দেউলগুলির ক্ষুদ্র রূপ 'দালান' বা 'চালা'র ছাদে বসানো হ'তে থাকে। অনেক সময় এই দেউলগুলির উপরিভাগের দেওয়ালে সমান্তরাল খাঁজ ধাপে ধাপে তৈরি ক'রে প্রাচীন 'পিঢ়া'র অনুকরণও করা হয় এবং এই ধরনের 'রত্ন'-দেউলও বসানো হয়। আবার সম্পূর্ণ এই ধরণের দেউলও বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভবের গোড়ার দিকে 'একরত্ন'কে যদি প্রথম ধরা যায়, তাহলে এটি একগম্বুজযুক্ত মসজিদ বা কবরসৌধের আদর্শে গঠিত হয়েছিল, এই ধারণা প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমর্থনে পাণ্ডুয়ার (মালদহ) 'একলাখী কবরসৌধ'কে আদর্শ বলে মনে করা হয়। পূর্বে আলোচিত এই সৌধটি বাংলার 'একরত্ন'-শৈলীর উদ্ভবের পশ্চাতে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব যে ইসলামীয় গম্বুজশীর্ষ মসজিদের অনুকরণে হয়েছিল অথবা ঐরূপ মসজিদ 'রত্ন'-মন্দির-উদ্ভবের পশ্চাতে আদর্শরূপে কাজ করেছিল, একথা কেউ কেউ মনে করেন। মসজিদে কেন্দ্রীয় গম্বুজটির চারপাশে মিনার স্থাপন করার রীতিও সেসময় প্রচলিত হয়। 'রত্ন'-মন্দিরের ক্ষেত্রে 'পঞ্চরত্ন'

প্রভৃতির উদ্ভবের পশ্চাতেও এটা প্রেরণা রূপে কাজ করে থাকবে। পনেরো শতকে এই ধরণের বহু মসজিদ বা কবরসৌধ গৌড়,পাণ্ডুয়া ও অন্যান্য স্থানে নির্মিত হতে থাকে। 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব আরও পরে। সম্ভবত ষোড়শ শতকে এর উদ্ভব হয়, কিন্তু ঐসময়ের কোন 'রত্ন'-মন্দির লক্ষ্য করা না গেলেও সপ্তদশ শতকে নির্মিত বহু 'রত্ন'-মন্দির পরিপূর্ণরূপ লাভ করে।[৫৩] এই শৈলীর মন্দির মল্লরাজাদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল।প্রাচীন 'রত্ন'মন্দিরগুলি মল্লভূমের নানা স্থানে সপ্তদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন, বীরসিংহের(বাঁকুড়া) বৃন্দাবনচন্দ্রের (১৬৩৮) মন্দির (ধ্বংসপ্রাপ্ত, সম্ভবত 'পঞ্চরত্ন' ছিল), গোকুলনগরের গোকুলচাঁদের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩), বিষ্ণুপুরের শ্যামচাঁদের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩), বৈতলের রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৬০) প্রভৃতি। 'একরত্ন' মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত দ্বাদশ-বাড়ির 'একরত্ন'টি বেশ প্রাচীন, যদিও খুবই জীর্ণ। এর 'রত্ন'টি আটকোণা এবং এর চারদিক খোলা। আনুমানিক খ্রী. সতেরো শতকের প্রথমার্ধে এটি নির্মিত হয়। বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ অঞ্চলের কালাচাঁদের 'একরত্ন'টি ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। ওন্দা থানার অন্তর্গত যাদবনগরের যাদবরায়ের মন্দিরটি মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করেন। এর 'রত্ন'টি নীচের 'দালানে'র প্রায় সর্বাংশ জুড়ে অবস্থিত, যা একান্তই অভিনব— অনেকটা 'শিখর'-দেউলের মতো।[৫৪] এই ধরণের আর একটি সুদৃশ্য 'একরত্ন' (যা অনেকটা 'শিখর' দেউলের মতো) মেদিনীপুর জেলার মোহনপুরে জগন্নাথের মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়।[৫৫]

কেউ কেউ মনে করেন 'রত্ন'মন্দিরের নিম্নভাগে বাংলার লোকায়ত 'চালা'-স্থাপত্যের সঙ্গে ছাদের উপরিভাগে যে ঐতিহ্যাগত শিখরকে 'রত্ন'রূপে স্থাপিত করা হয়,তার ধারণাটা এসেছে মুসলমানদের আঞ্চলিক ধর্মীয় স্থাপত্য গম্বুজশীর্ষ সৌধের থেকে। এইরূপ সৌধের নিম্নভাগে 'চালা'-কুটিরের অবস্থান এবং তার ওপরে মুসলমানদের ঐতিহ্যাগত গম্বুজ স্থাপন— এই দুইএর সংযোগে অখণ্ড একটি স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব হয়। মুসলমানদের একগম্বুজ মসজিদ বা কবরসৌধের সঙ্গে এর সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে বাংলার রত্ন'মন্দিরের পুরোগামী রূপে একে বলা যেতে পারে। 'রত্নে'র সর্বাপেক্ষা সরলীকৃত যে রূপ 'একরত্ন', তার সঙ্গে মুসলমানদের একগম্বুজ স্থাপত্যের পার্থক্য শুধু হোল ওপরের অংশটিকে নিয়ে।[৫৬] ইসলামীয় স্থাপত্যে বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গম্বুজের চারদিকে 'ছত্রী' স্থাপন করা হয়। বাংলার 'পঞ্চরত্ন' প্রভৃতি মন্দির সম্ভবত এরই আদর্শে তৈরি হয়ে থাকবে, এমন ধারণাও প্রচলিত আছে। এইভাবে 'রত্ন'মন্দিরগুলির পূর্বসূরী বা আদর্শ যে মুসলিম গম্বুজশীর্ষ সৌধগুলি, এই ধারণা একরূপ বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু 'রত্ন'মন্দিরের এই উদ্ভবসূত্র সমর্থনযোগ্য নয়। মধ্যযুগে মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে কিছুটা আঞ্চলিকতার ছাপ পড়লেও বাংলার 'রত্ন'মন্দির-স্থাপত্য গম্বুজযুক্ত ইসলামীয় ধর্মীয় সৌধের প্রভাবান্বিত ছিল, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। মুসলমান শাসনাধিকারে প্রাচীন বাংলার মন্দিরচর্চার সাময়িক বিরতি ঘটলেও দক্ষ কারিগরদের মধ্যে সেই চর্চার ধারা তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। 'নাগর'-শৈলীর অন্তর্ভুক্ত ওড়িশীরীতির 'দেউল' মন্দির অজস্র নির্মিত হয়েছিল এইসময়ে, বিশেষ করে, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় এবং বর্ধমানের স্থানে স্থানে। অলংকরণ-প্রাচুর্যে ভরপুর তুঙ্গ শিখরযুক্ত ওড়িশী দেউল বা স্থাপত্যালংকারে ভূষিত পাল-সেন পর্বের জৈন-বৌদ্ধ 'শিখর' দেউল-মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে তার সরলীকরণ চলল— সৃষ্টি হোল সরল কিন্তু পরিচ্ছন্ন এক নতুন 'দেউল'মন্দিরের। এর মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ ছিল না, কিন্তু ছিল প্রাণের স্পর্শ, বাংলার গ্রামাঞ্চলের

পরিবেশ-পরিমণ্ডলের উপযোগী একটি নতুন শ্রেণীর দেউল। এগুলি ছিল আকারে ছোট, নীচের খাড়া চারটি দেওয়ালের ওপর ঈষৎ বক্রাকার শিখরটি নেহাতই সাদামাটা যেন নিম্নভাগের থেকে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার মধ্যে 'চালা'র ভাবটাও কিছুটা এসে গেছে। এই ক্ষুদ্রাকার দেউলগুলির অধিকাংশেরই সামনে কোন 'জগমোহন' বা মণ্ডপ নেই, থাকলেও তা যেন কতকটা দায়সারা গোছের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর সামনে একটিমাত্র প্রবেশপথ, কোন ঢাকা বারান্দা নেই, চারদিকের দেওয়ালে উদ্‌গত রেখাবিন্যাস আলো-আঁধারির সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। সামনের দিকে অল্পস্বল্প অলঙ্করণ— এই ছিল আলোচ্য দেউলগুলির বৈশিষ্ট্য। অনেকসময় দেউলগুলির ঊর্ধ্বাংশের দেওয়াল সমান্তরাল খাঁজকাটা; অথচ বক্রাকার রেখা-বিন্যাস স্পষ্ট। সৃজনশীল বাঙালি স্থপতির মানসপটে নতুন এক শৈলী জন্ম নিল। তা হোল 'রত্ন'-মন্দির। এতদিন ধরে সে শুধু 'চালা' ও সমতল ছাদযুক্ত 'দালান' মন্দির নির্মাণ ক'রে আসছিল। এখন দালানকে আরও উচ্চ ও অলংকৃত করার কথা সে চিন্তা করল। প্রথমে দালানের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্রাকার রেখ-দেউল বা সমান্তরাল খাঁজকাটা দেউল 'রত্ন'-রূপে বসানো হোল। এর উদ্ভব সম্ভবত 'শিখর'-দেউল থেকে। লক্ষ্য করা গেছে, প্রাচীন কাল থেকেই 'শিখর'দেউল দুটি সুস্পষ্ট অংশ নিয়ে একটি অখণ্ড রূপ লাভ করেছিল। এর নীচের অংশটি চতুষ্কোণ 'দালান'। গুপ্তযুগে নব-উদ্ভূত মন্দির-স্থাপত্যের গোড়ার দিকে শুধুমাত্র 'দালান'ই ছিল দেব বিগ্রহের অধিষ্ঠান বা গর্ভগৃহ।[৫৭] পরবর্তীকালে এই দালানের ওপরই 'শিখর' নির্মিত হতে দেখা যায়। 'দালানে'র সামনে অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর কারুকার্য করা থামের ওপরে যে মণ্ডপ (porch) থাকত, পরবর্তীকালে সেটিকে আরও প্রসারিত করা হয়। আইহোলে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত লাড়খান মন্দিরে এ ধরণের স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও এখানে 'শিখর' নামমাত্র। দালান ও তার সামনের মণ্ডপটি প্রশস্ত।[৫৮] পূর্বোক্ত হুচ্ছপ্পায়্যা মন্দিরটির (আইহোল, খ্রী. অষ্টম শতক) সামনেও প্রশস্ত মণ্ডপ, মূল গর্ভগৃহের ওপর শিখর স্থাপিত, কিন্তু প্রসারিত মণ্ডপটি এরই অংশ।[৫৯] পূর্বোক্ত পত্তদাকলের জম্বুলিঙ্গ মন্দিরের নীচের দালানের সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার মণ্ডপ এবং ওপরের 'শিখর'-এর দুটি ভাগও সুস্পষ্ট। বাংলায় এই 'শিখর' বা 'রেখ' দেউলের দুটি বিশিষ্ট বিভাগ লক্ষ্য করা যায়— দালান ও শিখর (Sub-structure ও Superstructure)।

বাংলায় সতেরো-আঠারো শতকে নির্মিত 'রত্ন'মন্দিরগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, নীচের সমতল ছাদযুক্ত দালানটিকে চারদিকে প্রসারিত ক'রে এবং সামনে অথবা দুই দিক বা চার দিকেই ঢাকা বারান্দা যুক্ত ক'রে মাঝখানে বা অল্পকিছু ক্ষেত্রে দালানের একেবারে পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে 'শিখর' স্থাপন করা হয়েছে। এইভাবে একটি রত্ন-শিখর স্থাপিত ক'রে 'একরত্ন'-শৈলীর উদ্ভব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নীচের দালানের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে শিখরটি স্থাপিত হয়েছিল। 'একরত্ন'-শৈলীর বলে মনে হলেও এতে দেউলরূপটিই সামগ্রিকভাবে ফুটে ওঠে। এ ধরণের একটি মন্দির পূর্বোক্ত যাদবরায়ের মন্দির (১৬৫০, বাঁকুড়া) এবং মোহনপুরের (মেদিনীপুর) জগন্নাথমন্দির (আঃ আটারো শতক)। আরও পরবর্তীকালে নির্মিত অপর একটি দৃষ্টান্ত, ভগবানপুর থানার বাঘাদাঁড়ির (মেদিনীপুর) রঘুনাথের 'একরত্ন' মন্দির। এ থেকেই অনুমান করা যায়, শেষ-মধ্যযুগে দেউল মন্দিরকে আদর্শ রেখে 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব হয়েছিল। লক্ষ্য করা যায়, বাংলার 'রত্ন'মন্দিরগুলির নিম্নভাগ অর্থাৎ গর্ভগৃহের (sanctum) প্রায় সবই 'দালান'রীতির। বহু ক্ষেত্রে সমতল ছাদযুক্ত দালানের কার্নিশ ঈষৎ বক্র করা হয়েছে, আবার সমতল কার্নিশও বহু লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ওপরের চালের ঢালু ভাবটা অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়

না। বিষ্ণুপুরে লালবাঁধ এলাকার 'একরত্ন'গুলিতে এবং পাত্রসায়রের (বাঁকুড়া) কালঞ্জয় শিবমন্দিরে চালার ওপর 'রত্ন' লক্ষ্য করা যায়। আবার, বাংলাদেশের পুঠিয়ায় (রাজশাহী জেলা) নীচের চালার ছাদে 'চারচালা' রত্নগুলি বসানো হয়েছে।[৬০] পশ্চিম বাংলার কোন কোন মন্দিরে 'চারচালা'-রত্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের (হুগলি) রাধাবল্লভ এবং নদীয়ার কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালী মন্দির। এই 'চারচালা'- রত্ন আবার জোড়বাংলা মন্দিরেও 'রত্ন'রূপে স্থাপিত হয়েছে। (দৃষ্টান্ত, বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা')। 'দেউল' ও 'চালা'-শৈলীর বহুল প্রচলনের ফলে বাঙালি কারিগরেরা এগুলিকে 'রত্ন' হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তাই শেযমধ্যযুগে সরলীকৃত দেউলের বহুল প্রচলন হওয়ায় সেটি যেমন 'রত্ন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি লোকায়ত 'চালা'স্থাপত্যকেও নীচের প্রশস্ত দালানের ওপর 'রত্ন'রূপে স্থাপিত করা হয়েছে, 'চারচালা'-রত্নের ক্ষেত্রে নীচের 'চারচালা'র ওপর স্থাপিত হলে এটিকে 'আটচালা' বলেও মনে হতে পারে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ মন্দির, হুগলি)। অবশ্য, এই ক্ষেত্রে বাংলার খড়ের 'আটচালা' কুটিরের সঙ্গেই এর সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়। শুধুমাত্র 'চারচালা' এক-রত্নের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

বাংলার 'একরত্ন'-মন্দিরের ভিন্ন একটি রূপ কতকটা চালা-আকারের আটকোণা রত্ন, যা অনেক মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়— যেমন গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রের মন্দির (সপ্তদশ শতক), বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দির, বলিহারপুরের ব্রজরাজকিশোরের মন্দির (দাসপুর, ১৭৭০) প্রভৃতি। 'একরত্ন' স্থাপত্য-সৃষ্টির পশচাতে তাই 'দেউল' ও 'চালা'-শৈলীর ধারণা থাকা খুবই সম্ভব। 'পঞ্চরত্ন'-শৈলীর ক্ষেত্রে প্রাচীন 'পঞ্চায়তন' মন্দিরের কথা মনে হতে পারে। অর্থাৎ মূল কেন্দ্রীয় মন্দিরটির সঙ্গে একই পীঠিকায় চারকোণে চারটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দেউল নির্মাণ ক'রে সেসময় এই 'পঞ্চায়তন' মন্দির হোত। বোধগয়ার মহাবোধিমন্দির 'পঞ্চায়তন' মন্দিরের এক উল্লেখ্য নিদর্শন, যদিও অনুমান, কোণের চারটি 'দেউল' পরবর্তীকালের। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মেশ্বর মন্দির পঞ্চায়তন শ্রেণীর। মালদা জেলার ওয়াড়িতেও একটি 'পঞ্চায়তন' শ্রেণীর মন্দির ছিল (১৫৪৫খ্রীঃ) বলে অনুমান।[৬১] 'পঞ্চায়তন'মন্দিরকে পরবর্তীকালে চারদিক দিয়ে একটি ঢাকা বারান্দার দ্বারা যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তখন এটি পঞ্চরত্নের মতো দেখায়। মধ্যপ্রদেশের রেওয়া অঞ্চলে বা ত্রিহুতে পঞ্চায়তন মন্দিরটি এইভাবে একটি সৌধে পরিণত হয়েছে দেখা যায়।[৬২] সম্ভবত প্রাচীন বাংলার 'পঞ্চায়তন' মন্দিরগুলি থেকে 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরগুলির উদ্ভব হয়। তবে, প্রাক্-মুসলিম যুগে পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে যে 'প্রাসাদ' শ্রেণীর বহু মন্দির ছিল (পূর্বে আলোচিত) যার 'দালান'গুলির চারদিকে 'শিখর' বসানো থাকত, সেই শ্রেণীর মন্দির থেকে রত্নমন্দির এবং 'পঞ্চরত্ন' বা 'নবরত্ন' শ্রেণীর মন্দিরের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। এই অঞ্চলে 'প্রাসাদ'-রীতির যে বহু মন্দির নির্মিত হয়, শেষ-মধ্যযুগে বাংলার 'রত্ন'-মন্দিরগুলি তাদেরই পরিবর্তিত ও সরলীকৃত রূপ। 'নবরত্ন' মন্দিরের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। প্রায়ক্ষেত্রে 'দালানে'র ছাদের ওপরে আর একটি ক্ষুদ্রাকার 'দালান' তৈরি ক'রে তার ওপর পাঁচটি দেউলরত্ন স্থাপিত করা হয়। কেন্দ্রীয় রত্নটি বৃহৎ আকার হয় স্বাভাবিকভাবে। এর পর ওপরে আরও দু'একটি তল বাড়িয়ে 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', এমন কি, 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' পর্যন্ত মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সর্বাধিক চারটি তলের অধিক তল লক্ষ্য করা যায় না। সর্বাধিক পঁচিশটি 'রত্ন' এই তলগুলির মধ্যেই সন্নিবেশিত করা হয়। পাঁচশটি 'রত্ন' স্থাপন করতে গেলে নিয়ম অনুসারে যে ছয়টি তলের প্রয়োজন হয়, বাংলার কোন 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে তা দেখা যায়

না। সর্বাধিক চারটি তলেই 'রত্ন'গুলির সমাবেশ ঘটে। কালনার (বর্ধমান) 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরগুলিতে (অষ্টাদশ শতক) চারটি তল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সুখাড়িয়ার (হুগলি) আনন্দভৈরবীর মন্দিরের (১৮১৩) তিনটি তলেই পঁচিশটি চূড়া সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

'রত্ন'-মন্দিরের এই অভাবনীয় বিকাশ চৈতন্যোত্তর যুগের বাংলার মন্দিরশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল চিত্রটি উপস্থিত করে। 'চালা', 'দেউল' ও 'রত্ন'-শৈলীর মন্দির সতেরো শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে অজস্র তৈরি হয়। এগুলি ছাড়া 'দালান' ও 'চাঁদনি' শৈলীর মন্দিরও প্রচুর তৈরি হয়। সমতল ছাদ এবং সরল বা কার্ণিশযুক্ত মন্দির সুপ্রাচীন গুপ্তযুগ থেকেই নির্মিত হয়ে আসছে।

এই রীতির মন্দির 'দালান' ও 'চাঁদনি' দুটি নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রশস্ত আয়তনযুক্ত লম্বা 'হল'ঘর এবং সামনে বহু প্রবেশপথযুক্ত 'দালান' আঠারো-উনিশ শতকে অসংখ্য তৈরি হয়েছিল। বিশেষ ক'রে, দুর্গা ও কালীদালানগুলি প্রশস্ত আয়ত, মূল গর্ভগৃহ ও সংলগ্ন ঢাকা বারান্দা—এই দুটি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এগুলিকে 'চণ্ডীমণ্ডপ'ও বলা হোত। রাজা-জমিদারদের প্রাসাদ-সংলগ্ন ছিল এই সব 'দালান' মন্দির। অনেক 'দালান'মন্দিরে 'পঙ্কে'র অলংকরণে ফুললতাপাতার নক্শা সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হোত। কিন্তু 'চাঁদনি' সমতলছাদযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডপরূপে তৈরি করা হোত। এটি চতুষ্কোণ বা আয়তক্ষেত্রাকার হলেও সামনে 'খিলান' প্রবেশপথ এক থেকে তিনের মধ্যে থাকত। 'চাঁদনি'-রীতির মন্দিরগুলি গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে লক্ষ্য করা যায়। এগুলি যেন অভিজাত শ্রেণীর বিশালাকার 'দালানে'র তুলনায় বেশি লোকায়ত। ক্ষুদ্রাকার 'চাঁদনি'র সংলগ্ন একটি ঢাকা বারান্দা 'মুখশালা'র (ante-chamber) কাজ করত। এই শ্রেণীর কোন কোন মন্দির লিপিতে 'চাঁদনি' বা 'চান্দনি' কথাটি স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে।[৬৩] অপরপক্ষে, কোন কোন 'দালান' মন্দিরের লিপিতেও 'দালান' কথাটি আছে।[৬৪] আবার, আয়তন ও গঠনকৌশলের দিক থেকে এই দুটি যে পৃথক্ শৈলী (উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও), তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। 'চাঁদনি' শৈলীটির সঙ্গে গুপ্তযুগের সমতলছাদযুক্ত মন্দিরের সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হতে হয়।[৬৫] গুপ্তযুগের এই রীতির মন্দিরের সামনে যে সুন্দর কারুকার্যযুক্ত থামের ওপর ন্যস্ত মণ্ডপ লক্ষ্য করা যায়, শেষ মধ্যযুগের বাংলায় তার পরিবর্তে সুন্দর 'ইমারতি' থামের ওপর ন্যস্ত ঢাকা বারান্দা যুক্ত হয়ে মন্দিরটির সামগ্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। গুপ্তযুগে এইরূপ মন্দিরের ওপর 'শিখর' স্থাপনের প্রয়াস পরবর্তীকালে দেখা যায়।[৬৬] কাজেই বাংলায় এই 'চাঁদনি' মন্দির যে সুপ্রাচীন একটি মন্দিরশৈলীর বিবর্তিত রূপ, তাতে সন্দেহ নেই। সরসীকুমার সরস্বতী গুপ্তযুগের সমতলছাদযুক্ত মন্দির সম্পর্কে বলেন, 'The simplest type may be seen in the small single celled flat roofed shrine with a shallow porch in front ....The ground plan of the sanctum is almost always a definite square, though a rectangular plan of the sanctum is also occasionally met with.... The flat roof, the plain square or rectangular form and the stern simplicity of the walls, all point to the rock-hewn cave as its proto-type.'[৬৭]

অন্ত-মধ্যযুগে বাংলার আঞ্চলিক মন্দিরস্থাপত্যে এইভাবে এক নতুন ধারার উদ্ভব হয়। এই ধারা যুগপৎ পাল-সেনপর্বের ঐতিহ্য ও বাঙালির লোকায়ত দেশজ স্থাপত্যশিল্পের সংমিশ্রণজাত, যে লোকায়ত দেশীয় স্থাপত্য 'চালা' এই অঞ্চলের মানুষের একান্ত আপন ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হোল

মুসলিম স্থাপত্যের কিছু কলাকৌশল। এই বিভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া হোল মন্দিরের নক্‌শা, গঠনরীতি ও বাহ্যরূপ প্রাথমিক পর্যায়ে যার সমীকরণ চলল পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে।[৬৮] যদিও 'চালা'-স্থাপত্য অনেক আগেই পূর্ণরূপ পেয়েছিল, কিন্তু 'দেউল', 'রত্ন' 'চাঁদনি' ও 'দালান'-শৈলীর উদ্ভব এই সময়ের মধ্যেই হয়েছিল অনুমান করা চলে, যার চরম উৎকর্ষ আঠারো শতকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই 'দালান' বা 'চাঁদনি'র ওপর আর একটি 'চাঁদনি' বা 'দালান' স্থাপন করে 'দ্বিতল' 'দালান' বা দ্বিতল 'চাঁদনি' মন্দিরও কিছু কিছু নির্মিত হয়। উনিশ শতকের মধ্যে নবপর্যায়ের এই মন্দিরস্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কোন কোন শৈলী যেগুলি সম্পূর্ণরূপেই একক, কতকটা পাশ্চাত্যস্থাপত্যশৈলীর প্রভাবজাত। কোন কোন ক্ষেত্রে গির্জার চূড়ার মতো ক'রে 'রত্ন' স্থাপন (লাউজীউর মন্দির,১৮৫১ মহানাদ,হুগলি) আবার, অন্য এক ধরণের আটকোণা ছত্রাকার দেউল (রাজরাজেশ্বর মন্দির,১৭৫৪, শিবনিবাস, নদীয়া)। বাংলাদেশে এইরূপ নানা শ্রেণীর মন্দির তৈরি হয়েছিল।[৬৯] এই মন্দিরগুলির শৈলী পূর্ব আলোচিত শৈলীগুলির কোনটির মধ্যেই পড়ে না। এগুলি বাঙালি স্থপতির নিজস্ব সৃষ্টি— য়ুরোপীয় ও ইসলামীয় স্থাপত্যের সহমিশ্রণ অথবা প্রভাবজাত। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি থেকে উনিশ শতকের দিকেই এগুলির বেশিরভাগ তৈরি হয়, কিন্তু কখনই জনমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই প্রতিষ্ঠাতা ও কারিগর প্রচলিত শৈলীরই অসংখ্য মন্দির তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। এই সঙ্গে তাঁরা যে অসংখ্য 'রাসমঞ্চ' ও 'দোলমঞ্চ' তৈরি করেন, সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ শৈলীর উদ্ভব হয়। রাসমঞ্চগুলির বেশির ভাগেরই 'রত্ন' ছিল 'বেহারীরসুনের মতো চূড়া যুক্ত। ম্যাক্‌কাচ্চন যাকে বলেছেন 'European baroque art'। বাংলার কোন কোন অঞ্চলের স্থপতিরা একে 'বেহারীরসুন চূড়া' বলেছেন। উচ্চ বেদির ওপর অবস্থিত চারদিব খোলা গোলাকার দালানের ওপর এই ধরণের কোন ক্ষেত্রে নয়টি, অথবা সতেরোটি বা পঁচিশটি চূড়া বসানো হোত। আবার প্রচলিত দেউলরত্ন বা আনুভূমিক খাঁজযুক্ত রত্নও বসানো হোত। দোলমঞ্চগুলি ছিল সাদামাটা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি ছিল 'একরত্ন'।

নব পর্যায়ের বাংলার মন্দিরের সংখ্যা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। বহু মন্দির ধ্বংস ও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবুও, এখনও যা অবশিষ্ট বা অক্ষত আছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ষোল শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে নতুন শৈলীর মন্দিরগুলি সর্বাধিক নির্মিত হয়। একদিকে শ্রীচৈতন্যের নবপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে আপামর জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ-নিম্নের ভেদাভেদবোধ অনেকটা দূর হোল এবং রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা প্রাধান্য লাভ করল, অন্যদিকে এই সময়ে রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এল, তার ফলে শুধুমাত্র অভিজাত রাজা-জমিদারের বদলে নতুন এক ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হোল। এরা সমাজে তথাকথিত নীচু 'অজলচল' অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হলেও কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন ক'রে এক নতুন ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি করল। পূর্বতন ভূস্বামী-জমিদারদের মতো এদেরও মন্দিরপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু মন্দির নির্মিত হ'তে থাকল।[৭০] কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে মন্দিরের সংখ্যাধিক্য বা বিচিত্র ধরণের নানা মন্দির তৈরি হ'তে থাকলেও উৎকর্ষ ও গুণমানের দিক থেকে স্থপতিদের কারিগরী শক্তির দৈন্যই লক্ষ্য করা যায়। অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধিও নানা শ্রেণীর মন্দিরের আবির্ভাব, কিন্তু উৎকর্ষের

ন্যূনতা নির্মীয়মান এই অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে ফুটে উঠছিল। কেননা, সমাজের বিত্তবান অভিজাতশ্রেণীরা ছাড়াও 'নবশাখ', 'অজলচল' এবং 'অন্ত্যজ' ধনীব্যক্তিরা মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেও তারা গতানুগতিক স্থাপত্যশৈলীর মন্দিরই বেশি প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে উপরি উক্ত জাতিভুক্ত ব্যক্তিরা যেখানে 'শিখর', 'রত্ন' ও 'দালান'রীতির মন্দির নির্মাণেই বেশী আগ্রহী ছিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ,কায়স্থ ও বৈদ্য (যারা উচ্চ বর্ণের বলে পরিচিত) 'চালা'-রীতির মন্দির নির্মাণেই ছিলেন বেশি তৎপর।[৭১] মন্দির- অলংকরণের জন্য পৌরাণিক দেবদেবী-লীলাদৃশ্যের ফলক সংস্থাপনেই পূর্বোক্ত জাতিদের আগ্রহ ছিল বেশী। পক্ষান্তরে, অভিজাতশ্রেণীভুক্ত উচ্চবর্ণের ধনীরা পৌরাণিক দৃশ্যচিত্রের তুলনায় সামাজিক ঘটনাবলীর দৃশ্য রূপায়ণেই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। এই দুই পরস্পর বিপরীতধর্মী মানসিকতা থেকে এটা স্পষ্ট, তদানীন্তন সমাজে নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিদের মধ্যে 'সংস্কৃতায়ন পদ্ধতি' (Sanskritization) কাজ করছিল। তাঁরা মন্দিরনির্মাণে ঐতিহ্যানুসারী স্থাপত্য ও অলঙ্করণ-বিন্যাসের পরিপোষকতা ক'রে উচ্চবর্গে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কারণ, তৎকালীন সমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করা যেত এই ধরণের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। (যেমন, এখনকার অর্থাৎ বিশশতকের শেষ ভাগের সমাজে অর্থকৌলীন্য এবং রাজনীতিক মতাদর্শই আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ফলে হীনব্যক্তিরাও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠছে)। পক্ষান্তরে, উচ্চ বর্ণের ধনী জমিদারশ্রেণী সমাজের সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে চাইছিলেন 'চালা'-শৈলী এবং অলঙ্করণের জন্য সমসাময়িক ঘটনাবলীর চিত্ররূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে। এঁরা স্থাপত্য ও মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, এঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলিতে য়ুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব পড়েছে এবং টেরাকোটায় সমকালীন চিত্রের মধ্যে য়ুরোপীয়দের উপস্থিতি বেশি নজরে পড়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হোল, মহিষাদল-রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে লুপ্ত রাসমঞ্চ যার চূড়াগুলি গির্জার চূড়ার অনুসরণে তৈরি হয়েছিল। সেকালে সামান্য অবস্থা থেকে ধনী হয়ে উঠলে 'দালান' বা উচ্চ শিখরযুক্ত 'রত্ন'-মন্দির প্রতিষ্ঠা একটা সামাজিক প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার পর বিশাল দুর্গাদালান বা চণ্ডীমণ্ডপে মহাসমারোহে দুর্গা বা কালীপূজা করার মধ্যে ভক্তির প্রকাশ যতটা না ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আড়ম্বর ঐশ্বর্য প্রকাশের চেষ্টা। এইভাবে সমগ্র বাংলায় অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন জঙ্গল মহালের অন্তর্গত তদানীন্তন মল্লভূমের রাজারা। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মন্দিরস্থাপত্য ও বিস্ময়কর 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণের সৃষ্টি ক'রে মল্লরাজারা যে এবিষয়ে অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র তাঁদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে নবপর্যায়ের প্রায় সব রীতিব মন্দিরই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন নি, বিষ্ণুপুরের বাইরে বহু স্থানেও 'রত্ন'-শৈলীর অনেক মন্দির তাঁরা তৈরি করান। এর কয়েকটির নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের 'গড়' এলাকায় শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩), কেষ্টরায়ের জোড়বাংলা (১৬৫৫) এবং শাঁখারীপাড়ায় মদনমোহনের 'একরত্ন' মন্দির (১৬৯৪) ইঁটের 'টেরাকোটা'-অলংকরণে সমৃদ্ধ মন্দিররূপে এখনও 'ক্ল্যাসিক' দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এছাড়া 'জোড়বাংলা'র পার্শ্ববর্তী রাধাশ্যামের পাথরের 'একরত্ন' (১৭৩৮) স্থাপত্য ও প্রস্তরভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একটি অনবদ্য রচনা। লালবাঁধ অঞ্চলের 'একরত্ন'গুলি পরিছন্ন সৌন্দর্যের প্রতীক। পূর্বোক্ত ইঁটের মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা'ফলকের কোন কোন

'মোটিফ', যেমন 'রাসমণ্ডলচক্র', ফলকের চারপাশের সূক্ষ্ম নকশা পার্শ্ববর্তী হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর অঞ্চলের মন্দির-অলংকরণের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর প্রমাণ নানা স্থানের মন্দিরে পাওয়া গেছে। বিষ্ণুপুরের সুবিশাল রাসমঞ্চ একটি একক ও অনন্য স্থাপত্য। মল্লরাজগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম নব বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এইসব মন্দির উৎসর্গ করেন। হিংসা পরিত্যাগ ক'রে তাঁরা অহিংসাব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করেন। কিন্তু তার আগে তাঁরা নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। কারণ, বৃন্দাবন থেকে শ্রীজীব গোস্বামী-প্রেরিত গাড়িতে যেসব অমূল্য বৈষ্ণবপুঁথি বাংলাদেশে আসছিল, বীরহাম্বির সেগুলি ধন মনে ক'রে অপহরণ করেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সুবিখ্যাত রাসমঞ্চটি তাঁরই কীর্তি। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, সেসময় জঙ্গল-অধ্যুষিত এই অঞ্চলে মল্লভূমের অধিপতিরা কিরূপ প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মন্দির-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁরা সমাজে কতখানি মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন। মল্লভূম তথা বিষ্ণুপুরের উৎকৃষ্ট মন্দির-সৌধগুলি বাংলায় নবপর্যায়ের মন্দিরচর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। ষোড়শ শতকের শেষদিকে কিছু কিছু দেউল ও 'রত্ন'-মন্দির(যেমন হুগলির বৈঁচিগ্রাম' (১৫৮০খ্রীঃ), বর্ধমানের বৈদ্যপুর (১৫৯৮), মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ (১৫৮৮) নির্মিত হলেও বিষ্ণুপুরের 'রত্ন' ও 'জোড়বাংলা' মন্দির সমগ্র বাংলায় অনন্য। অতএব সপ্তদশ শতকেই 'রত্ন' ও 'চালা'-শৈলীর মন্দির যে চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়েছিল, এগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়।

সতেরো শতকে মল্লভূমের রাজাদের হাতে 'রত্ন'-মন্দিরগুলি যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং আঠারো শতকে আরও যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়, সেগুলির আদর্শ ছিল মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের এই মন্দিরগুলি। কিন্তু কোনটিই এগুলির সমকক্ষ হতে পারে নি। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত দিনাজপুরের জমিদার প্রাণনাথ আঠারো শতকের গোড়ার দিকে তাঁর রাজধানী কান্তনগরে যে 'নবরত্ন' মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করেন, সেটি তাঁর পুত্র রামনাথ ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে শেষ করেন।[৭২] স্থাপত্য ও 'টেরাকোটা' সমাবেশের দিক থেকে এটি বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত কোন কোনটির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। অবশ্য বহু কাল আগে এই কান্তজীউর মন্দিরের কেন্দ্রীয় রত্নটি ছাড়া অন্য রত্নগুলি ভেঙে গেছে। জে. ফার্গুসনের *'হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ আরকিটেকচার'* গ্রন্থে নয়টি 'রত্ন'সহ এই মন্দিরের একটি চিত্র দেওয়া আছে। (দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ প্লেট নং ৩৫৪ এবং জর্জ মিশেল সম্পাদিত 'ব্রিক টেম্পলস্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থের (১৯৮৩) প্লেট নং ৬০৫ ও ৬০৬)। ঐ শতকের মাঝামাঝি সময় বর্ধমান রাজপরিবার বেশ কয়েকটি মন্দির তাঁদের রাজ্যের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে কালনার (বর্ধমান) মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে অন্তত তিনটি 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির আছে। বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্র কালনায় একশ আটটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন এবং চন্দ্রকোণার (মেদিনীপুর) রঘুনাথবাড়ি (অযোধ্যা) ও মল্লেশ্বরমন্দিরের (মল্লেশ্বরপুর) সংস্কার করেন। অষ্টাদশ শতকে অপর উল্লেখযোগ্য রাজা নদীয়ারকৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলিতে বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের এক নতুন শৈলীর উদ্ভব হয়। শিবনিবাস ও গঙ্গাবাসের মন্দিরগুলিতে টেরাকোটা-অলংকরণবর্জিত হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা রাঘব নদীয়ার দিগনগরে রাঘবেশ্বরের 'চারচালা'মন্দিরে (১৬৬৯) 'টেরাকোটা'র সুন্দর সমাবেশ করেন। রাজা রুদ্ররায়-প্রতিষ্ঠিত মাটিয়ারীর রুদ্রেশ্বরের 'চারচালা'তেও অলংকরণ

উল্লেখযোগ্য।

বাংলার এই নবপর্যায়ের মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে পরিশেষে একটা কথা বলা যায়, আলোচিত স্থাপত্যশৈলীর আবার অঞ্চলবিশেষে একই কালে কিছু রূপান্তর লক্ষ্য করা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'চারচালা'-রীতির মন্দির অঞ্চলবিশেষে প্রশস্ত ঢালু চালের পরিবর্তে খাড়া চালের সৃষ্টি করেছে, মাথাটা হয়ে গেছে অনেকটা সরু। হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে যেমন সুদৃশ্য প্রশস্ত ঢালু চাল ও বক্র কার্নিশ চারচালায় বা আটচালায় লক্ষ্য করা গেছে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় তেমনটি পাওয়া যায় না, পরিবর্তে খাড়া চালই বেশি চোখে পড়ে, যেমন, দিগনগর, মাটিয়ারি, জলেশ্বর(শান্তিপুর, নদীয়া), গোকর্ণ, বড়নগর(মুর্শিদাবাদ)। আবার, নদীয়া জেলার পালপাড়ায় একটি প্রশস্ত ঢালু চালের সুদৃশ্য বৃহৎ 'চারচালা'ও লক্ষ্য করা যায়। এগুলি প্রায় সবই সতেরো শতকে তৈরী হয়। দেউলের ক্ষেত্রে 'শিখর' প্রকৃত শিখরের মতো না হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় গম্বুজাকৃতি হয়ে গেছে, বহিঃপ্রাচীরে অনেক সময় উদ্‌গত করা হয়েছে আনুভূমিক খাঁজ। নানা স্থানে এ ধরণেরও বহু মন্দির লক্ষ্য করা গেছে। দেউলের শিখর আবার অনেকসময় 'চালা'র রূপ নিয়েছে। এর কারণ, বিশেষ ক'রে 'চালা'র ক্ষেত্রে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে একই কালে চালাকুটিরের রূপ স্থানীয়ভাবে অন্যান্য অঞ্চলের থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। 'চালা'-শৈলীতে সেই কারিগরী কৌশলই লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে করা যায়, নির্দিষ্ট রূপগুলির কোন সময় যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পশ্চাতে যেমন অনেক সময় সূক্ষ্ম কারিগরী দক্ষতার অভাব ছিল, তেমন মন্দিরদাতার ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট শৈলীর কোন কোনটির কিছুটা রূপান্তর ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে, চালা, রত্ন, দেউল, দালান ও চাঁদনি— এই পাঁচটি নির্দিষ্ট শৈলীর মন্দির অসংখ্য নির্মিত হলেও আরও অনেক শ্রেণীভেদ অঞ্চল ও কালভেদে উদ্ভূত হয়।

৫

মন্দির-অলংকরণ : চরিত্র ও বিন্যাস

প্রাক্-মুসলিম যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরে যে অলংকরণ-রীতি প্রচলিত ছিল, পূর্বোক্ত নবপর্যায়ের মন্দিরে স্থাপত্যশৈলীর বিবর্তনের সঙ্গে তারও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল। মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা' ও প্রস্তরফলকের অলংকরণ— উভয় ক্ষেত্রেই মন্দিরের অঙ্গসজ্জায় এই পরিবর্তন এল। প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জায় মূর্তির চেয়ে বিচিত্র ধরণের নকশা, যেমন ফুল, সর্পিলগতি লতাপাতা(meandering creeper), কল্পলতা, কৃত্তিমুখ, চৈত্যগবাক্ষ, ক্বচিৎ মনুষ্যমুখ বা মনুষ্য অথবা দেবমূর্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল। হিন্দুমন্দিরগুলিতে বিষ্ণুনারায়ণ, রামায়ণের কিছু কিছু দৃশ্যচিত্র এবং পৌরাণিক দৃশ্যও উপস্থিত করা হোত। কিন্তু এই অলংকরণ বা অঙ্গসজ্জা ছিল গতানুগতিক ঐতিহ্যানুসারী গুপ্তযুগের অলংকরণ-শৈলীধারায় অভিষিঞ্চিত। বাংলার কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তখনও স্ফুর্তিলাভ করেনি। যদিও পালসম্রাট ধর্মপাল-(আঃ ৭৭০ - ৮১০ খ্রীঃ)-প্রতিষ্ঠিত পাহাড়পুরে সোমপুর-মহাবিহারের একটি প্রাচীন মন্দিরগাত্রের যে অজস্র টেরাকোটামূর্তিফলক পাওয়া গেছে, তাতে অলংকরণের এক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৭৩] উল্লেখযোগ্য, এটি একটি বৌদ্ধ বিহার হলেও এখান থেকে যেসব টেরাকোটা ও প্রস্তরমূর্তিফলক পাওয়া গেছে, তাতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তিই বেশি। এই মূর্তিফলকগুলির তিনটি ধারা বা শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সরসীকুমার সরস্বতী এই তিন শ্রেণীর ভাস্কর্যকে যথাক্রমে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকে বাংলা শিল্পশৈলীর বিবর্তন বলে মনে করেন। অবশ্য, তাঁর মতে প্রথম দুটি শ্রেণীতে গুপ্তশিল্পধারার এক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মূর্তিফলকগুলিতে খাঁটি ও অবিমিশ্র দেশজ বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।[৭৪] তৃতীয় বিভাগ বা ধারার অন্তর্ভুক্ত 'বাস-রিলিফে' (Bas-Relief) খোদিত মূর্তিফলকগুলি অজস্র হলেও এর অনেকগুলি ক্ষয়ে গেছে, কোন কোনটি ঠিকমত বোঝা যায় না। এই মূর্তিফলকগুলির মধ্যে আছে দেবকীকর্তৃক নবজাত কৃষ্ণকে বসুদেবের কাছে সমর্পণ, কংসের কারাগার থেকে বালকৃষ্ণকে বসুদেবের বহন, বালকৃষ্ণের ননিভক্ষণ, রাখালবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের ক্রীড়া, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসক্রীড়া, কৃষ্ণকর্তৃক প্রলম্বাসুরবধ, অর্জুনকর্তৃক সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ অথবা এটিকে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধও মনে করা যায়, রাবণকর্তৃক সীতাহরণে রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ, ত্রিশিরাসুরের তপস্যা, কংসের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ অথবা ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন-ধারণ প্রভৃতি। এছাড়া পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তিও লক্ষ্য করা গেছে। এটি পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি একক বৌদ্ধ ভাস্কর্য।

উপরিউক্ত এই পৌরাণিক চিত্রগুলি ছাড়াও সমকালীন অনেক সামাজিক চিত্রও এখানকার অনেক ফলকে পাওয়া গেছে, যেমন, সাবলীল গতিতে সুন্দরী নর্তকীর নৃত্য, কতিপয় দ্বারপালমূর্তি এবং মৈথুনরত স্ত্রীপুরুষ। এছাড়া অন্যান্য চিত্রের মধ্যে আছে নানা ধরণের লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, জনপ্রিয় কাহিনীচিত্র, আলাপচারী দুই তপস্বী, কিন্নর, বিদ্যাধর, যুদ্ধদৃশ্য, আমোদপ্রমোদের দৃশ্য।

এই তৃতীয় ধারার মূর্তিভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সরস্বতী বলেছেন ঃ মূর্তিগুলি ভারী ও স্থূল— অনুপাত ও আকারে সামঞ্জস্যবিহীন। মূর্তির রূপদানে ও খোদাইকাজে সূক্ষ্মতার বদলে সব

চেয়ে বেশি রূঢ়তার পরিচয়ই মেলে।[৭৫] প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার মূর্তিভাস্কর্যে এইগুলি চোখে পড়ে না। প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত একটি মিথুনফলক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পনেরোটি মূর্তিফলকের মধ্যে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, যেমন যমলার্জুন, কংসের মল্লযোদ্ধা চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের মল্লযুদ্ধ, কেশিবধ প্রভৃতি। এর সঙ্গে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, শিবের অনেকগুলি মূর্তি, গণপতির মূর্তি। ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতি,শিব এবং চন্দ্র ও শিব বা মনুর মূর্তিগুলি যথার্থ কিনা সন্দেহজনক। প্রথম শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য যতটা লক্ষ্য করা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তগুলির মধ্যে ততটা পাওয়া যায় না।

কিন্তু, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও সংযত পরিমিতি না থাকলেও এগুলির মধ্যে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হতে সুরু হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত গুপ্তযুগে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য বাংলার ভাস্কর্যে অনুসৃত হওয়া প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গুপ্তযুগে প্রবর্তিত ভাস্কর্যরীতি অনুসৃত হোত। কিন্তু বাংলায় খ্রী. সপ্তম শতকের শেষ বা অষ্টম শতকের সুরু থেকে ভাস্কর্যশিল্পে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল এবং একটি নির্দিষ্ট 'বাংলা-রীতি' সেনরাজাদের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শুরু অবধি গড়ে উঠেছিল।[৭৬] পোড়ামাটি ও প্রস্তরভাস্কর্য-শিল্পের এই বিকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছিল সেন-আমলের শেষ পর্যন্ত। পাহাড়পুর-মন্দিরের ফলকগুলি ছিল লম্বা ও চওড়ায় এক ফুটের মতো অর্থাৎ বেশ বড়ো। এই শিল্প বেশ জোরালো এবং স্থূল। এখানের বিশাল মন্দিরের গাত্রে একসময় প্রায় তিন হাজার এই ধরণের ফলক সন্নিবেশিত ছিল, যার খুব কমই এখন যথাস্থানে আছে। এইসব ফলকে পূর্বোক্ত দৃশ্যচিত্রগুলি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারী, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, কাজকর্ম, জীবিকা, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক জীবন, খেলাধূলা, অবসরকালীন বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ, ধর্মানুরাগ ও বিশ্বাস, দেবমূর্তি, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় কথা ও কাহিনী অবলম্বনে দৃশ্যচিত্র প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া আছে নানা জন্তুজানোয়ার, পক্ষী ও মৎস্যের বাস্তব চিত্র।

পাহাড়পুর ছাড়াও বাংলার আরও অনেক প্রাচীন স্থানে উৎখননের দ্বারা পোড়ামাটির বহু ফলক পাওয়া গেছে, যার অনেকগুলিই প্রাচীন মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হোল, রাঙামাটি (মুর্শিদাবাদ), চন্দ্রকেতুগড় ও বেড়াচাঁপা (উত্তর চব্বিশ পরগণা), দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা), তমলুক ও পান্না (মেদিনীপুর)। এইসব অঞ্চলের 'টেরাকোটা'-ফলকগুলিতে গুপ্তযুগের শিল্পরীতির ছাপ সুস্পষ্ট। এছাড়া আরও অনেক স্থানে বহু ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, গুপ্তযুগে টেরাকোটা ও প্রস্তরফলকে যেসব মন্দির অলঙ্কৃত করা হোত, তার একটি নির্দিষ্ট শৈলী গড়ে ওঠে এবং বাংলায় সেই ধারাটি আবশ্যিকভাবে অনুসৃত হয় কয়েক শতক ধরে। কিন্তু পাহাড়পুরের তৃতীয়পর্যায়ের মন্দির'টেরাকোটা'-ফলকে যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তা প্রথাগত ধারা থেকে ভিন্ন এবং বাঙালিশিল্পীর নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট অনেকটা লোকায়ত শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। এই শিল্পের নিদর্শন পাহাড়পুর ছাড়াও মহাস্থানগড় (বগুড়া, বাংলাদেশ) এবং কুমিল্লার (বাংলাদেশ) ময়নামতীতে পাওয়া গেছে। কারও কারও ধারণা, 'এই প্রাচীন শিল্প মুসলমানেরা মঠগুলোকে বিনষ্ট করার বহু আগেই সম্ভবত লুপ্ত হয়েছিল (১১শ শতকের পাহাড়পুরমন্দিরের সংস্কারকার্য থেকে দেখা যায়, নতুন ফলক আর সুলভ নয় তখন) এবং

প্রাক্-মুসলিম যে-সমস্ত হিন্দু বা জৈন মন্দির এখনও টিকে আছে, তার কোনটাতে অন্তত এর হদিশ মেলে না—এগুলোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে খোদাই-করা ইঁটে প্লাস্টারের (স্টাকোর) সাহায্যে অলঙ্কৃত করা হয়।'[৭৭] আবার কারও কারও ধারণা, পাহাড়পুর বা ময়নামতীর বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত টেরাকোটাফলকগুলির মতো এ ধরণের শিল্প এর বেশ কিছুকাল পরেও আর কোন মন্দির বা বিহারে লক্ষ্য করা যায় নি, কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের চাপের ফলে গুপ্তযুগে বিধিবদ্ধ অনুশাসনের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শিল্পরূপই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছিল।[৭৮]

মুসলমান-আক্রমণ ও শাসনাধিকারে এই শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতক থেকে মন্দিরস্থাপত্যশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে এই শিল্পেরও পুনরুভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু অলঙ্করণের জন্যে টেরাকোটা ও প্রস্তরফলকে দেবলীলাবিষয়ক বা অন্য কোন মূর্তিবিন্যাস আরও অনেক পরে চলিত হয়। ইসলামীয় ধর্মীয় সৌধগুলিতে (বিশেষ ক'রে, ইঁটের তৈরি সৌধ) মূর্তির বদলে যেমন বিমূর্ত ফুলের নকশা, ঝুলন্ত বাতি, সর্পিলগতি পদ্মনাল (meandering lotus stalk), পরস্পরযুক্ত জ্যামিতিক নকশা বা জোড়া গোলাপের চিত্র স্থান পায়, তেমনি বাংলার গোড়ার দিকের সাদামাটা মন্দিরসমূহেও এইরূপ অলঙ্করণ প্রচলিত হতে থাকে। এমন কি, ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ-আন্দোলনের ফলে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা জনগণের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং আচণ্ডাল দরিদ্র এই সরল সহজ ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করলেও মন্দিরভাস্কর্যে পৌরাণিক কাহিনী বা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কোন দৃশ্যচিত্র এই শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত কোনও মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়নি। ঘাটাল-কোন্নগরের (মেদিনীপুর) সিংহবাহিনীর 'চারচালা'-মন্দিরের (প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৯০ খ্রীঃ, মন্দিরসংস্কারকালীন লিপিতে উল্লিখিত) সামনের দেওয়ালে মূর্তির পরিবর্তে (কৃষ্ণের দু'একটি মূর্তি ছাড়া) সূক্ষ্মকারুকার্যযুক্ত ফুলের নক্শা ও পোড়ামাটির কয়েকটি পদ্মফুল লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চদশ শতকের মসজিদেও এই ধরণের নক্শা বা পোড়ামাটির ফুল লক্ষ্য করা যায় (যেমন, গৌড়ের কয়েকটি মসজিদে)। এর পর বেশ কিছুকাল 'টেরাকোটা'-অলংকরণযুক্ত উল্লেখযোগ্য কোন মন্দির লক্ষ্য করা যায় নি, অন্তত ষোড়শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত। ষোড়শ শতকের একেবারে শেষের দিকে বিভিন্নস্থানে যে কয়েকটি মন্দিরে বিমূর্ত অলংকরণ ও পরীক্ষামূলকভাবে দু'একটি মূর্তি-সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হোল, বৈঁচিগ্রামে (হুগলি) গোপালজীউর পরিত্যক্ত দেউল (১৫৮২ খ্রীঃ, সম্ভবত বর্তমানে বিধ্বস্ত), যশোহরের (বাংলাদেশ) রায়নগর (১৫৮৮ খ্রীঃ), গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ, ১৫৯০ খ্রীঃ) একটি 'চারচালা' এবং বর্ধমানের বৈদ্যপুরের (১৫৯৮ খ্রীঃ) মন্দির। বৈঁচিগ্রামের পরিত্যক্ত মন্দিরটিতে বর্তমান লেখক লক্ষ্য করেছিলেন (লেখকের অনুসন্ধানকাল ১৭ই নভেম্বর সোমবার, ১৯৭৫)মন্দিরটি দেউলরীতির হলেও তার শিখর-অংশ চব্বিশটি সমান্তরাল খাঁজ যুক্ত। মন্দিরের সামনের দিকে পোড়ামাটির একটি লিপি ছিল বলে জানা যায়। সামনের দিকটা পড়ে যাওয়ায় সেই মূল্যবান লিপিটি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, তাতে ১৫০৪ শকাব্দ (= ১৫৮২ খ্রীঃ) উল্লিখিত ছিল। খুব পাতলা ইঁটের ব্যবহার, গাঁথনিতে কাদার ব্যবহার, অপ্রশস্ত প্রবেশপথ (অবশ্য, সব প্রবেশপথই বদ্ধ) প্রভৃতি থেকে মন্দিরটি ঐসময়ের বলে অনুমান করা যায়। সর্বোপরি এই মন্দিরে অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্র দুএকটি মনুষ্যমূর্তি ছাড়া দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের ওপরে ও চারপাশে পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল, লতাপাতার কাজ, সাপজাতীয় লম্বা একটি প্রাণী সেযুগের মন্দিরে অল্পস্বল্প 'টেরাকোটা'-অলংকরণ-সন্নিবেশের ইঙ্গিত দেয়। মন্দিরটির পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে প্রবেশপথের চিহ্ন থাকলেও

তা বদ্ধ ছিল। দক্ষিণের মূল প্রবেশপথটি কোন কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশেই বসবাসকারী সিং-পরিবারের পূর্বপুরুষ জনৈক গোকুলসিংহ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে জানা যায়। গোপালজীউয়ের এই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি দোলমঞ্চও মন্দিরের সমকালীন। মূলমন্দিরের তুলনায় এই দোলমঞ্চটি খুবই ছোট হলেও লেখকের অনুসন্ধানকালে সেটি অক্ষত ছিল। দোলমঞ্চটি একটি উচ্চ পাদপীঠের ওপর অবস্থিত। শিখরটি মূলমন্দিরের মতো সমান্তরাল খাঁজযুক্ত। নীচে চারদিকের অংশ খোলা হলেও চারদিকের চারটি প্রবেশপথে 'ইমারতি' থাম লক্ষ্য করা যায়। শিখরের নীচের তিনদিকের অংশে (দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব) উচ্চমানের নক্‌শাকাজের মধ্যে পোড়ামাটির ফুল, লতাপাতা গাছের সূক্ষ্ম নক্‌শা তখনও বেশ অক্ষত ছিল। কার্ণিশের নীচে ও থামের ওপরের প্রস্থের কিছু কিছু অংশে পোড়ামাটির খুব ছোট ছোট মনুষ্য বা দেবমূর্তি (সম্ভবত রাধাকৃষ্ণ বা গোপী) জোড়ায় জোড়ায় ছিল। কয়েকটি স্থানে যুগল রাধাকৃষ্ণমূর্তি (খুবই ছোট) সন্নিবেশিত ছিল। তবে মূর্তির তুলনায় ফুল, লতাপাতার নক্‌শা বেশি ও সুন্দর। পাতলা ও উৎকৃষ্ট ইঁট, ইঁটের ওপর সূক্ষ্ম ও উচ্চমানের নকাশি কাজ এবং সর্বোপরি বড় বা স্পষ্ট মনুষ্য বা দেবমূর্তির অভাব এই দুটি মন্দিরে যতটা চোখে পড়ে, বৈঁচিগ্রামের অন্য কোন মন্দিরে তেমন চোখে পড়ে না। যদিও পরবর্তীকালে নির্মিত এখানের কয়েকটি 'টেরাকোটা'-মন্দিরে প্রচুর পোড়ামাটিমূর্তির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ কয়েকটি মন্দির এখানে উল্লেখ্য ঃ (১) পূর্বপাড়ায় তাম্বুলীজাতীয় সেনেদের প্রতিষ্ঠিত শিবের (পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭১৫ খ্রীঃ), (২) চন্দ্রদের (গন্ধবণিক) তিনটি 'আটচালা', (৩) 'পাঁচমন্দিরতলা'য় নকুলেশ্বরের 'আটচালা' (১৭০৯?), (৪) বুড়োশিবতলায় বুড়োশিবের পরিত্যক্ত 'আটচালা' (১৭২৭), (৫) বারোয়ারীতলায় শিবের 'আটচালা'— এখানে টেরাকোটার মধ্যে একটি 'রাসমণ্ডলচক্র' ও মহিষমর্দিনী দুর্গার সুন্দর একটি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলি সবই প্রায় একই ধাঁচের —'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলি ছোট্ট ছোট্ট টালিতে উৎকীর্ণ, টালির চারপাশ নকশা করা, দেবদেবীর মূর্তিগুলি একই ভঙ্গীর, ফুল-লতাপাতার নকশাগুলিও প্রায় একরকমের। মন্দিরগুলির প্রায় সবই অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত।

গোকর্ণের নরসিংহের 'চারচালা' মন্দিরের (১৫৯০খ্রীঃ) মূর্তি থাকলেও নকশার প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো।[৭৯] ইঁটের ওপর খোদাই করা সুন্দর সুন্দর 'বাতিদান', জড়ানো লতায় সুন্দর সুন্দর ফুল, একটি অপরূপ চতুর্ভুজা মহিষাসুরমর্দিনী ও গরুড়বাহন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য অলংকরণ। বৈদ্যপুরে কৃষ্ণের দেউল মন্দিরের (১৫৯৮খ্রীঃ) জগমোহনের সামনে মূর্তির থেকে নক্‌শার প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়।[৮০] কয়েকটি ফলকে মূর্তিগুলি বাস-রিলিফে (Bas-relief) অগভীরভাবে উৎকীর্ণ। ফুল লতাপাতার নক্‌শার যে সূক্ষ্ম কাজ আছে, তার সঙ্গে প্রাচীন মসজিদগুলির নক্‌শাকাজের সাদৃশ্য আছে। এছাড়া ঐ সময়ে বা আরও কিছু পরে কোন কোন মন্দিরে মূর্তির থেকে নক্‌শারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে; যেমন, কোদলা মঠ (খুলনা, বাংলাদেশ, আঃ ১৭শ শতক)। অবশ্য, এরও কিছু আগে 'পরিণত আলঙ্কারিক নক্‌শা' কৃষ্ণলীলা, সামাজিক দৃশ্যাবলী ও দেবমূর্তির সমাবেশ ময়ূরভঞ্জের হরিপুরগড়ে আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত রসিকরায়ের মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে।[৮১] বিষ্ণুপুরে বীরহাম্বির-প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমিত বিশাল রাসমঞ্চটিতে 'বাস-রিলিফে' অগভীরভাবে খোদিত অল্পস্বল্প কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই নবপর্যায়ের পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জায় টেরাকোটা বা

প্রস্তরমূর্তিফলক প্রচুর পরিমাণে স্থান পেতে থাকে। যেহেতু পাথর বাংলাদেশে সহজলভ্য ছিল না, সেইহেতু ইঁটের মন্দিরই অধিকসংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা' মূর্তিফলকের প্রাধান্যও সেই একই কারণে। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের ইঁটের তৈরি মসজিদগুলিতে পোড়ামাটির ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্‌শা দিয়ে শেষমধ্যযুগে 'টেরাকোটা'-অলংকরণের যে সূচনা হোল, মন্দিরগুলিতে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত টেরাকোটামূর্তি-অলংকরণের প্রাচুর্য এই শিল্পের শেষ পর্যায় ঘোষিত করল, যদিও শিল্পসৌকর্য ও উৎকর্ষ আঠার-উনিশ শতকে অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বহু মন্দিরে ছাঁচে তৈরি টেরাকোটা-ফলকই বেশি তৈরি হয়। এর দুটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়- ছোট্ট ছোট্ট আকারের একশ্রেণীর ফলকে মূর্তি বা নক্‌শা অগভীরভাবে ঢালাই করা হলেও সূক্ষ্ম কলাকৌশল, অঙ্গসৌষ্ঠব, পার্শ্বচিত্রের মধ্যে শিল্পরূপের উৎকর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে। ছাঁচ ছাড়া অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো ফলকে বড়ো বড়ো মূর্তি তৈরি ক'রে সেগুলি হাত ও যন্ত্রের সাহায্যে ফলকে গভীর ভাবে খোদাই ক'রে রূপ দেওয়া হোত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ফলকগুলি সতেরো শতকে তৈরি মন্দিরগুলিতে বেশি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, অঞ্চলভেদে এর কিছুটা রূপান্তরকরণও যে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩ খ্রীঃ) ও কেষ্ট রায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দিরের (১৬৫৫খ্রীঃ) উৎকৃষ্টমানের 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলি বেশ কিছু ছাঁচে তৈরি হলেও সেগুলিকে হাত বা যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টতা আনার জন্য কেটে গভীর করা হয়েছে। মদনমোহনের 'একরত্ন'মন্দিরের (১৬৯৪খ্রীঃ) 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির বেশির ভাগ কিছুটা অগভীরভাবে খোদিত, কিন্তু ফলকের চারপাশ সুন্দর নকশা করা। এই মন্দিরের 'টেরাকোটা'-ফলকগুলি একটি বিশেষ শৈলীর সৃষ্টি করেছিল। পার্শ্ববর্তী কোন কোন জেলায়, যেমন, মেদিনীপুর , হুগলির অনেক মন্দিরে এখানকার ফলকগুলি আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া, শ্যামরায়-মন্দিরের সুদৃশ্য 'রাসমণ্ডলচক্র'ও বাংলার বহু মন্দিরের অলংকরণে আদর্শরূপে গৃহীত হয়। উক্ত তিনটি মন্দিরের 'টেরাকোটা'-অলংকরণের যে একটি নতুন শৈলীর উদ্ভব হয়, বাংলার পরবর্তী কালের বহু মন্দিরে তা অনুসৃত হতে থাকে। বস্তুতপক্ষে, বিষ্ণুপুরের 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলি বিভিন্নস্থানের মন্দিরগাত্রের অলংকরণের আদর্শরূপে স্বীকৃত হয়। এমনকি, 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলির মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের যে সব কাহিনী, পৌরাণিক দেবদেবীলীলা, কৃষ্ণলীলা এবং অন্যান্য সামাজিক দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছিল, বাংলার পরবর্তীকালের প্রায় সব 'টেরাকোটা'মূর্তি-অলংকৃত মন্দিরে তার কিছু না কিছু লক্ষ্য করা যায়।

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ থেকে মন্দিরদেওয়ালে শুধুমাত্র ফুল, লতাপাতার নক্‌শার বদলে মূর্তিসমাবেশের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এইসময়ে হিন্দু আমলের বিষ্ণু, সূর্য, দুর্গা বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবীর মন্দিরের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্মিত হ'তে থাকে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের ফলে বাঙালিমানসে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীচৈতন্যের নব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাঙালির মনকে ভক্তির ভাবরসে অভিষিঞ্চিত করল, রাধাকৃষ্ণের লীলাগীতি জনপ্রিয়তা লাভ করল। সেই সঙ্গে রামায়ণী কথা, কথকতা, মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক দেবদেবীদের গীতিগাথা বাঙালিচিত্তে সংঘটিত করল এক অভূতপূর্ব ভাববিপ্লব। কথকতা, যাত্রাগান-পালা, লৌকিক দেবদেবী যেমন, মঙ্গলচণ্ডী, শিবের লীলাগানযাত্রা ও পালাগানের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করল। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমাহাত্ম্য, ধনপতি-শ্রীমন্তসদাগরের উপাখ্যান, মনসামঙ্গলের কাহিনী, শিবের লৌকিক উপাখ্যান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সাহিত্যে উপস্থিত হোল এক নতুন ভাববন্যা। শুধুমাত্র

প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের দার্শনিক তত্ত্ব বা পুরাণের বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যশ্রবণে বাঙালি এখন আর তৃপ্ত হতে পারল না। তাই উক্ত গীতিগাথাগুলি তার মনকে দারুণভাবে নাড়া দিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ) ফলে বাঙালির পুনর্জাগরণ হোল — সাহিত্যে, ধর্মে, শিল্প-সংস্কৃতিতে। মন্দিরে মন্দিরে যেমন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেই সঙ্গে মন্দিরের গাত্রালংকরণে 'টেরাকোটা'-মূর্তির প্রচুর সমাবেশ হতে থাকল। রাধাকৃষ্ণলীলা, রামলীলা, দশাবতার, মহিষাসুরমর্দিনী, রামরাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ যেমন সামনের ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থগুলিতে স্থান পেল, তেমনি লৌকিক চণ্ডীর উপাখ্যানের মধ্যে 'কমলেকামিনী'-মোটিফ, লৌকিক শিব-উপাখ্যানের মধ্যে শিববিবাহ এবং সেইসঙ্গে ঈশ্বরাবতার শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিহ্বল সংকীর্তনদৃশ্য 'টেরাকোটা'-ফলকে শিল্পীরা মূর্ত করে তুললেন। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য ও পার্ষদগণের সঙ্গে হরিনাম-সংকীর্তনদৃশ্য অসংখ্য 'টেরাকোটা' ফলকে রূপায়িত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য অবতাররূপে গৃহীত হওয়ায় দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের পরিবর্তে তাঁকে অনেকসময় অবতাররূপে মূর্ত ক'রে তোলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধাবতারে জগন্নাথকেও দেখানো হয়েছে। লৌকিক চণ্ডী উপাখ্যান এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মঙ্গলকাব্যের কথকতা ও পালাগানের মধ্য দিয়ে যে, 'টেরাকোটা'-শিল্পীরা ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রাপথে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় 'কমলে-কামিনী' দৃশ্যকে বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে সন্নিবেশিত করেছেন। সিংহলরাজ শালবানের আদেশে মশানে শ্রীমন্তকে হত্যা করার পূর্ব মুহূর্তে জরতীবেশিনী চণ্ডীর আবির্ভাবদৃশ্যও রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু- উপাখ্যানের গোধিকাবেশিনী চণ্ডীরও কিছু কিছু চিত্র 'টেরাকোটা'-ফলকে উপস্থিত হয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী বা 'চণ্ডীমঙ্গলে'র অন্যান্য কবিদের কাব্য, কথকতা ও পালাগানের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হওয়ায় এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা যে কতটা ছিল, তা বোঝা যায় 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির মধ্যে। সে তুলনায় মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর কথকতা বা পালাগান অল্পস্বল্প প্রচলিত থাকলেও 'টেরাকোটা'-ফলকে তা স্থান ক'রে নিতে পারে নি। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীচিত্র পশ্চিম বাংলার প্রায়-'টেরাকোটা'-মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে।

ষোল শতকের গোড়ায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে 'পৌরাণিক নবজাগরণে' (Puranic renaissance) বাংলার মন্দির-'টেরাকোটা'-শিল্পে মূর্তিসমাবেশের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেল। বৈষ্ণবধর্ম উচ্চ-নীচ জাতির মধ্যে ভেদাভেদ দূর ক'রে এক সমন্বয়বাদী ধর্মের সূচনা করল। আচণ্ডাল দ্বিজ বৈষ্ণবধর্মের প্রবল ভক্তিভাবে আপ্লুত হোল। ধর্মে ধর্মে বিরোধ ও জাতিবর্ণের ভেদ দূরীভূত হওয়ার ফলে মন্দির-টেরাকোটাশিল্পে এক নবপ্রাণের সঞ্চার হোল। শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মে ধর্মে যে বিভেদ-কলহ ছিল, হিন্দু-ইসলামের মধ্যে বিপরীতমুখী সংঘাত ছিল, তা অপগত হওয়ার ফলে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে কোন বাধা রইল না। মন্দির 'টেরাকোটা'-অলংকরণে এই সমন্বয়ধর্মী ভাবটি যেন আরও বেশি ক'রে লক্ষ্য করি। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব— সর্ব ধর্মের দেবদেবীর মূর্তিই মন্দিরগাত্র-অলংকরণে শিল্পীরা সন্নিবেশিত করেছেন। বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ মূর্তির কাছে বা পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই চতুর্ভুজা কালী, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গার মূর্তি, শাক্ত দেবীর সম্মুখে বলিদানের জন্য ছাগ। এছাড়া, একদিকে যেমন কৃষ্ণলীলা, রামলীলার দৃশ্য, অন্যদিকে, দেবী চণ্ডী বা দশভুজার আবির্ভাব অসুরনিধনের জন্য। তিলন্তপাড়ার (সবং, মেদিনীপুর) জানকীবল্লভের মন্দিরের (১৮১১) একদিকের পুরো দেওয়ালে মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর প্রধান প্রধান দৃশ্যের চিত্ররূপ পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে প্রায় সব 'টেরাকোটা'-মন্দিরে মূর্তিফলক-সন্নিবেশের একটি নিয়ম বা প্রথা চলিত হয়। বেশিরভাগ মন্দিরের সামনের অংশ (ফ্যাসাড) মূর্তি বা নকশা-ফলকে সজ্জিত করা হোত। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই দিক অলংকৃত হোত দু'একটি মূর্তি এবং কয়েকটি ফুল বা ফুলকারি নক্‌শায়। চারদিকের বাইরের দেওয়ালে মূর্তিসমাবেশ খুবই বিরল। আবার, বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির বাহির ও ভিতরের সব স্থানেই 'টেরাকোটা'-ফলক সন্নিবেশিত হয়েছে, বিশেষ ক'রে শ্যামরায় ও জোড়বাংলামন্দিরে। এ-ধরণেব 'টেরাকোটা'-সজ্জার সমারোহ আর কোথাও পাওয়া যায় না। দিনাজপুরের (বাংলাদেশ) পূর্বোক্ত কান্তনাথের মন্দিরেও প্রচুর 'টেরাকোটা'-মূর্তিসমারোহ আছে জানা যায়। কোন কোন মন্দিরের দ্বিতলের বাইরের দেওয়ালেও মূর্তিসন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায় (যেমন, বাগরুই-এর লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' ও বাদাড়ের জগন্নাথের 'নবরত্ন', কেশপুর, মেদিনীপুর)। 'টেরাকোটা'-ফলকগুলিকে বসানোর জন্য কার্ণিশের নীচে সমান্তরাল এক বা দুই সারিতে কতগুলি ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গি তৈরি করা হোত এবং দেওয়ালের বাম ও ডানদিকে দু'পাশে প্রলম্বিত ঐ একই কুলুঙ্গী থাকত। বহু মন্দির লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে কুলুঙ্গীতে কোন ফলকই বসানো হয় নি, সেগুলি শূন্যই থেকে গেছে। ঐসব কুলুঙ্গী বা খোপে সাধারণত পৌরাণিক দেবদেবী মূর্তি, যেমন, দশাবতার, মহিষমর্দিনী, সাধুসন্তের মূর্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে 'মিথুনদৃশ্য' স্থান পেত। কিন্তু প্রধান আকর্যণীয় ছিল সামনে 'খিলান' প্রবেশপথের (বহুক্ষেত্রে 'ত্রিখিলান প্রবেশপথ') ওপরের প্রস্থে নানা দৃশ্য-যেগুলি মুখ্যত ছিল রামায়ণের কোন কাহিনীচিত্র, কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে মহাভারতের যুদ্ধদৃশ্য অথবা বৈষ্ণবসংকীর্তনদৃশ্য। রামায়ণের 'লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য' ওপরের একটি প্রস্থে রূপায়িত করা প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়, প্রায় সব মন্দিরেই এই দৃশ্যটি উপস্থিত। রথারূঢ় পরস্পর মুখোমুখী রাম ও রাবণ এবং পাশে ও নীচে বানর ও রাক্ষসসেনার পরস্পর যুদ্ধ- কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব 'দেবীভাগবতে'র অকালবোধনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরে তিনটি প্রস্থ থাকলে মাঝখানের প্রস্থে এই দৃশ্যটি স্থাপন করা প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশের কোন প্রস্থে কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালীয়দমন, গোপীদের বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস প্রভৃতি 'মোটিফ' খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি মন্দিরেই কৃষ্ণলীলার এই দৃশ্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের আর একটি 'মোটিফ' জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেটি হোল, রামসীতার সিংহাসন-আরোহণ বা 'রামরাজা'। এছাড়া, পৌরাণিক বা লৌকিক শিবকাহিনীর মধ্যে শিবের বিবাহদৃশ্যও বহু মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়। প্রায় প্রতিটি 'টেরাকোটা'-মন্দিরে মহিষাসুরমর্দিনী এককভাবে বা কার্ত্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতী সহ উপস্থিত। এই ওপরের প্রস্থে বহু ক্ষেত্রে 'কমলেকামিনী'দৃশ্য লৌকিক কাহিনীর একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়। বহু মন্দিরের সামনের একটি প্রস্থে বা সামনের অন্য কোন স্থানে এটি লক্ষ্য করা যায়। এই দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, সিংহলের যাত্রাপথে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর আসীনা দেবী কমলেকামিনী (চণ্ডী) যিনি গণেশকে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে 'গণেশজননী'রূপে প্রসিদ্ধা। তাঁর দুইপাশে নৌযানে সমাসীন ধনপতি ও শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি, অবাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত মূর্তি দর্শন করছেন। এগুলি ছাড়া সামনের প্রবেশপথের স্তম্ভের কোন কোন স্থনে 'টেরাকোটা'-ফলক বসানো হোত। এগুলি ছিল মুখ্যত দেবদেবী ও সাধুসন্তের মূর্তি বা কিছু ফুল। নীচের দিকে ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালে সমান্তরালভাবে যেসব ফলক স্থাপন করা হোত, সেগুলি ছিল জীবজন্তুর মূর্তি, জমিদার বা রাজার বন্যজন্তু-শিকার বা 'ঝাম্পানে' অন্যত্র গমন, যুদ্ধের জন্য সেনাদের কুচকাওয়াজ, বৃহৎ নৌযানে জলদস্যুদের যাত্রা—বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র নৌযান বা

জাহাজ, এমনকি, দেশী ময়ূরপঙ্খী নৌকা বা পানসি সেকালের নৌযানের পরিচায়ক। এছাড়া, সমকালীন সামাজিক দৃশ্যপটের মধ্যে অপরাধীকে হিংস্র শ্বাপদের মুখে নিঃক্ষেপ, চড়কদৃশ্য, গ্রাম্য কন্যা বা বধূর শিবপূজা, উটের ওপর আরোহী, অশ্বারোহী সেনা, রাজ-অন্তঃপুর, ধনী বা জমিদারের 'ফরসিবিলাস', বাঁদরনাচ বা ভল্লুকনাচ, বাজিকর, মিথুনদৃশ্য প্রভৃতি অসংখ্য দৃশ্যপট উপস্থিত, যা সেকালের সমাজচিত্রকে উপস্থিত করে। প্রায় সব মন্দিরেই এই দৃশ্যগুলি নীচের দিকে স্থাপন করা হোত। আঠারো-উনিশ শতকের বহু মন্দিরে সাহেবদের কিছু কিছু দৃশ্যপট লক্ষ্য করার মতো-এদের মধ্যে গোরাসৈন্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা স্থানীয় শাসনকর্তার চিত্রও উপস্থিত। সতেরো শতকে নির্মিত অনেক মন্দিরে মুঘল বা পাঠান সেনার মূর্তি 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে, আর রয়েছে বিচিত্র নৌযানে হার্মাদ জলদস্যুরা, নিরীহ বন্দীকে যারা ওপর থেকে সমুদ্রে হিংস্র জলজন্তুর মুখে নিঃক্ষেপ ক'রত-তাদের সেই নিষ্ঠুর কর্মের দৃশ্য। 'টেরাকোটা'-ফলকে তা খুবই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সমাজজীবনের বিচিত্র ছবি অসংখ্য টেরাকোটা-ফলকে ধরা পড়েছে।

মন্দিরের ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালের নিম্নভাগ থেকে ওপরে ছাদের কার্ণিশের নিম্নদেশ পর্যন্ত মূর্তিফলক-সংস্থাপনের পূর্বোক্ত রীতি বিভিন্ন সময়ে নির্মিত প্রায় সব মন্দিরেই অনুসৃত হয়েছিল। টেরাকোটার বিষয়বস্তু বা তার সন্নিবেশরীতি এক হলেও স্থানিক ও কালিক পর্যায়ে রচনাশৈলীর ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কালিক পর্যায়ে একথা বলা যায় যে, ষোল বা সতেরো শতকের মূর্তিফলকগুলির কারুকার্য, গঠন ও ভঙ্গিমায় আঠারো ও উনিশ শতক অপেক্ষা সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস বিস্ময়করভাবে উপস্থিত। আঠারো শতক থেকে মূর্তির গঠনে কিছুটা স্থূলতার আভাস পাওয়া যেতে থাকে এবং মূর্তির দেহসৌষ্ঠব ও পোষাক-আশাকে রেখাবিন্যাস দেখা যেতে থাকে। উনিশ শতকে মূর্তিগুলি আরও স্থূলাকার হ'তে দেখা যায়, কিন্তু শিল্পোৎকর্ষ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। আবার বিভিন্ন অঞ্চলে 'টেরাকোটা'-শৈলীর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। একই শিল্পীগোষ্ঠীর তৈরি 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।

বাংলার আঞ্চলিক মন্দিরস্থাপত্য ও টেরাকোটা শিল্পের এক বিস্ময়কর যুগের অবসান হোল বিংশ শতকের শুরু থেকে। নব উদ্ভাবনী শক্তি ও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মন্দির স্থপতিরা তাঁদের ঐতিহ্যপূর্ণ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হলেন। ফলে, এরও পরে যে অল্পকিছু মন্দির ও টেরাকোটা নির্মিত হোল, সেগুলি হোল নিম্নমানের। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রকৃত শিল্পীর এখনও অভাব ঘটেনি। তার সাক্ষ্য মিলবে সম্প্রতিকালেও বিভিন্ন কার্যালয়, স্টেশন ও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ তোরণে সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা' ফলকের সন্নিবেশ। তাই এই শিল্পের মৃত্যু নেই।

তথ্যসূত্র

১ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী সংস্করণ, ১৯৯০,পৃ.৭

২ Saraswati, S.K Temples of Bengal (*Journal of the Indian Society of Oriental Art* (*JISOA*), 1934, pp.136-140

Majumder, N.G. . Inscriptions of Bengal, Vol III, pp.48-49.

৩ সমরাঙ্গণসূত্রধার : উদ্ধৃতি : গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ ৩২, পৃ.১২৫

'পুণ্ড্রবর্ধনকং ক্রমঃ প্রাসাদং বল্লভং হরেঃ।

ভ্রময়েন্ মূলসীমাস্পৃক্ বৃত্তমাদৌ সমন্ততঃ।।

তচ্চালকর্ণসংযুক্তং কর্তব্যং সর্বতোদৃশম্।'

এবং Dinajpur Pillar Inscription (*J R.A.S B, Vol VII*, 1911,pp 615-619)

৪ Saraswati, S.K. op cit, pp 136-140

৫ Watters . *Yuan Chwang , Vol II* pp. 184-185, 187, 190, 191
Ref. to Saraswati, op.cit

৬ মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার : গৌড়লেখমালা, পৃ. ৯৭ Ref to Saraswati ,op cit.

৭ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, মহামহোপাধ্যায়(সং) : রামচরিতম্ of Sandhyakarnandin (*M A S.B. Vol III*, Chapter III, V. 9, p 63, 146

৮ সন্ধ্যাকরনন্দী ঃ 'রামচরিতম্' (৩.৩১) শ্লোক ঃ

'দধতীং রত্নানাং পটলং পৃথুলং কামিতাং সুরেশ্বরপুরীম্।

রামাবতীমতিশুভাং স বিভীষণশাসনামৃতস্নাতাম্।

পুণ্যজনানাং বসতিমসাধুব্যবহারসঙ্কথাশূন্যাম্।

সংকথাবিপুলমানবাভয়দামুদ্রগ্রদেবকুলজাতাম্।।'

৯ *Progress Report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy*, Southern Circle, 1914-15, p 90

১০ মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ ও রায়, প্রণব : '৩৬৮ অব্দের নব আবিষ্কৃত খণ্ডিত মাধবপুর শিলালেখ', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ৯৫ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা পৃ.৯১-৯৫, Mukherjee, B N and Ray, P 'Madhavpur Fragmentary Inscription of the year 368', *Indian Museum Bulletin*, Catcutta, 1991, Vol. XXVI, pp. 42-45.

১১ Michell, George : *The Hindu Temple*,1977,London,pp 104-105

১২ ঐ ঐ, পৃ. ৯৬ উদ্ধৃতি "Doubtless the fifth and the sixth centuries witnessed the emergence of a superstructure rising from the walls of the sanctuary as a distinct characteristic of the northern style".(p-96)

১৩ Brown, Percy · *Indian Architecture* (*Buddhist and Hindu*), *Vol I*, 1971 edition. p 149-50

১৪ ঐ , ঐ, পৃ. ১৪৯-১৫০,

উদ্ধৃতি : 'Locally known as the Begunnia group owing to a fancied resemblance to the fruit of the egg-plant (begun) they are probably of the Pala period and therefore of the 9th and 10th centuries '

১৫ Bose, Nirmal Kumar · *Canons of Orissan Architecture*, 1932, ১২০ পৃষ্ঠার পরবর্তী আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

১৬ Brown, Percy : পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৯-১৫০,

উদ্ধৃতি : ' . . but undoubtedly the most ornate,is the Siddheswara temple at Bahulara in the Bankura district of the 10th century. Built of brick enriched with terracotta reliefs carried over its entire surface,yet this profusion of pattern does not offend, it serves to emphasize its graceful lines. Numerous other temples of this order are to be found distributed throughout south-western Bengal and in the Manbhum district of Bihar, all apparently built while the Pala-dynasty was in power and therefore dating between the eighth and eleventh centuries' (pp. 150).

১৭ Bose, Nirmal Kumar : পূর্বোক্ত, ১২১ পৃষ্ঠার পূর্ববর্তী আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য

১৮ Mccutchion, David, J : *The Temples of Bankura District*,1972, পৃ.৩২ এর পর ৮ম চিত্র

১৯ Mccutchion, David, J : *Late Mediaeval Temples of Bengal*, 1972, Asiatic Society

' It is customary to associate these with the imposing Orissan tradition of which so much still remains, but it seems likely that Pre-Muslim Rekha deuls of Bengal were in a tradition coming down through Magadha, which was part of the same empire' (p.3)

২০ Brown, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২১ Brown, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

২২ Brown, *Indian Architecture* (*Islamic Period*) 1975, p 37

২৩ Brown, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫। দ্রষ্টব্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ', বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', তৃতীয় খন্ড, ১৯৮০, পৃ.৩৫১

২৪ Majumder, R.C , *History of Mediaeval Bengal*, 1974, p.42

উদ্ধৃতি : "Shamsuddin Yusuf Shah (1474-1481 A.D.), son of Ruknuddin Barbak Shah (1455-1474)–'It was during his rule that the Surya and Narayana temples of Pandua (Hooghly district) were converted into a mosque and a minar, respectively, and the huge image of the Sun-god was mutilated and utilised for a stone inscription on one face. The above-mentioned mosque of Pandua is now known as 'Bais Darwaza' and many stone pillars and relics of Hindu temples are to be found.' শাহ্ সুফীর দরগায় পূর্বোক্ত ভগ্ন সূর্যমূর্তির পিছনে আরবী লিপির পাঠোদ্ধারে জানা গেছে, 'বাইশ দরওয়াজা মসজিদ' ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। পাঠোদ্ধার ঠিক হলে মসজিদটি সুলতানী আমলের শেষদিকে তৈরী হয়। (দ্র. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য : বাংলার তীর্থ, পৃ. ৮৬-৮৭)

২৫ *Indian Archaeology*, 1963-64,

উদ্ধৃতি : 'The massive temple at Chandraketugarh had a large square sanctum cella with projections on three sides and a covered ambulatory passage The bigger square was preceded by a rectangular covered vestibule with a rectangular open porch in front, complete with a flight of steps. Around the larger square, the vestibule and the porch, was a rectangular structure with projections on three sides, corresponding to those of the inner square Rising from the same level as that of the main temple, its facade and the two sides upto the vestibule were decorated with shallow niches, possibly plastered with stucco, and embellished with rounded offsets and string course of dentils made of moulded bricks ' (P 64)

২৬ *History of Bengal, Vol I* (*Hindu Period*) 1971 ed. and *A S.I* 1934-35, P. 42

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি : 'The remains of the temple at Baigram (Dinajpur) identified with the temple of Sivanandi, mentioned in the copperplate grant dated 128 G.E. (447-448 A.D).

Originally it appears to have consisted of a square sanctum surrounded by a circumambulatory passage enclosed by a wall (A.S I. - 1934-35, p 42). There is only one entrance door-way towards the west. In plan it is identical with a particular group of Gupta temples, represented by a flat-roofed square shrine within an outer hall of circumambulation, but in the case of this contemporary Bengal example, the method followed in roofing the inner sanctum and the outer hall is not known ' (*ASI*, 1934-35, p. 42)

'At Baigram in the Dinajpur District the ruins have been exposed of a brick temple of an identical plan, but the method of roofing the sanctum and outer hall of circumambulation is not known According to copperplate inscription dated 128 G E. (447-448 A D) found at the site,the remains represent the temple of Lord Govindaswamin erected by one Sivanandin, for the maintenance of worship and repair of which some land was purchased and made over by Bhoyila and Bhaskara,the two sons of the builder'– S.K. Saraswati, Temple Architecture in the Gupta age' (*Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. VIII*, 1940 p. 146-159)

২৭ Brown, ' *Indian Architecture*(*Hindu and Buddhist Periods*) p.150

২৮ Banerjee,Adris : *Temples of Tripura Varanosi, 1968. Frontis piece.*

২৯ Bhattasali, N K. . *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*,p.123

Saraswati, S.K. : Temples of Bengal (*J.I S.O.A.*, *Vol II*, 1934 pp 136-140)

৩০ *History of Bengal, Vol. I* (*Hindu period*), 1971 ed pp.493-519

উদ্ধৃতি, 'The similarity with the temple carved in relief on the Ashrafpur votive stupa is striking, only the outline of the tiers in those late examples has grown curvilinear instead of the straight slope in the earlier form.The curvilinear form may be said to be an imitation of thatched huts in which the bamboos are lashed together at the apex . . . .'

৩১ Mccutchion, David J : *Late Mediaeval Temples of Bengal*, 1972 উদ্ধৃতি, ... 'a tall central char-chala with mud walls from which project verandah roofs at a lower level supported on bamboo poles-precisely what we find to be the principle of the large domestic atchala today; (p.6)

৩২ রায়, প্রণব : মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, পৃ.১৪০

৩৩ Saraswati, S K. · Temples of Bengal (*JISOA*, *Vol II*) উদ্ধৃতি, . . . 'thanks to the representations of similar terrace-roofed Sikhara-topped temples of miniature paintings and stone images of Bengal, it is now clear that the type was derived from Bengal, and it is the total disappearance of the proto-types in the land of its origin which is responsible for the conjectures that have hitherto prevailed.' (pp 136-137)

৩৪ ঘোষ, বিনয় : 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' ; ৩য় খন্ড, (১৯৮০) গ্রন্থে সরসীকুমার সরস্বতীর প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা', পৃ. ৩৩৬

৩৫ Brown, . op cit.(*Islamic period*,Taraporewala,ed ,1975) উদ্ধৃতি 'With the advent of the Mahammedans in India an era ends The old order passes And in no country was the movement of Islamization more epoch-making For, of the various civilizations with which Mohammedans came into contact in the course of their world conquest,none could have been more diametrically opposed to their ideals than that of the people of India' (p 1)

৩৬ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : প্রাগুক্ত, পৃ.৯

৩৭ Brown, op cit , pp 4-5, উদ্ধৃতি, 'The second of these styles, the Provincial refers to those modes of building practised in some of the more self contained portions of the country, usually after their governors had thrown off the allegiance to Delhi, when they proceeded to develop a form of architecture in accordance with their own individual ideals What may be termed the "pivotal year" of the movement was A D, 1400, when the central power at Delhi, has been taken by the invasion of Timur (Tamerlane) and its original prestige declined that date "

৩৮ Brown, op cit, p 38

'......... in the beginning of the fifteenth century an early example of what may be termed the regional Islamic style comes into view. This is a Mausoleum at Pandua known as the Eklakhi tomb, recorded to be that of Sultan Jalaluddin Mohammed Shah (A D.1414-31) and therefore dating from about A D.1425 It is a building which assumes importance for three reasons, firstly it is a structure for marked architectural character in itself, secondly it forms an evolutional landmark as it is the initial building of its kind and thirdly it is the proto-type of most of the subsequent Islamic architecuture of Bengal.

৩৯ Brown, op cit p.38

৪০ M Abid Ail Khan, Khan Sahib · *Memoirs of Gaur and Pandua*, Reprint,Govt of West Bengal,1986,p.64

৪১ Michell, George (ed.) Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion, Princeton University Press Edition,New Jersey,1983,p.6

উদ্ধৃতি : 'Only under the Muslim rulers does a distinctly regional style of architecture evolve for the first time The buildings erected by the Sultans combined traditional Islamic techniques (arches, vaults, domes) and types (mosques, tombs, forts) with local materials (brick and terracotta) and forms(hut). The credit for first translating the vernacular idiom in mud, bamboo and thatch into a monumental expression in brick belongs, therefore, to these rulers '

৪২ M Abid Ali Khan,Khan Sahib . op cit. p 51,

উদ্ধৃতি, F N.'It seems to the author that the building is of the time of the Hindu Kings (possibly Raja

Kans) and that it was used for a temple An arrangement for hanging a chain and bell by an iron hook in the central part of the ceiling is still visible and the building itself lies north to the south. There are door openings on three sides only. From all these facts, it may be concluded that a Hindu god was worshipped here.'

এই গ্রন্থে plate V দ্রষ্টব্য।

৪৩ op cit , F.N.,p 51

৪৪ Michell, George : op cit p 10,

উদ্ধৃতি 'Most popular deities in Bengal were worshipped in thatched huts in the villages. When worship of some of the deities came to be transformed into orthodox cults that incorporated the services of brahmins, their images were housed in brick temples that copied their original settings· in this way brick temples came to imitate vernacular forms

৪৫ Sanyal, Hites Ranjan : Religious Architecture in Bengal (15th–17th century) A study of the Major trends. *Journal of Indian Anthropological Society*, 5, 1970 p. 188

'By unifying Bengal permanently within definite limits, and by establishing a stable central authority, the independent Sultans gave a concrete and geographical shape to the regional identification of the people of Bengal and to their urge for unification '

৪৬ Brown, op cit., pp 1-2

৪৭ op. cit., P 45

৪৮ Das , Sudhir Ranjan · *Rajbadidanga . Chiruti , Jadupur* , The Asiatic Society, 1968, দ্র. plates XVII - XIX, দ্র. pp 38 - 39

৪৯ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার : বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১, আলোকচিত্র ২৬ ও ৫৫ . পৃ: ১২২-১২৩ ও ৭৮

৫০ Mccutchion, David · op. cit , plate 20

৫১ রায়, প্রণব : পূর্বোক্ত, ১৩ - সংখ্যক আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য

৫২ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, পৃ. ১১৮, ৫৪ - ৫৫

৫৩ Mccutchion, op. cit , P 8

৫৪ Mccutchion op cit., plate 54

৫৫ op cit.,plate 58

৫৬ Sanyal, Hites Ranjan . op. cit., p 196,

উদ্ধৃতি : ' Thus the Ratna-type of temple is a composite structure designed by combining the features of the folk chala architecture of Bengal with the traditional Sikhara type of temple. The combination was conceived on the lines suggested in the regional religious architecture of the Muslims in which a substructure resembling the chala hut both in plan and elevation was combined with the traditional dome to produce an integrated structure. Externally, the similarity is so close that the single - domed structures of the muslims may be taken to be the precursor of the Ratna type of temple The simplest form of the Ratna - type i.e the single Ratna temple differs from the single-domed structures of the regional style of the Muslims only in the shape of the surmounting element.

৫৭ Deva, Krishna . *Temples of North India*, National Book Trust , Second Edition, 1977, P 9 , plate I

৫৮ Michell, George · *The Hindu Temple* , London, 1977, p 80, ৩১ নং চিত্র ও চিত্রপরিচিতি - 'Ladkhan Temple, Aihole, seventh century. The sloping roofs reproduce in stone the forms of Thatch and Timber'.

৫৯ op. cit., P. 104, চিত্র ৪৬ , হুচ্ছাপ্পায্যা। 'Huchchappayya temple, Aihole, eighth century, showing a clear demarcation of sanctuary with supersturture, hall and porch.

৬০ Mccutchion, op. cit., চিত্র ৬০

৬১ Mccutchion : 'Pinnacled Temples of Bengal,' *Quest*, P. 44

উদ্ধৃতি: 'But there is a plausible case to be made out for deriving the 'Pancha-Ratna' design from the

early Hindu panchayatana layout of five temples, one in the centre and four at the corners of the common plinth

৬২ op. cit., P 44

৬৩ রায়, প্রণব : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪ - ৩৫, ৯৮ - ৯৯

৬৪ রায়, প্রণব : পূর্বোক্ত , পৃ. ১৩৬

৬৫ Deva, Krishna : op. cit , plate 1, Gupta temple, Sanchi

উদ্ধৃতি : 'The earliest group of Gupta temples, dating from 5th century and showing a single-celled sanctum with a shallow portico resting on 4 pillars in front, is represented by temple 17 at Sanchi (the site of the famous Buddhist stupa of the 2nd century B C.) . As suggested by the flat roof, square or rectangular form, the plain treatment of the walls and modestness of size, these temples, must obviously have been derived from rock-cut proto-types of which early Gupta examples occur at Udaygiri near Sanchi . . Temple 17 at Sanchi is a classic example of lucid diction, perfect articulation and restrained decoration' (P.9)

৬৬ Saraswati, S K · Temple Architecture in the Gupta Age (*J I S O A., Vol VII*, 1940, pp 146 - 159)

উদ্ধৃতি : The Durga and Hucchimalligudi temples at Aihole, each exhibits a tower on the top of the flat roof of the sanctum

৬৭ op cit

৬৮ Sanyal, Hitesh Ranjan 'Temple Promotion and Social Mobility' ('*History and Society*' - Essays in honour of Nihar Ranjan Ray, 1978, P. 345),

উদ্ধৃতি : '... .. the regional Bengali temples are actually a conglomeration of elements derived from two widely divergent sources, one indigenous and the other West Asian The indigenous sources may be divided into two categories The first category was the folk architecture of Bengal and the second category is the simplified version of the antiquated Sikhara which was also used in designing the superstructure of the Ratna temples The practice of assembling different features of plan, construction and outer form derived from these divergent sources had started at the initial stage of temple building in the second half of the 15th and the 16th century'

৬৯ Mccutchion, op. cit., plates 97,98,99,100,102,104,106

৭০ Sanyal, Hites Ranjan, op. cit , 347,

উদ্ধৃতি : ' The sharp increase in the participation of the people from the lower rungs of the society drastically changed the situation by divesting the upper caste landholders of their position of pre-eminence in the field of temple building . On the other hand, the consistently high rate of temple-building by the comparatively ordinary and socially handicapped people indicate that temple-building had become a part of a broad based social movement through which people from the lower strata of the society had been trying to move up to eminence and acquire social power'

৭১ Sanyal, op cit., pp 358 and 363, Table 2&3

৭২ Ahmed, Nazimuddin . 'Epic Stories in Terracotta Depicted on Kantanagar Temples, Bangla Desh', The University Press Limited, Dacca, 1990, P 21,

উদ্ধৃতি : সংস্কৃত লিপি ঃ শ্রীশ্রীকাণ্ড ঃ

৭ শাকে বেদাব্ধিকালক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ

প্রাসাদঞ্চাতিরম্যসুরচিতনবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্যীৎ।

রুক্মিণ্যাঃ কান্তুতুষ্টৈ সমুদিতমনসা রামনাথেন রাজ্ঞা

দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজনগরে তাতসংকল্পসিদ্ধৌ।।'

৭৩ Majumder, R C · *History of Ancient Bengal*, chap XV, 1971, pp 628-629

উদ্ধৃতি : '........The lower part of the basement wall of this temple is decorated with sixty three stone sculptures in a fair state of preservation .... . In the first place, there is a great variation among these sculptures in regared to artistic style. Some of them follow the Gupta tradition of 'eastern version' . ..

but many others, forming a majority of the group, show, according to K.N. Dikshit, S.K. Saraswati and others. 'distinct original tendency in which one may recognise the beginnings of the Bengal School' (Saraswati Sculpture, pp 35-36).

৭৪ Saraswati, S K · *Hist. of Bengal* (ed), *Sculpture*, pp 45-47 of Majumder, R.C *History of Ancient Bengal*, pp. 633-634

উদ্ধৃতি, : '. .. the three groups which belonged to different periods of time and represent more or less gradual evolution of this Bengal school of art, may be referred, respectively, to the sixth, seventh and eighth century, though it is regarded as possible that both the first and the second groups belong to the seventh century He (Saraswati) further suggests that while the first two groups show respectively pure and subdued Gupta plastic traits, the third group represents a genuine and undiluted indigenous tradition '

৭৫ Saraswati . op. cit , pp 41-42

উদ্ধৃতি, 'The figures are exceptionally heavy with neither the proportion nor the definition of form . the execution and modelling are coarse and crude in the extreme '

৭৬ Majumder. R C op. cit , pp 634-636

উদ্ধৃতি, ' the local traditions and ideas gradually began to assert themselves from the end of the seventh or beginning of the eighth century A D

These ultimately led to the evolution of a regional school of sculpture with its own distinctive and characteristic features, which may be truly called the Bengal school of sculpture This art flourished from the eighth to the end of the Hindu rule at the beginning of the thirteenth century A D. covering the periods of Pala and Sena rule in Bengal '

৭৭ ম্যাক্‌কাচ্চন, ডেভিড্ ঃ 'বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ', পশ্চিমবঙ্গ, ৭ই জুলাই ১৯৭২ , পৃ. ৬৮২ ('সাহিত্যপত্রে' ১৩৭৭ , আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত এবং ' পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় সংক্ষেপে পুনর্মুদ্রিত)।

৭৮ Haque, Julekha *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bengal Portrayal of a Society*,The Asiatic Society of Bangla Desh, 1980, p 17

উদ্ধৃতি : ' The popular and humane character of the art of this phase arouses in an observer curiosity as surprise, when he remembers that art in other phases and periods in India has usually been the product of the court and the religious cult The art of the people, representing their common society has not usually been given such prominence on monuments whose construction was controlled by the gentry and hieratic religious orders But despite this patronage, the use of terracotta art in adorning architectural buildings seems to have undergone a total eclipse in Bengal after the Palas, possibly under the pressure of hieratic art of succeeding periods

৭৯ Michell, George (ed). *Brick Temples of Bengal* (1983), plates 494 -497

৮০ op cit , plates 322-326

৮১ ম্যাক্‌কাচ্চন, ডেভিড ঃ পূর্বোক্ত, পৃ.৬৮৩

৬
বাংলার মন্দির : শেষ মধ্যযুগ

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাক্-মুসলিম যুগে, বিশেষ করে, পাল-সেন আমলে যে বহু মন্দির তৈরি হয়েছিল, সুলতানী আমলের প্রথম দুই শতকের মধ্যে তার প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ-মধ্যযুগে (সুলতানী আমলের শেষ দিককে আমরা 'শেষ মধ্যযুগ' বলতে পারি) অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু আগে থেকে (খ্রীঃ পনের শতক থেকে) বাংলার নানা স্থানে যে অসংখ্য মন্দির তৈরি হতে থাকে (বেশির ভাগই ইঁটের), সেগুলির স্থাপত্যবৈচিত্র্য ও ' টেরাকোটা'-অলংকরণ বাঙালির স্থাপত্য ও শিল্পচর্চায় তার মহান্ উত্তরসূরীরূপে উপস্থিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসেবে মন্দিরগুলি তৈরি হয়নি, এগুলি ছিল দক্ষ শিল্পীদের শিল্পচর্চার সার্থক উদাহরণ। যুগ যুগ ধরে পল্লী ও শহর-বাংলার আনাচে-কানাচে, নদীর ধারে কত বিচিত্র শ্রেণীর মন্দিরের জন্ম হোল এবং বহু মন্দিরের দেওয়াল 'টেরাকোটা'য় সজ্জিত হোল, সেগুলির সঠিক সংখ্যা আজও নিরূপিত হয় নি। কালের প্রকোপে অজস্র মন্দির-দেবসৌধ অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও এখনও যা আছে, জেলায় জেলায় সমীক্ষা করে তার চোখধাঁধানো সংখ্যা আমাদের বিস্ময়ান্বিত ক'রে।

পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশে শেষ- মধ্যযুগের এই মন্দিরগুলিকে প্রধানত পূর্ব আলোচিত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— 'চালা', 'রত্ন', 'দেউল' এবং 'চাঁদনি-দালান'। চালার মধ্যে একটিমাত্র চালযুক্তকে 'একচাল' বা 'একচালা', দুটি চাল বা 'দোচালা' যাকে 'একবাংলা'ও বলা হয়, আবার দুটি দোচালাকে সামনে-পিছনে যুক্ত ক'রে হয় 'জোড়বাংলা' (বিষ্ণুপুরে কেষ্টরায়ের বিখ্যাত 'জোড়বাংলা')। এর পর চারদিকে চারটি চাল নিয়ে 'চারচালা'। ' চারচালার' ওপর আরও চারটি চাল বসিয়ে 'আটচালা' এবং তার ওপর আরও ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা' বসিয়ে 'বারচালা' পর্যন্ত মন্দির দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, 'চালা'-মন্দিরের ধারণাটা এসেছিল বাঙালির অতি পরিচিত খড়ের চালা ঘর থেকে। শহরে এই চালা বিরল হয়ে গেলেও গ্রামাঞ্চলে সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। 'চালা'-মন্দিরের সঙ্গে 'চাঁদনি' ও 'দালান'-শৈলীর কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও 'চাঁদনি' ও 'দালানের' ছাদ সমতল , কিন্তু চালার চাল ঢালু। কার্নিশ পূর্বোক্তের ক্ষেত্রে বেশির ভাগেরই বাঁকানো হওয়ার বদলে সোজা ভাবটিই লক্ষ্য করা যায়। চাঁদনির থেকে দালানের পার্থক্য স্পষ্ট, আয়তনের দিক থেকে। আকার এক হলেও আয়তন হয়েছে বিশাল ও অনেকগুলি প্রবেশপথ। কলকাতা ও গ্রামাঞ্চলের দুর্গাদালানগুলি লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে 'চাঁদনি' থেকে গেছে মাত্র এক থেকে দুটি প্রবেশপথ নিয়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে, চালা, চাঁদনি ও দালানের মধ্যে সরল সাদামাটা স্থাপত্যচিন্তাই বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য; সুপ্রাচীন কাল থেকে এই রীতির বাসগৃহ তৈরি হয়ে এসেছে। চৈতন্যাবির্ভাবের বেশ কিছুকাল আগে থেকে মন্দিরে এই রীতির প্রয়োগ দেখা দিল, যা একান্তই হয়ে উঠল এক নতুন স্থাপত্যচিন্তার ফসল। গৌড়ে (মালদহ) 'কদমরসুলে'র কাছাকাছি 'দোচালা' সৌধটি সর্বপ্রাচীন 'চালা'-শৈলীর হিন্দুমন্দির ছিল বলে মনে করা যায়। পরবর্তীকালে এটি ফৎ খাঁনের সমাধিতে পরিণত হয় (১৬৫৭ খ্রী.)। কিন্তু এটি রাজা কংসের সময় (১৪১২-১৪১৫ খ্রী.) একটি হিন্দুমন্দির ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ এম. আবিদ আলি খান, মেমোয়ার্স অফ্ গৌড় অ্যাণ্ড পাণ্ডুয়া, রিপ্রিন্ট, প: ব: সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ৫৯)। 'চারচালা'-মন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়া যায়

ঘাটাল শহরের কোন্নগর পল্লীতে— কর্মকারদের সিংহবাহিনীর 'চারচালা' ও তৎসংলগ্ন চারচালা 'জগমোহন' (প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৯০ খ্রী:)। উল্লেখ্য, এগুলি নেহাতই সাদামাটা মন্দির। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা, 'টেরাকোটা'-অলংকরণের উল্লেখযোগ্য কারুকার্য কোন কিছুই এগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থাপত্যকৌশলে নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের গঠনে। বিশেষ করে, ভেতরের ছাদে গোলাকার গম্বুজ বা ভল্টের প্রয়োগে।

বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় 'রত্ন'- শৈলীর মধ্যে। মধ্যযুগীয় মন্দিরস্থাপত্যের চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এই শৈলীর মধ্যে। নীচে চালা, চাঁদনি বা দালানের ছাদে ছোট আকারের দেউলকে চূড়া বা 'রত্ন'-রূপে বসিয়ে নতুন আলাদা এক শৈলী বা রীতি সৃষ্টি করা হোল। কিন্তু চূড়া বা 'রত্ন' বসাবার একটা শৃঙ্খলা ছিল। এর ফলে উদ্ভব হোল, এই 'রত্ন', স্থাপত্যেরই কয়েকটি শ্রেণী— 'একরত্ন', 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', 'একবিংশতিরত্ন' ও 'পঞ্চবিংশতিরত্ন'। সর্বোচ্চ চারটি তলেই পঁচিশটি চূড়া বসানো হোত। 'দেউল'-রীতির যে অজস্র মন্দির দেখা যায়, সেগুলি প্রাচীন 'রেখ' ও 'শিখর' দেউলের রূপান্তরিত ও সরলীকৃত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন দেউল মন্দির, যা গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্রই আমাদের চোখে পড়ে। এই ধরণের মন্দির অজস্র লক্ষ্য করা যায়, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, দুই চব্বিশপরগণা ও কিছু পরিমাণে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায়।

উল্লিখিত এই মন্দিরগুলি ছাড়া আরও কোন কোন শ্রেণীর মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি, যেগুলি পূর্বোক্ত কোন রীতির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সেগুলি প্রথাগত এই শৈলীর না হলেও আমাদের আলোচ্য নিবন্ধের অন্তর্গত।

এই সব মন্দির পলিমাটিতে গড়া শস্যশ্যামল বাংলার একান্ত নিজস্ব, যা স্থপতিশিল্পীদের নিজহাতে তৈরি, বাঙালি সংস্কৃতির এক উন্নত আলোকোদ্ভাসিত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করে। ইঁটের মন্দিরগুলিতে বহুক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী এবং দেবদেবী-লীলাদৃশ্যের 'টেরাকোটা'-ফলক ছাড়াও সমকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সামাজিক দৃশ্য এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারার যে জ্বলন্ত ছবি রূপায়িত হয়েছে, তার ফলে 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলির মধ্যে ইতিহাসের মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আকর্ষণীয় লিপিফলক। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নয়, অনেক দীর্ঘলিপিতে অজ্ঞাত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেগুলি ইতিহাস-প্রেমী মাত্রেরই গবেষণার বস্তু। মধ্যযুগে মন্দিরসজ্জার জন্য 'টেরাকোটা' একটি পৃথক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের কিছুকালের মধ্যেই এই শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে, যাকে কেউ কেউ লোকায়ত শিল্প বলে মনে করেন। যারা মাটির মানুষের কাছাকাছি,তাদের চিন্তা, ধ্যানধারণা এই শিল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মূর্তিফলকগুলিতেগ্রামীণ সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি যেমন স্পষ্ট, তেমনই মূর্তিগুলির ভাবভঙ্গী, বেশভূষা ও আকারে রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনধারার বিচিত্র প্রকাশ। এই মন্দিরগুলি বাঙালির নিজস্ব কল্পনাতেই সৃষ্ট হয়েছিল। এগুলিকে তাই ধর্মীয় মোড়কে পোরা 'আফিং' মনে করে তাচ্ছিল্য না করে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, বিদেশে ও আমাদের দেশে যেখানে মসজিদ ও গীর্জাগুলি খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় বর্তমান, সেখানে শিল্পকৃতির এই বিরল নিদর্শনগুলি অবহেলা-অনাদরে ভগ্ন, জীর্ণ ও পরিত্যক্ত হয়ে দ্রুত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। স্থানীয় মানুষদের ঔদাসীন্য আকাশছোঁয়া হলেও সরকারীযন্ত্র এদের

সুরক্ষার বিষয়ে অস্বাভাবিক নীরব ও নিঃস্পৃহ। ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (আরকিওলজিক্যাল সারভে অফ্ ইন্ডিয়া) বিষ্ণুপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থানের উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির সংরক্ষণের চেষ্টা করলেও রাজ্যসরকারের তরফে আমাদের এই গৌরবময় প্রাচীন নিদর্শনগুলির সুরক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। অপরূপ শিল্পসুষমায় ভরা বহু মন্দিরকে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে আমরা দেখেছি এবং খুব শীঘ্র আরও অনেক মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করা গেছে, মন্দির-দেওয়াল থেকে সুন্দর সুন্দর অজস্র 'টেরাকোটা'-ফলক খুলে তা অন্য জায়গায় বিক্রী করা হয়েছে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এই 'ভ্যান্ডালিজ্‌ম' এর প্রতিবাদ করার কেউ নেই, বরং এই কাজকে খুবই স্বাভাবিক মনে করা হয় এবং এ কাজ যে অতি নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য, তা কারও কখনও মনে হয় না। রাজনীতিক মানুষরা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, মন্দিরের সুরক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো কারুরই 'অপচয়' করার মতো সময় নেই। মাঝে-মাঝে সরকার দায়সারা গোছের দু একটি মন্দিরের সংস্কার করে কাজ সারে। কিন্তু বেশির ভাগ মন্দিরই কালে কালে ধ্বংস হতে থাকে। আমরা এইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভঙ্গুর এবং জীর্ণ কোন কোন মন্দিরের বিবরণী উপস্থিত করব। তবে তার আগে খ্রীষ্টীয় যোল শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের এক নতুন ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

যেহেতু ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা উভয় বাংলাতে সর্বাধিক এবং পাথরের মন্দির নগণ্য, সেকারণে নদীমাতৃক বাংলার পলিমাটিতে গড়া অঞ্চলগুলিতে ইঁটের মন্দির ও তার টেরাকোটা-অলংকরণই আমাদের আলোচ্য। একথা সত্য, উত্তরবাংলার তুলনায় দক্ষিণবাংলার চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় বিচিত্র শ্রেণীর ইঁটের অসংখ্য মন্দির দীর্ঘকাল ধরে তৈরি হয়ে এসেছে। এই বিশাল অঞ্চলকে 'বাংলা' মন্দিরের 'হৃদয়ভূমি'-রূপে বলা যায়। নিতান্ত অনাদৃত অবহেলিত বঙ্গসংস্কৃতির এই অমূল্য নিদর্শনগুলি বহু বিদেশীর কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও এদেশীয়দের কাছে তা নিতান্তই অবজ্ঞার বিষয়। কিন্তু একসময় এগুলিকে যে এক একটি শিল্পকর্মরূপে গড়ে তোলা হোত, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) মন্দির। স্থাপত্য ও টেরাকোটার সূক্ষ্ম কাজ বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে উৎকৃষ্টমানের শিল্পমর্যাদায় ভূষিত করেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলার মন্দির- 'টেরাকোটা' শিল্পের যে নতুন ধারাটি শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের কিছু পরবর্তীকাল থেকে গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অমোঘ প্রভাব। শুধু ধর্মজীবন নয়, বাঙালি-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই এই প্রভাব ছিল অপরিসীম। সাহিত্য ও শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটল এই সময়ে। মন্দির-স্থাপত্যের পূর্বকথিত শৈলীগুলি এই সময়েই আত্মপ্রকাশ করে। 'টেরাকোটা'-শিল্পের নতুন ধারার সূচনা হয়। প্রাক্-মুসলিম বা প্রাক্-সুলতানী আমলে গুপ্তযুগ থেকে পাল-সেন যুগপর্যন্ত 'টেরাকোটা' শিল্পের যে ধারাটি ছিল, তার সঙ্গে চৈতন্য-পরবর্তীকালে 'টেরাকোটা' শিল্পের পার্থক্য সুস্পষ্ট— বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, কারুকার্যের সূক্ষ্মতা, টেরাকোটা-ফলকের আকার-আয়তন সর্বক্ষেত্রেই এই পার্থক্য ধরা পড়ে। পালযুগে আনুমানিক নবম শতকে পাহাড়পুরের (রাজশাহী জেলা, বাংলাদেশ) মন্দির-টেরাকোটা ফলকগুলির সঙ্গে তুলনা করলে এটা চোখে পড়ে। চৈতন্য-পরবর্তীকালে মন্দির দেওয়াল সজ্জার জন্যে টেরাকোটা -ফলকগুলির আয়তন ছোট, বেশির ভাগই ছাঁচে ঢালাই করা— যোল-সতেরো শতকে তৈরি টেরাকোটাগুলিতে মূর্তিফলকের সূক্ষ্ম কাজ, সুন্দর নক্‌শা লক্ষ্য

করা যায়। টেরাকোটা-ফলকসমূহে রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্যই বেশি এবং রামলীলা, মহাভারতের কাহিনী, দশাবতার, পৌরাণিক অন্যান্য কাহিনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩ খ্রী:), কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫খ্রী:) এবং মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪খ্রী:)— এই তিনটি ইঁটের মন্দিরকে সমগ্র বাংলার মধ্যে স্থাপত্য ও টেরাকোটা-অলংকরণের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বলা যায়। বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীউর মন্দিরটিও (পূর্বে এটি 'নবরত্ন'- রীতির ছিল) এই পর্যায়ে পড়ে। এই সব মন্দিরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সজ্জায় অসংখ্য টেরাকোটা- মূর্তি ও নক্‌শাফলক ব্যবহার করা হয়েছে। মেদিনীপুর, হুগলি ও বর্ধমান জেলার বহু মন্দিরেও আমরা সুন্দর সুন্দর টেরাকোটাফলক (মূর্তি ও নক্‌শা) লক্ষ্য করেছি। উদাহরণস্বরূপ, মেদিনীপুরের দাসপুরের সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬), লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯১, ঘাটাল- নবগ্রামে রায়েদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯), হুগলি জেলার দশঘরা, আঁটপুর, বৈঁচিগ্রাম, গুপ্তিপাড়া এবং বর্ধমান জেলার কালনার মন্দিরগুলির কথা বলা যেতে পারে। বিষয়বৈচিত্র্য, শিল্পসুষমার ক্ষেত্রে উক্ত মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা' অলংকরণ খুবই প্রশংসনীয় এবং শিল্পরসিকদের কাছে বিশেষ আদরের সামগ্রী।

বাঁকুড়ার মন্দির: সমীক্ষা

বাংলার মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম ও উচ্চমানের টেরাকোটা আরও বহু মন্দিরে পাওয়া যায় যেগুলি অবিলম্বে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই ধরণের বহু মন্দির অনেক আগেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখনও যে কয়েক হাজার মন্দির পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলি শিল্পরসিক ও পর্যটকদের বিস্ময়ের কারণ হতে পারে। এদের বেশির ভাগই গাছ- গাছালিতে ভরা, ভগ্ন ও জীর্ণ। কিছু কিছু মন্দির কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

পশ্চিমবাংলার জেলাওয়ারী সমীক্ষায় দেখা গেছে, বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরে বেশি মন্দির থাকলেও বর্ধমান ও হুগলিতেও মন্দিরের সংখ্যা কম নয়। এর পর বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বেশ কিছু মন্দির আছে যেগুলি হিন্দু আমলের বা প্রাক্- মুসলিম যুগের। এদের দু'একটির উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় বাঁকুড়া জেলার মন্দিরগুলিই প্রথম আলোচ্য। একদিকে এই জেলায় প্রাক্ - মুসলিম যুগের বিরল মন্দিরগুলি যেমন আছে, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তিধর্মের প্রভাবে মন্দিরচর্চার যে নতুন ধারার সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে, তার ফলশ্রুতিরূপে সমগ্র বাঁকুড়া জেলায়, বিশেষ করে, বিষ্ণুপুরে মন্দিরস্থাপত্য ও টেরাকোটা-অলংকরণের অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও অন্যান্য স্থানে মধ্যযুগের মন্দিরস্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করার মতো। পশ্চিম বাংলার আর কোন জেলায় এতটা লক্ষ্য করা যায় নি।

বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর ও সোনাতপলের দেউল। দ্বারকেশ্বর নদের কাছাকাছি এই দু'টি মন্দিরই ইঁটের তৈরি। তবে প্রথমটির শীর্ষদেশ ভেঙে গেলেও বাকী অংশ অক্ষত আছে, কিন্তু শেষোক্ত মন্দিরটি খুবই জীর্ণ। বর্তমানে অনেকটা সংস্কার করা হয়েছে। বহুলাড়া মন্দিরের বাইরের অলংকরণ স্থাপত্যের অঙ্গীভূত হয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। মন্দিরবিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরণের স্থাপত্য ও অলংকরণরীতি নিঃসন্দেহে প্রাক্-মুসলিম যুগের এবং আনুমানিক অষ্টম-নবম শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়ে থাকবে। দ্বারকেশ্বর- তীরবর্তী অপর দুটি প্রাচীন মন্দির ডিহরের সারেশ্বর ও শৈলেশ্বরের পাথরের ভগ্ন দেউল। দুটি মন্দিরেরই শুধুমাত্র নীচের অংশ বর্তমান। 'শিখর' বা ওপরের অংশ দীর্ঘকাল ভগ্ন ও লুপ্ত। সারেশ্বরের একটি বিলুপ্ত লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়। এই দুটি যে দেউল মন্দির ছিল তা নীচের অংশ ('বাঢ়') দেখেই বোঝা যায়। বহুলাড়া ও সোনাতপলের দুটি মন্দিরও দেউল রীতির। তবে এগুলিতে উত্তর ভারতীয় 'নাগর'-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট, যে-রীতিটি মগধের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উত্তর ভারতীয় 'নাগর'-রীতির মন্দির ছাড়াও ওড়িশী 'রেখ'-দেউল রীতির বহু মন্দির বাঁকুড়ার নানা স্থানে তৈরি হয়। এর বহু নিদর্শন এখনও বর্তমান।

বাঁকুড়া জেলায় প্রাক্-সুলতানী-আমলের পাথরে তৈরি কয়েকটি 'দেউল' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অম্বিকানগরের (রাণীবাঁধ থানা) শিব, আটবাইচণ্ডীর বাসুলী, চণ্ডী ও শিবের মন্দির, দেউলভিড়্যার (তালডাংরা থানা) পরিত্যক্ত দেউল এবং হাড়মাসরার (তালডাংরা থানা) দেউল প্রাক্-

মুসলিম যুগে কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি মন্দির খুবই জীর্ণ ও ভগ্ন। হাড়মাসরার মন্দিরে ওড়িশী 'রেখ'-দেউলের প্রভাব স্পষ্ট।

প্রাক্-মুসলিম যুগের এই মন্দিরগুলি সবই প্রায় 'দেউল'-রীতির ছিল যার উৎসমূল ছিল উত্তরভারতের 'নাগর'-শৈলীর 'শিখর' মন্দির। শেষমধ্যযুগে উদ্ভাবিত পূর্বোক্ত বিভিন্ন শৈলীর মন্দির তখন ছিল না। নাগর-শৈলীর প্রাচীন, মগধে বিকশিত পূর্বী-রীতির যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মন্দির পূর্বোক্ত বহুলাড়া ও সোনাতপলে এবং পুরুলিয়া ও বর্ধমানের পূর্বকথিত স্থানসমূহে লক্ষ্য করা গেছে, সেগুলি ছাড়াও ওড়িশায় বিকশিত রেখ-শৈলীর মন্দিরও প্রাক্- মুসলিম যুগে বহু নির্মিত হয়, যার অনেক দৃষ্টান্ত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় বর্তমান। এদের বেশির ভাগই ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভগ্ন ও জীর্ণ। প্রায় সবই পাথরে তৈরি। পুরীর জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ বা অন্যান্য 'রেখ' দেউল-মন্দিরের সঙ্গে এগুলির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, যদিও বিশালতা, স্থাপত্যালংকার ও মূর্তিভাস্কর্যের যে সমারোহ ওড়িশার ঐ মন্দিরগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, এখানে তার প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। বাঁকুড়ার হাড়মাসরা মন্দিরের সঙ্গে ওড়িশী রেখ-দেউলের নিকটসাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়েছে। অবশ্য, মন্দিরটি খুবই ছোট আকারের। ওড়িশী 'রেখ' ছাড়া 'পিঢ়'-রীতির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দিরও প্রাচীন বাংলায় নির্মিত হোত, যার দৃষ্টান্ত আটবাইচণ্ডী মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুর জেলার ডাইনটিকরি গ্রামেও (বিনপুর থানা) এই 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির জীর্ণ মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি। এগুলি উচ্চ রেখ-দেউলের চেয়ে অনেকটা খর্বাকৃতি এবং এর ওপরের ছাদ 'থাকে থাকে' ('পিঢ়া') ওপরে উঠে গিয়ে শীর্ষদেশে মিলিত হয়। মূলত দর্শকদের 'প্রেক্ষাগৃহ'রূপে ব্যবহারের জন্য এগুলি মূল 'রেখ'-দেউলের সামনে যুক্ত করা হোত। দৃষ্টান্ত, লিঙ্গরাজ বা জগন্নাথের 'জগমোহন', নাটমন্দির ও 'ভোগমণ্ডপ' অথবা কোণার্কের মন্দির। এই 'পিঢ়' রীতির মন্দির এককভাবে 'গর্ভগৃহ' (স্যাঙ্‌টাম্) বা বিগ্রহাধিষ্ঠান গৃহরূপেও ব্যবহৃত হোত। মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে সর্বমঙ্গলা, কপিলেশ্বর ও কাশীশ্বর মন্দিরগুলি এই রীতির। দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দিরও এইরূপ।

বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে ওড়িশী 'রেখ' ও 'পিঢ়া'-রীতির মন্দির যতবেশি নির্মিত হয়েছে, অন্য আর কোন জেলায় এতটা দেখা যায় না। সীমান্ত পশ্চিম বাংলার এই অঞ্চল ওড়িশার প্রভাবমণ্ডলের আওতায় দীর্ঘকাল থাকায় এবং ওড়িশার 'গজপতি' ও 'গঙ্গ'-বংশীয় রাজাদের শাসন এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল কায়েম থাকায় নানা স্থানে জগন্নাথ ও শিব উপাসনার সঙ্গে এইরূপ স্থাপত্যচিন্তারও উন্মেষ ঘটেছিল, তা অনুমান করা যায়।

প্রাক্-মুসলিম যুগের উপরিউক্ত মন্দিরগুলির পর মধ্যযুগের বাংলায় নতুন যে মন্দিরচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল, তার চরম উৎকর্ষ বাঁকুড়াতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত মল্লরাজাদের আনুকূল্যেই এখানে মন্দিরশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বিষ্ণুপুর তো বটেই, বিষ্ণুপুরের বাইরে ইঁট ও পাথর উভয় উপাদানেই নির্মিত 'চালা', 'রত্ন' ও 'দেউল' মন্দিরের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। আকারের বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা এবং স্থাপত্যকৌশলের চমৎকারিত্বে উক্ত রীতির মন্দিরগুলি পশ্চিমবাংলার অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে কয়েকটির নাম এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য। যেমন, গোকুলনগরের (জয়পুরথানা) ল্যাটারাইট পাথরে তৈরি গোকুলচাঁদের পরিত্যক্ত ও ভগ্ন এবং জীর্ণ 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। মন্দিরটি মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহের সময়ে ৯৪৯ মল্লাব্দ বা ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। বিশাল আয়তনের (দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৪৫ ফুট বা ১৩.৫ মিটার) এবং আনুঃ উচ্চতা ৪৫ ফুট।

মন্দিরটির চারদিকের ত্রিখিলান প্রবেশ-পথযুক্ত বারান্দা ছাড়াও গর্ভগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণ পথও বর্তমান, যা খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। এছাড়া, দশাবতার প্রভৃতির অনেক ভাস্কর্যও এই মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি ছাড়াও 'রত্ন' বা চূড়াগুলিতে 'পিঢ়' -অংশ সুস্পষ্টভাবে 'পিঢ়া'-দেউলের পরিচয় বহন করে। দেওয়ালে মূর্তিভাস্কর্যের ফলকগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ একটি সুদৃশ্য 'পঞ্চরত্ন'-স্থাপত্যের নিদর্শন গাছগাছালিতে পূর্ণ হয়ে আজ একেবারে ধ্বংসোন্মুখ। সম্প্রতি সংস্কারের কাজ হচ্ছে বলে জানা গেছে। 'রত্ন'-শৈলীর অপর আর একটি ধ্বংসোন্মুখ মন্দির দ্বাদশবাড়ির (বিষ্ণুপুর থানা) পরিত্যক্ত 'একরত্ন'। এটিও কোন মল্লরাজার প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা যায় এবং স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যদৃষ্টে এটিও সতেরো শতকের বলে অনুমান। বিষ্ণুপুর শহব থেকে দ্বাদশবাড়ির দূরত্ব খুবই কম। কিন্তু মন্দিরটির শোচনীয় অবস্থা ও সকলের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করার মতো। মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ এর ছত্রাকৃতি 'রত্ন'। আটকোণা গম্বুজাকৃতি রত্নটির চারপাশ খোলা— কতকটা রাস বা দোলমঞ্চ আকারের। এই প্রাচীন 'একরত্ন'-স্থাপত্য প্রায় ধ্বংসের পথে। বিষ্ণুপুরের বাইরে অপর একটি সুন্দর 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বৈতল গ্রামের (জয়পুরথানা) শ্যামচাঁদের। পাথরে তৈরি এই মন্দিরও বিশাল আয়তনের এবং এর ছাদের রত্নগুলি ও 'পিঢ়'-রীতির বা থাকযুক্ত। প্রতিষ্ঠালিপিটি থেকে জানা যায় মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ ৯৬৬ মল্লাব্দ বা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটিরও স্থাপত্যকৌশল পূর্বোক্ত গোকুলনগর মন্দিরের মতো।

বহি-র্বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল, এল্যাটির বিশেষ ধরণের এক দেউল যা কতকটা দীর্ঘাকৃতি পিরামিড আকারের। মন্দিরটি ইঁটের তৈরি, দ্বারকেশ্বর-তীরবর্তী। দেওয়ালে কিছু ফুলকারি নক্‌শা আছে। এটিও মল্লরাজাদের আমলে সতেরো শতকের কোন সময়ে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। পরিত্যক্ত এই 'দেউল'-মন্দির প্রথম রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন বলে কারও কারও ধারণা। নীচের বর্গক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের ওপর হেলানো দীর্ঘাকার শিখরটি এই মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ যা ঊর্ধ্বে ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে 'বেকি' ও 'আমলকের' নিম্নদেশে মিলিত হয়েছে। শিখরের উপরিভাগ থেকে নিম্নদেশ পর্যন্ত প্রসারিত প্রলম্ব 'রথ'-বিন্যাস (রেখা) অগভীর। কিন্তু 'শিখরের' সর্বাংশে সমান্তরাল রেখা যেন 'পিঢ়ার' সৃষ্টি করছে বলে ভ্রম হয়। আসলে এটি একটি বিশিষ্ট ধরণের দেউলমন্দির যা মল্লশাসনকালে পরীক্ষা- নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে অনুমান।

বাঁকুড়া জেলায় মল্লরাজাদের আমলে বেশ কিছু দেউল মন্দির নির্মিত হয়েছিল। প্রধানত সতেরো-আঠারো শতকের মধ্যে এগুলি তৈরি হয়। পূর্বোক্ত প্রাক্-মুসলিম দেউল -স্থাপত্যের সঙ্গে এগুলির পার্থক্য সুস্পষ্ট। উভয়ের স্থাপত্যদৃষ্টে এটা সহজেই বোঝা যায়। বিক্রমপুরের (ওঁদা থানা) পাথরে তৈরি সুদৃশ্য রাধাকৃষ্ণের 'দেউল' ও তৎসংলগ্ন 'পিঢ়' 'জগমোহন' নির্মাণ করেন ৯৬০ মল্লাব্দ বা ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা বীরসিংহের মহিষী এবং শ্রীরঘুনাথ সিংহের মাতা। মন্দির, বিশেষ করে, 'জগমোহন' (পরিদর্শনকক্ষ) বেশ ভগ্ন হলেও স্থাপত্যের মধ্যে ঋজু ও বলিষ্ঠভাব ফুটে উঠেছে। এই জেলার আর একটি সুদৃশ্য 'দেউল' মন্দির আছে কোতুলপুর থানার অন্তর্গত সিহরে। মন্দিরের বিগ্রহ শান্তিনাথ শিব। মাকড়া পাথরে তৈরি 'জগমোহন'যুক্ত এই ওড়িশী 'রেখ'-দেউল-স্থাপত্যে খাঁটি ওড়িশী শৈলীর ছাপ পড়েছে। প্রশস্ত 'জগমোহনের' চালের 'পিঢ়া' দুটিতে কিছুটা ঢালুভাব থাকায় কতকটা চালার আকার নিয়েছে। বাংলা 'আটচালা' এইভাবে যে সৃষ্ট হয়েছিল, তা এই 'জগমোহন'-টি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্যদৃষ্টে এটি সতেরো শতকের বলে অনুমান

করা যায়। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী ধরাপাটের (বিষ্ণুপুর থানা) শ্যামচাঁদের 'রেখ' দেউল মন্দিরও ওড়িশী 'রেখ' শৈলীর। মন্দিরের প্রবেশপথের ওপরের একটি লিপি থেকে জানা যায়, 'মল্ল মহীপাল শ্রী হম্বীর সিংহে'র সময়ে ১৫২৫ শক বা ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে এটি তৈরি হয়। মন্দির 'শিখরের' তিনদিকের দেওয়ালে প্রাচীন তিনটি পাথরের মূর্তি বাসুদেব, আদিনাথ ও পার্শ্বনাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চল যে একসময় জৈন ধর্মের কেন্দ্র ছিল, আদিনাথ ও পার্শ্বনাথের মূর্তিই তার প্রমাণ। মূর্তিগুলি বেশ প্রাচীন এবং পালযুগের বলে অনুমান করা যায়। পূর্বোক্ত হাড়মাসরা গ্রামেও আমরা একটি জৈনমূর্তি লক্ষ্য করেছি যেটিকে ভ্রমক্রমে স্থানীয় লোকেরা দেবীজ্ঞানে পুজো করে থাকেন। বাঁকুড়া অঞ্চলে একসময় যে জৈনধর্মের প্রাবল্য ছিল, এইসব মূর্তিই তার প্রমাণ। বড়জোড়া থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুরের রত্নেশ্বর শিবের 'রেখ'-দেউলও ওড়িশী শৈলী- প্রভাবিত। মাকড়া পাথরে নির্মিত এই মন্দিরটিও স্থাপত্যদৃষ্টে সতেরো শতকের বলে অনুমিত। মন্দিরের 'শিখরে'র নিম্নভাগের দুটি প্রস্থ— প্রস্থের দেওয়ালের ধাপগুলি লক্ষণীয়। বাঁকুড়া জেলায় আরও বহু দেউল মন্দির বর্তমান। ওড়িশী 'রেখ'-দেউল স্থাপত্যের গাম্ভীর্য ও বলিষ্ঠতা এই জেলার দেউলগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলায় বেশ কিছু 'রেখ'-দেউল পুরোপুরি ওড়িশী-রীতিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাছাড়াও বহু সাদামাটা দেউল মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে নির্মিত হয়েছিল। এই ধরণের সাদামাটা জগমোহনবিহীন দেউলের সংখ্যা মেদিনীপুর ছাড়া হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় অনেক লক্ষ্য করা গেছে।

বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির প্রসঙ্গে আসার আগে বহির্বিষ্ণুপুরের আরও কয়েকটি স্থানের মন্দির-সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। জনপ্রিয় 'চালা'-শৈলীর সুন্দর কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে পাথরে তৈরি নারিচার (পাত্রসায়ের থানা) 'চারচালা'-শৈলীর সর্বমঙ্গলা মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'চারচালার' ঢালু চাল, সুঠাম গঠন, দীর্ঘ আয়তন খুবই আকর্ষণীয়। এ-ধরণের নিদর্শন মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে সনকার পাথরের মন্দির এবং নদীয়ার পালপাড়ায় (চাকদহ) পরিত্যক্ত একটি ইঁটের মন্দির। নারিচার এই মন্দিরটিতে পাথরের অল্প দুয়েকটি ভাস্কর্যও উল্লেখযোগ্য। মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষিত পাথরের গণেশ ও মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তি (আঃ দ্বাদশ- ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আটচালা'-রীতির উৎকৃষ্ট মন্দিরগুলি লক্ষ্য করা গেছে তেজপাল (বিষ্ণুপুর থানা), সাব্রাকোণ (তালডাংরা থানা) ও সিমলাপালে (সিমলাপাল থানা)। এই আটচালা -রীতির আরও দুয়েকটি মন্দির আছে পাত্রসায়ের ও বালসীতে। তেজপালের পাথরে তৈরি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি রাজা রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহ ৯৭৮ মল্লাব্দ বা ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করান। সাব্রাকোণের পাথরের রাধাকৃষ্ণের 'আটচালা' মন্দিরের তিনিই নির্মাতা ছিলেন ৯৮৩ মল্লাব্দ বা ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে। সিমলাপালের বলরামজীউর 'আটচালা' মন্দিরের সামনে 'গথিক'স্তম্ভ শোভিত একটি 'দালান' 'জগমোহন' রূপে তৈরি করা হয়েছিল। অবশ্য, এটি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা যায়।

বাঁকুড়া জেলার আটচালা-রীতির মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য হোল, ওপরের চারটি চাল পৃথক একটি তলযুক্ত না হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামবাংলায় বহুল প্রচলিত কাটাচালের রূপ নিয়েছে। এই মন্দির কাটা আটচালা যা 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' নামেও পরিচিত। বিষ্ণুপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকায় এই রীতির মন্দির অনেক তৈরি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, গড়বেতার (মেদিনীপুর) রাধাবল্লভ মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ মন্দিরটি রাজা বীরসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়ায় 'দোচালা' মন্দির নেই বললেই চলে। বিষ্ণুপুরে মদনমোহন মন্দিরের কাছে গোস্বামীপাড়ায়

একটি দ্বিতল নহবৎখানার দ্বিতলের 'দোচালা'টি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'দোচালাটিতে' গ্রামের 'দোচালা' কুটিরের আদলটি যে ধরা পড়েছে, তা আমরা লক্ষ্য করেছি।

বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরকে বাদ দিলে মন্দিরবহুল স্থানরূপে সোনামুখীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি একটি শহরও বটে। এখানে 'রত্ন', 'দালান', 'চাঁদনি' এবং 'দেউল' - এই তিন রীতির মন্দির আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে এখানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, তন্তুবায়-পরিবারের শ্রীধরজীউর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির। তলের সংখ্যা না বাড়িয়ে মাত্র দুটি তলে এই মন্দিরের সব চূড়াগুলিই বসানো হয়েছে। মন্দিরে যে লিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং মন্দিরের স্থপতি বা সূত্রধর ছিলেন হরি সূত্রধর। সম্ভবত এই হরি সূত্রধর বা রামহরি সূত্রধর সোনামুখীরই 'চন্দ্র'পাড়ার চন্দ্রদের দেউল এবং বর্ধমানের কালনায় প্রতাপেশ্বরের দেউল মন্দির (১৮৪৯) নির্মাণ করেন। শ্রীধরমন্দিরের চারদিকের দেওয়ালে, এমনকি, ঢাকা বারান্দার গায়ে পোড়ামাটির অজস্র মূর্তিফলক সন্নিবেশিত। মূর্তিফলকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর চিত্র, কৃষ্ণলীলা, সমকালীন সমাজদর্পণ, ফুলকারি নকশার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'টেরাকোটা'য় সূক্ষ্ম কারুকার্য বলতে কিছু নেই। সোনামুখীর 'গিরিগোবর্ধন' মন্দিরও (১৮৩৫ খ্রী.) উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রপাড়ার পূর্বোক্ত দেউলের 'শিখর' গম্বুজাকৃতি খাঁজকাটা, প্রতাপেশ্বর দেউলের সঙ্গে এর সাদৃশ্য স্পষ্ট এবং বর্ধমানের শ্রীবাটীতেও (কাটোয়া) কতকটা এই ধরণের মন্দির লক্ষ্য করা গেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধেও এই ধরণের খাঁজকাটা গম্বুজাকৃতি 'শিখর' এযুগের দেউলের মধ্যে এক নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল, যার অপর একটি নিদর্শন মেদিনীপুরের চেতুয়া-বাসুদেবপুরে (দাসপুর) বর্তমান। এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। সোনামুখীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার একটি সাদামাটা 'দালান' মন্দিরও এখানে আছে এবং তার কাছাকাছি শিবের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরও বর্তমান। এখানে কয়েকটি দুর্গাদালানও লক্ষ্য করা যায়। বহু প্রাচীন পুজো এইসব দালানে অনুষ্ঠিত হ'তে দেখা যায়। বিশেষ করে, 'কবিরাজ'-(বৈদ্য) সম্প্রদায়ের কোন কোন পুজো বেশ প্রাচীন।

বাঁকুড়ার তথা সারা পশ্চিমবাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরে লক্ষ্য করা যায়। ইঁট ও পাথর-এই দুই উপাদানেই গঠিত মন্দির এখানে আছে। তবে 'টেরাকোটা'র আশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট অলংকরণের জন্য বিষ্ণুপুরের ইঁটের মন্দিরগুলি সমগ্র বাংলার এক বিস্ময়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-এই উভয় ক্ষেত্রেই বিষ্ণুপুরের সমকক্ষ আর কোন মন্দির আছে কিনা সন্দেহ।

মধ্যযুগের প্রায় সব রীতির মন্দিরই বিষ্ণুপুরে নির্মিত হয়েছিল। এগুলি হোল 'রত্ন', 'চালা' ও 'দেউল'। এগুলির মধ্যে সর্বোৎকর্ষের জন্য 'রত্ন'- মন্দিরগুলির কথাই বিশেষ করে মনে হয়। তবে প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যের জন্য বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাসমঞ্চ উল্লেখযোগ্য। মাকড়া পাথরের একটি উচ্চ বিশাল বেদির ওপর পিরামিড আকৃতির বিশাল আয়তন এই দেবালয়টির ছাদের প্রতি দিকের কোণে একটি করে সুদৃশ্য ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা' এবং তার মাঝে চারটি করে 'দোচালা' স্থাপিত। তিনপ্রস্থ খিলানযুক্ত প্রদক্ষিণপথ গর্ভগৃহ ও তৎপার্শ্বস্থ একটি কক্ষকে আবর্তন করেছে। এইরূপ নতুন স্থাপত্য পশ্চিম বাংলায় বিরল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, রাসমঞ্চটির পূর্বদিকের বাইরের দেওয়ালে 'টেরাকোটার' অল্প কয়েকটি মূর্তি ও ফুল। মূর্তিগুলির মধ্যে অপরূপ সংকীর্তনদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। 'রাস-রিলিফে' উৎকীর্ণ 'টেরাকোটা'- গুলিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য টেরাকোটা-শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক। রাসমঞ্চটি বীর হাম্বিরের প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমিত এবং আনুমানিক ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। সেই সবে মন্দিরদেওয়ালে

শুধুমাত্র ফুল, লতাপাতা নক্‌শার বদলে কিছু কিছু 'টেরাকোটা' মূর্তি সন্নিবেশিত হতে শুরু হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ, বর্ধমানের বৈদ্যপুর এবং হুগলির বৈঁচিগ্রামের যে মন্দিরগুলি ষোল শতকের শেষাশেষি তৈরি হয়েছিল, সেগুলিতেও খুব অল্প পরিমাণে 'টেরাকোটা'- ফলক স্থাপিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের এই রাসমঞ্চে যে অল্প কয়েকটি 'টেরাকোটা' আমরা লক্ষ্য করি, সেগুলি মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'-শিল্পের প্রারম্ভিক সূচনা মনে করা যায়। 'টেরাকোটা'-শিল্পের যে নতুন একটি ধারা মধ্যযুগের বাংলার মন্দিরকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়েছিল, তার প্রারম্ভিক সূচনা অনুমান করা যায় পনের শতকের শেষদিক থেকে, যার কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি কোন্নগর পল্লীর (ঘাটাল শহর) সিংহবাহিনীর 'চারচালা' জোড়ামন্দিরে।

রাসমঞ্চের পরেই প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বরমন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি 'দেউল'রীতির ছিল বলে অনুমান। মাকড়া পাথরে তৈরি এই মন্দিরটির 'শিখর' ভেঙে গেলে তার বদলে আটকোণা একটি চূড়া স্থাপিত হয়। উৎসর্গলিপিটি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি বীরসিংহ ৯২৮ মল্লাব্দ বা ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বীরসিংহকে কেউ কেউ বীর হম্বির বা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মনে করেন। বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকার পাথরদরজার উত্তরপশ্চিমে কৃষ্ণ ও বলরামের নামে চলিত ইঁটের দুটি 'দেউল' মন্দির উল্লেখযোগ্য। এগুলির স্থাপত্যদৃষ্টে আঠার শতকের কোন সময় প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া, 'জোড়বাংলা' মন্দিরের কাছে আরও দুটি 'দেউল' মন্দির বর্তমান। এর দেওয়ালে অল্প কিছু 'টেরাকোটা'-অলংকরণদৃষ্টে এগুলিও আঠার শতকের বলে মনে করা যায়।

'রত্ন'-মন্দিরের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরে 'একরত্নে'র (একচূড়া) সংখ্যা বেশি। ইঁট ও পাথর - উভয় উপাদানেই তৈরি 'একরত্ন' মন্দিরগুলি সমগ্র বাংলার মধ্যে এই রীতির স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন মন্দির (ইঁটের তৈরি, ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জনসিংহদেব-প্রতিষ্ঠিত), দুর্গ এলাকায় লালজীউ (বীরসিংহ কর্তৃক ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) ও রাধাশ্যাম (চৈতন্যসিংহের দ্বারা ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) এবং লালবাঁধ এলাকায় 'জোড়মন্দির' গোষ্ঠীর মন্দিরগুলি 'একরত্ন'- রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। লালবাঁধের দক্ষিণে কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, নন্দলাল ও রাধামাধবের মন্দির এবং এগুলির কিছু পশ্চিমে 'জোড় মন্দির'-গ্রুপের মন্দিরগুলি 'একরত্ন'-শৈলীর। এছাড়া বিষ্ণুপুর শহরের নানা স্থানে মুরলীমোহন, মদনমোহন, চিন্ময়ী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরও এই রীতির। নীচের প্রশস্ত চালার কার্ণিশের বক্রতা ও চালের ঢালুভাবের সৌন্দর্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ছাদের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত বিচিত্র ধরণের 'রত্ন'- শিখর (দ্রষ্টব্য, মদনমোহন, রাধাশ্যাম ও লালবাঁধের রাধাগোবিন্দ ও নন্দলাল মন্দিরের আলোকচিত্র। 'Bishnupur by S.S. Biswas, Published by the Director-General, Archaeological Survey of India, New Delhi, Plates V, VIII, IX, XI) সমগ্র মন্দিরদেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

উপরি উল্লিখিত মন্দিরগুলির প্রায় সবই পাথরে তৈরি একমাত্র মদনমোহন মন্দির ছাড়া। 'জোড়মন্দির'-গোষ্ঠীর মন্দিরগুলি ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে গোপাল সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাধামাধব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন কৃষ্ণ সিংহ ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে এবং রাধামাধবের মন্দির রাজা বীরসিংহের অন্যতমা মহিষী শিরোমণি দেবী ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করান। রাধাশ্যাম মন্দির এগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও (১৭৫৮) এর দেওয়ালের মূর্তিভাস্কর্যগুলি নতোন্নত পদ্ধতিতে (বাস-রিলিফ) খোদিত এবং প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়। বিষয়, কৃষ্ণ ও পৌরাণিক দেবদেবীলীলা, দশাবতার প্রভৃতি।

'লালবাঁধগোষ্ঠীর' মন্দিরের মধ্যে কালাচাঁদ মন্দিরটি সর্বপ্রাচীন (১৬৫৬, রাজা রঘুনাথ সিংহের প্রতিষ্ঠিত)। মাকড়া পাথরের এই মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে 'বাস- রিলিফে'র মূর্তিভাস্কর্যগুলি উল্লেখযোগ্য। রাধাগোবিন্দ মন্দিরেও (১৭২৯) কিছু কিছু ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়। কালাচাঁদ মন্দিরের কাছাকাছি রাধামাধব মন্দিরেও (১৭৩৭) মূর্তি ও অন্যান্য অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। দুর্গের পাথরদরজার কাছে রাধাশ্যাম মন্দিরের পার্শ্ববর্তী লালজীউর মন্দির (১৬৫৮) অলংকরণবিহীন হলেও এর স্থাপত্য আকর্ষণীয়।

বিষ্ণুপুরের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির মদনমোহনের 'একরত্ন'। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মূর্তিফলকগুলি ছাড়াও ফুললতাপাতার অপরূপ নকশা খুব কম মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্লেট ৬)। টেরাকোটা' ফলকগুলির বৈশিষ্ট্য হোল, প্রতিটি ফলকের চারপাশে ফুলকারি নকশার বেষ্টনী এবং ফলকগুলি সচরাচর মাপের থেকে আয়তনে বড়ো। টেরাকোটা - ফলকের এই রীতিটি পরবর্তীকালের অনেক মন্দিরে আমরা লক্ষ্য করেছি। এই ধরণের নক্‌শাকাটা ফলক মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলার অনেক মন্দিরে অনুসৃত হয়েছিল যাকে আমরা 'বিষ্ণুপুরী টেরাকোটা' বলতে পারি। মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশে ত্রিখিলান প্রবেশপথ যুক্ত আবৃত বারান্দা। সামনের দিকে যে টেরাকোটা-ফলকগুলি আছে, তাতে কৃষ্ণলীলাদৃশ্য এবং সংকীর্তনদৃশ্য রূপায়িত। অপর তিন দিকের দেওয়ালে খিলানের ওপরে-নীচে অজস্র ফলক সজ্জিত। এর মধ্যে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে। খিলানের ওপরের অংশে মহাভারতের যুদ্ধদৃশ্য বর্ণিত। মহাভারতের যুদ্ধদৃশ্য এই মন্দিরে যতটা লক্ষ্য করা যায়, অন্য কোন মন্দিরে তেমন পাওয়া যায় না। তাছাড়া সংকীর্তনদৃশ্যের বহু ফলক, সাধু- সন্ন্যাসীর মূর্তিফলক এবং পৌরাণিক দেবতার বহু ফলক এই মন্দিরে আছে। তবে নকাশি কাজের যে সূক্ষ্ম নিদর্শন এই মন্দিরে পাওয়া যায়, তা পশ্চিম বাংলার অন্য কোথাও বিরল।

বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকায় কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' ও শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন'-এই দুটি ইঁটের মন্দির স্থাপত্য ও উৎকৃষ্টমানের অলংকরণের জন্য সুপরিচিত। বিশালতা, নিখুঁত স্থাপত্যকৌশল, 'টেরাকোটা'- অলংকরণের সূক্ষ্ম কৃৎকৌশল ও দৃশ্যবৈচিত্র্যের জন্য এই দুটি মন্দিরের সমকক্ষ আর কোন নিদর্শন পশ্চিমবাংলায় নেই বললেইচলে। মধ্যযুগের 'টেরাকোটা' শিল্পে যে এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল, তার সর্বোৎকর্ষ এই দুটি মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি মন্দিরেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ, যিনি বিষ্ণুপুর ও তার আশপাশে বেশ কিছু মন্দির নির্মাণ ক'রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রাচীনত্বের ক্ষেত্রেও এই মন্দিরটি উল্লেখের দাবী রাখে। শ্যামরায়ের মন্দিরটি ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে এবং 'জোড়বাংলা' ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের ইঁটের মন্দিরটি ছাড়া আর একটি মন্দির হোল পাথরের তৈরি মদনগোপালের । কিন্তু উৎকর্ষের ক্ষেত্রে শ্যামরায়ের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। প্রশস্ত আয়তন এই মন্দিরের কেন্দ্রীয় 'রত্নটি' একটু ভিন্ন ধরণের। এটি একটি আয়ত চালার ওপর আটকোণা খর্বাকৃতি চূড়াযুক্ত। অপর চারটি 'রত্ন' (চূড়া) কতকটা পিঢ়-দেউলের মতো হলেও এগুলির মধ্যে কিছুটা 'চালার' ভাব স্পষ্ট। এই মন্দিরের নীচের অংশটিতে 'চারচালার' চালের ঢালু ও সহজ ভাবটি বেশি পরিস্ফুট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে 'দালান' বা 'চাঁদনি'র ওপরে 'রত্ন' বসান 'রত্ন' মন্দিরগুলি আমরা লক্ষ্য করি, সেখানে এইরূপ 'চালা'র প্রয়োগ খুবই বিরল। লালবাঁধগোষ্ঠীর পূর্বোক্ত 'একরত্ন'-সমূহেও আমরা এই চালার প্রয়োগ লক্ষ্য করি। চালার কার্ণিশ ধনুকের মতো বাঁকানো এবং ছাঁচা বাইরে কিছুটা ঝুলন্ত অবস্থায়

বর্তমান।

শ্যামরায়-মন্দিরে 'টেরাকোটার' সীমাহীন প্রাচুর্য লক্ষ্য করার মতো। শুধুমাত্র বাইরের দেওয়ালগুলিতে 'টেরাকোটা' ফলকের সমাবেশ নয়, ভেতরের দেওয়াল, ভেতরের ছাদ এবং রত্ন সমূহের প্রায় সবগুলিতেই 'টেরাকোটা' মূর্তিসজ্জা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে ফুললতাপাতার সুন্দর নক্‌শা কাজও আছে। মূর্তি-অলংকরণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণলীলাদৃশ্য প্রাধান্য পেয়েছে, বিশেষতঃ এই মন্দিরে বৃহদাকার 'রাসমণ্ডলচক্র'গুলি এতই বলিষ্ঠ ও সাবলীল যে, দূরের অনেক মন্দিরে অলংকরণের জন্য এটি একটি 'আদর্শ' রূপে (মোটিফ) গৃহীত হয়েছিল। বহু টেরাকোটা ফলকে দুজন গোপীর মাঝখানে কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। সংকীর্তনদৃশ্যের বহু ফলকও এখানে লক্ষ্য করা যায়। আবৃত বারান্দার ভেতরের দেওয়ালে বিশালাকার টেরাকোটা-ফলকের মধ্যে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব উপাখ্যান, যেমন পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি— শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, গণেশ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এছাড়া মন্দিরের অভ্যন্তরে এক স্থানে পদ্মের ওপর সমাসীন দশবাহু পঞ্চানন শিবমূর্তি এবং তার নীচে জ্যোতিষ্মান্ নরসিংহদেব দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

শ্যামরায় মন্দিরের খিলান প্রবেশপথগুলির ওপরে দেব, দানব, বীর ও যোদ্ধাদের রথারূঢ় বা অশ্বারূঢ় অবস্থায় যুদ্ধরত লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালের নিম্নভাগে রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সামাজিক দৃশ্যচিত্রও রূপায়িত-যেমন, ঝাম্পান বা পালকিতে রাজার স্থানান্তর-গমন ইত্যাদি। এই মন্দিরে এক অদ্ভুত ধরণের প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, পক্ষযুক্ত সিংহের সঙ্গে হস্তীর যুদ্ধ অথবা বিশালাকার উটপাখীর মতো এক প্রাণীর হস্তিভক্ষণ। মন্দিরটির গর্ভগৃহের ভেতরের দেওয়ালে ফুললতাপাতার নক্‌শা কাজগুলি বেশ প্রশস্ত। টেরাকোটার সব কাজের মধ্যেই যেন রয়েছে একটা ছন্দ, গতিময়তা ও লালিত্য। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এগুলির সূক্ষ্মতা পরিমাপ করা কিছুটা কঠিন।

বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' মন্দিরকে এই রীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন মনে করা যেতে পারে। মন্দিরটি কেষ্টরায়ের জন্য রাজা রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। বিশালতা, বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব, 'বাংলা' রীতির সুনিপুণ প্রয়োগ, 'টেরাকোটার' সীমাহীন প্রাচুর্য, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি সম্মুখভাগের 'একবাংলা'র শীর্ষদেশে একটি সুদৃশ্য ও সুললিত 'চারচালা'র সন্নিবেশে এই মন্দিরটি সারা বাংলায় একটি আদর্শস্থানীয় দেবালয়। ইঁটের অপর একটি 'জোড়বাংলা' মন্দির মহাপ্রভুর, যা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কেষ্টরায়ের দক্ষিণমুখী 'জোড়বাংলা' মন্দিরটির 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলি খুবই উৎকৃষ্টমানের। এখানেও স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণলীলাদৃশ্যই প্রাধান্য লাভ করেছে-এর মধ্যে বাল্যলীলাদৃশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য-যেমন, পূতনা, তৃণাবর্ত ও শকটাসুর বধ, কৃষ্ণ-বলরামের পরিচর্যা, ননিচোর বালকৃষ্ণ, বকাসুর, অজগররূপী অঘাসুর, অরিষ্ট, ধেনুকাসুরের দাবানল ভক্ষণ, শঙ্খচূড়, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রত্যাবর্তন, ঘোটকাসুর কেশী, বলরাম ও বড়াই বুড়ির সঙ্গে কদমতলে কৃষ্ণ ও রাধা, কংসের ধোপার মৃত্যু, কংসের হস্তী কুবলয়াপীড়ের মৃত্যু, মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের যুদ্ধ, রথাসীন প্রতিস্পর্ধী যোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ (সম্ভবত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ)। মন্দিরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে অনেক রামলীলাদৃশ্য বর্তমান। মন্দিরের সম্মুখভাগে নৌকাবিলাস ও বস্ত্রহরণদৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেওয়ালের নিম্নদেশে বহু ক্ষেত্রে পৌরাণিক ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর দৃশ্যচিত্র রূপায়িত হয়েছে। পশ্চিম দিকে 'রামায়ণ প্যানেলে'র

মধ্যে যে দৃশ্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হোল, সিন্ধুবধ, ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ এবং তার ফলে রাজা দশরথের চার ছেলের জন্ম, রাক্ষসগণের দ্বারা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পন্ড, বিশ্বামিত্রের রামকে নিয়ে বনগমন, তাড়কাবধ, রামের হরধনুভঙ্গ এবং সীতার বিবাহ। শ্যামরায়-মন্দিরের মতো এখানেও কিছু কিছু অদ্ভুত আকৃতির পৌরাণিক জীবজন্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। এছাড়া বন্দুকধারী সৈন্যদের নৌযুদ্ধ,কর্তব্যরতা স্ত্রীর স্বামীর পদসেবা প্রভৃতি বৈষয়িক দৃশ্যও টেরাকোটায় প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলি ছাড়া এই মন্দিরে বিভিন্ন জীবজন্তুর চিত্র, যেমন পলায়মান মৃগ, বানরদের লম্ফ-ঝম্ফ, বাঘের ডাক, বন্যশূকর জীবন্তরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। একস্থানে (উত্তরে) খিলানপথের ওপরে লঙ্কাযুদ্ধের জ্বলন্ত দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বানরদল ও রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। দশাবতার ও দিক্‌পালদের টেরাকোটা-ফলকও এখানে আছে। কোন কোন স্থানে দেওয়ালের নিম্নাংশে অভিজাত বাবুবিলাসের দৃশ্যও উপস্থিত। একটি বিশাল আকারের প্রায় তিন ফুট উচ্চতার ষড়ভুজ কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গমূর্তি গর্ভগৃহের দেওয়ালে বর্তমান, যা সাধারণতঃ কোন মন্দিরে দেখা যায় না। মহাপ্রভুর বিধ্বস্ত 'জোড়বাংলা' মন্দিরও কেষ্টরায়ের মন্দিরের অনুরূপ ছিল বলে মনে করা যায়। এটি গোপাল সিংহের রাজত্বকালে ১৭৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে কারও কারও ধারণা। (দ্রষ্টব্য, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১ পৃ, ৯৩)

বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' ছাড়া অপর একটি 'পঞ্চরত্ন' গোয়ালপাড়ার মদনগোপালের। এটি পাথরে তৈরি। দেওয়ালে পদ্মফুলের কিছু ভাস্কর্য ছাড়া অন্য কোন মূর্তিভাস্কর্য নেই। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন প্রথম রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহের মহিষী শিরোমণি বা চূড়ামণি। ৯৭১ মল্লাব্দ বা ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বসুপাড়ায় শ্রীধরের 'নবরত্ন' মন্দির বিষ্ণুপুরে এই শৈলীর একমাত্র মন্দির বলে কেউ কেউ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য,উক্ত গ্রন্থ, পৃ,৯১)। এটি স্থানীয় বসুবংশের কোন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত। টেরাকোটার কিছু মূর্তিফলক মন্দিরের পুবদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ। এর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সেযুগের বন্দুকধারী য়ুরোপীয় সৈনিকদেরও কিছু মূর্তি এখানে স্থান পেয়েছে। বিষ্ণুপুরের 'খড়বাংলাপাড়া'য় রাধাবিনোদ ও রাধারমণের মন্দিরদুটি 'আটচালা' রীতির, যদিও প্রথমটির সামনের অংশ বহুকাল আগে বিধ্বস্ত। এগুলি পূর্বোক্ত বিষ্ণুপুরী কাটাচাল আটচালা -রীতিতে নির্মিত হয়। ৯৬৫ মল্লাব্দ বা ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে রাজা রঘুনাথ সিংহের মহিষী এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ওপরের আলোচিত মন্দিরগুলি থেকে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্মের যে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ষোল শতকের শেষ থেকে এখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সময় শ্রীনিবাসাচার্য মল্লভূম-বিষ্ণুপুরে মল্লরাজ বীর হাম্বিরকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। তার পূর্বে সম্ভবতঃ এঁরা শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর শিব এঁদের কুলদেবতা ছিলেন। এটা জানা যায় মল্লেশ্বর মন্দিরের লিপিতে 'কুলীনাথ' এই কথাটি থেকে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বীরহাম্বির প্রথম যে দেবসৌধটি স্থাপন করেছিলেন, সেটি বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাসমঞ্চ (১৬০০ খ্রী), যার মধ্যে আমরা প্রথম মহাপ্রভুর নামসংকীর্তনের টেরাকোটা-ফলক লক্ষ্য করি। পরবর্তী মল্লরাজারা সব মন্দিরই রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। ইঁট ও পাথরে তৈরি এই সব মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে মহাসমারোহ ঘটেছিল, তা আজও সমগ্র বাংলায় আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে। এদের সমকক্ষ

আর কোন মন্দির পশ্চিম বাংলা তথা বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনাথের ভগ্ন 'নবরত্ন'টিকে (বেশির ভাগ 'রত্ন'ই ভগ্ন, ১৭৫২ খ্রী.) কেউ কেউ 'জোড়বাংলা' বা 'শ্যামরায়' মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এই তুলনা সমীচীন নয়।

বিষ্ণুপুরের বাইরে বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত মন্দিরগুলিও শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকে নয়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। শেষমধ্যযুগে বাংলার মন্দির-শৈলী ও মন্দিরাশ্রিত অলংকরণের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী বিপ্লব উপস্থিত হোল, বিষ্ণুপুরে সতেরো শতকের আরম্ভ থেকেই তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের রসধারায় স্নাত হয়ে সেই স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ ঘটল গৌড়বঙ্গের এই অংশেই। এরই প্রভাবমন্ডলে মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় পরবর্তীকালের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সেগুলির মধ্যে পড়লেও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে যে 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার অনুসরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরের শেষ মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলি এই বাঁকুড়ার 'আদর্শের' অনেকটাই অনুসরণ করেছিল বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে থাকায়।

৮

মেদিনীপুরের মন্দির সমীক্ষা

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণপার্শ্ব সংলগ্ন মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মন্দিরের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সীমান্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত মেদিনীপুর জেলায় অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল মধ্যযুগ থেকে। তার মধ্যে ওড়িশী ও বাংলা এই দুই শৈলীর মন্দিরের অভূতপূর্ব বিকাশ এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। তিন ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি গৌড়বঙ্গীয়, ওড়িশী ও আদিবাসী সংস্কৃতির সমন্বয় মেদিনীপুর জেলার মতো বাংলার আর কোন জেলায় হয়নি। এই জেলার মন্দিরশিল্পের ক্রমবিকাশে এই সংস্কৃতি-সমন্বয় তাই একসময় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জেলার উত্তর আর উত্তর-পূর্বাংশে প্রাচীন বঙ্গীয় সংস্কৃতি, দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল ওড়িশার আওতায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে ঐ অঞ্চলে ওড়িশী সংস্কৃতি এবং পশ্চিমাংশের অরণ্যানী সমাকীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসী সংস্কৃতি বিকাশলাভ করেছে দীর্ঘকাল ধরে। এই তিন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র মেদিনীপুর জেলায় মন্দিরশিল্পের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছে পূর্বোক্ত দুটি নির্দিষ্ট শৈলীর মধ্য দিয়ে। মেদিনীপুর জেলায় পাল-সেন যুগের 'শিখর' মন্দির নির্মাণের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পাল-সেন যুগে প্রচলিত সু-উচ্চ 'নাগর'-রীতির অলঙ্কৃত শিখর-মন্দিরের বদলে ওড়িশায় বিবর্তিত 'নাগর' শৈলীর প্রাচীন 'রেখ' ও 'ভদ্র' রীতির মন্দির এই জেলায় অধিক সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে, চৈতন্যপরবর্তী যুগে 'চালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'দেউল' এবং 'রত্ন'-মন্দিরগুলির যে অভূতপূর্ব বিকাশ সারা বাংলায় মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তন করে এবং যার উল্লেখযোগ্য বিকাশকেন্দ্ররূপে বর্ধমান, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়, মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্বাংশে সেই 'বাংলা' রীতির মন্দিরের সবিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। এই দুটি শৈলীর বিকাশক্ষেত্ররূপে এই জেলার দুটি ভৌগোলিক সীমা চিহ্নিত করা যেতে পারে। এক, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম ভূভাগ যেখানে প্রধানত ওড়িশী 'শিখর' মন্দিরের আধিক্য। দুই, উত্তর ও পূর্ব ভাগ যেখানে 'বাংলা'-শৈলীর মন্দিরের সর্বাধিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুর জেলার মন্দিরগুলি এই দুটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিপুল সংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল দুটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের ইতিহাসে এই কারণে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্ব খুবই বেশি।

এই জেলার বেশির ভাগ মন্দিরই নির্মিত হয়েছে শেষ-মধ্যযুগে। কিন্তু আদিমধ্যযুগের মন্দিরের অস্তিত্বও এই জেলার বিস্তীর্ণ ভূভাগের কোন কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনকালে এখানের ভূখণ্ডে মন্দিরস্থাপত্যশৈলী কীরূপ ছিল, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না করা গেলেও বিভিন্ন যুগে এই জেলার নানাস্থানে যে অনেক মন্দির-দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। কয়েকজন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণী থেকে জানতে পারা যায়, প্রাচীনকালে এখানে বিশেষ করে তাম্রলিপ্তে বেশ কিছু হিন্দু মন্দির ছিল। ফা-সিয়েন, সুয়ান সাঙ্ প্রমুখ পরিব্রাজক তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামগুলির সঙ্গে অনেক হিন্দু মন্দিরও দেখেছিলেন। সুয়ান সাঙের (সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ) বিবরণী থেকে জানতে পারা যায়, সে-সময় তিনি পঞ্চাশটি হিন্দুমন্দির তাম্রলিপ্তে দেখেছিলেন। কিন্তু সেসব মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী কীরূপ ছিল, তা আজ আর জানার কোন উপায় নেই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের

বিষয়, মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় এবং বর্ধমান ও চব্বিশপরগণায় পাল-সেন যুগের যে কয়েকটি মন্দির তাদের অস্তিত্ব এখনও বজায় রেখেছে, এই জেলায় সে-সময়ের কোন মন্দিরের অস্তিত্ব কিন্তু আজও নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে এই জেলায় বেশ প্রাচীন কয়েকটি মন্দিরের অস্তিত্ব জানতে পারা গেছে। এগুলি হোল, ঢেকিয়ার ঝাড়েশ্বর (খড়্গপুর), খড়্গপুরের খড়্গেশ্বর (দুটিরই 'বাঢ়' অংশ প্রাচীন, 'গণ্ডী' ও অন্যান্য অংশ নবীকৃত), জিনশহরের (খড়্গপুর) পরিত্যক্ত ও ভগ্ন দেবালয় এবং ডাইনটিকরির (বিনপুর) তথাকথিত রঙ্কিণীদেবীর মন্দির। ডাইনটিকরির মন্দির 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' রীতির এবং এখনও অক্ষত। এই মন্দিরগুলির সবই মাকড়া পাথরে তৈরী। ঢেকিয়া ও খড়্গেশ্বরের মন্দির 'শিখর'-রীতির ছিল যার 'গণ্ডী' অংশ ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। অপরপক্ষে, জিনসহরের মন্দিরশৈলীর সঠিক ধারণা করা কঠিন। সংকীর্ণ গর্ভগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণপথ এবং সামনে দুটি পার্শ্বপ্রকোষ্ঠসহ (যার একটি ভগ্ন) ভগ্ন 'মুখমণ্ডপ' (যদিও এই মুখমন্ডপের অনেকটাই বিধ্বস্ত) এখনও লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির ওপরের অংশ বহুকাল বিধ্বস্ত। দেওয়ালে 'পঞ্চ রথ' বিন্যাস এবং দু'দিকের দেওয়ালে 'পুরুষসিংহ' ও সিংহমূর্তির দুটি অস্পষ্ট ভাস্কর্য নিঃসন্দেহে প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। ঢেকিয়ার মন্দিরে 'বাঢ়' অংশের 'জাংঘে' যে শূন্য চৈত্য লক্ষ্য করা যায়, সেখানে পূর্বে কোন মূর্তিভাস্কর্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। ডাইনটিকরির মন্দিরের 'তলজাংঘের' 'রাহা' অংশগুলিতেও এধরণের চৈত্য দেখা যায়। এই সব চৈত্যের উপরিভাগে কলশ চিহ্নিত আছে। মন্দিরটির ছাদ সাতটি পিঢ়ার সমষ্টি এবং গর্ভগৃহ খুবই সংকীর্ণ। উপরি উল্লিখিত মন্দিরগুলির ভিতরের ছাদ সবই 'লহরা' করা।

এই মন্দিরগুলি ছাড়া মেদিনীপুর জেলার আরও কয়েকটি লুপ্ত প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা গেছে। এগুলির সবই এই জেলার পশ্চিমাংশে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অবস্থিত ছিল। রোহিণীর (শাঁকরাইল থানা) ভৈরবডাঙার উঁচু ঢিবিটি একটি উচ্চ 'শিখর'-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বলে জানা যায়। ধ্বংসস্তূপের নীচে মাকড়া পাথরের দেওয়ালে 'রথ'-বিন্যাস ও পা-ভাগের মোলডিং এখনও লক্ষ্য করা যায়। এটি সুবর্ণরেখার সন্নিকটবর্তী। উল্লেখ্য, ওপারে রামেশ্বরনাথের উচ্চ 'শিখর' মন্দিরটি অবস্থিত। গিধনির সন্নিহিত নুনিয়ায় (জাম্বনী) বিধ্বস্ত জগন্নাথ মন্দির (বর্তমানে এটিকে একেবারে ভেঙে দিয়ে নূতন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে) এবং অদূরবর্তী পরিহাটিতেও (বিনপুর) জগন্নাথের একটি মন্দির ছিল। শিলদার (বিনপুর) সন্নিহিত ওড়গোন্দায় এবং কেশিয়াড়ি থানার কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে লুপ্ত 'শিখর' মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এসব স্থানে একাধিক বৃহৎ 'আমলক' খণ্ড লক্ষ্য করা গেছে। কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে মাকড়া পাথরের ছোট ছোট অনেক 'প্রতিকৃতি দেউল' মৃৎপ্রোথিত ছিল (বর্তমানে সেগুলির বেশির ভাগই অপসারিত)। এই প্রান্তরে পতিত একটি বৃহৎ আমলক প্রস্তর এটাই প্রমাণ করে, কোন না কোন সময়ে এখানে একটি উচ্চ 'শিখর' মন্দির অবস্থিত ছিল। হয়তো তারই চার পাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিকৃতি মন্দিরগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। কিয়ারচাঁদের আরও পশ্চিমে পাথরকাটি গ্রামে (শাঁকরাইল) 'প্রস্তরপুরী বিহার' নামে পরিচিত মাকড়া পাথরের যে প্রাচীন ইমারতের ধংসাবশেষ ও কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি বর্তমান গ্রন্থকারকর্তৃক দৃষ্ট হয়েছে, সেটিও একটি প্রাচীন মন্দির বা বিহারের ধ্বংসস্তূপ বলে অনুমান করা যায়। এইসব ধ্বংসাবশেষ বা মন্দিরের অংশ থেকে এটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে, মেদিনীপুর জেলায় প্রাচীনকাল থেকেই বিহার ও মন্দির-নির্মাণরীতি প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে, জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমাংশে বিহার ও মন্দির-নির্মাণ বেশ কিছুকাল ধরে

চলেছিল।

মুসলমান-আক্রমণের আগে পাল-সেন যুগের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উচ্চ 'শিখর' মন্দির এই জেলাতেও নির্মিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া ও সোনাতপল, পুরুলিয়ার বড়াম, বর্ধমানের সাতদেউলিয়া, বরাকর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জটার মতো সেই সময়ের অলঙ্কৃত উচ্চ 'শিখর' মন্দির এই জেলায় একটিও পাওয়া যায় না। অবশ্য, জৈন বা বৌদ্ধ বিহারের উপস্থিতি ওপরের আলোচনা থেকে কিছুটা অনুমান করা যাচ্ছে। জিনশহরের মন্দিরকে একটি প্রাচীন জৈন বিহার বলে অনুমান করলে অসঙ্গত হয় না। এই স্থানের একটি পাথরের ফ্রেমে কয়েকটি জৈনমূর্তি চিহ্নিত আছে দেখা যায়। জিনশহর নামটিও এক্ষেত্রে তাৎপর্যবহ। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে জৈনধর্ম যে এককালে বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন ভাস্কর্যের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন পরিহাটি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। জৈনমূর্তি আরও পাওয়া গেছে জেলার নানা স্থান থেকে। উত্তর- পশ্চিমে বগড়িডিহিতে (গড়বেতা) আবিষ্কৃত জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তিটি (আঃ ১০ম শতাব্দী) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পক্ষান্তরে, বুদ্ধমূর্তির সংখ্যাও কম নয়। এই জেলার স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রসারও হয়েছিল প্রাচীনকালে। চন্দ্রকোণা ও উত্তরবাড়ে (দাসপুর) কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া বিষ্ণু ও সূর্যের প্রাচীন মূর্তিও এই জেলার নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব মূর্তি প্রাচীনকালে কোন না কোন মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। এই জেলার বহু মন্দিরে অনেক প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি এখনও লক্ষ্য করা যায়। পাথরের মূর্তির অনেকগুলিতে প্রাচীন বাংলার পিঢ় বা ভদ্র-রীতির দেউল চিহ্নিত দেখা যায়। অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পাণ্ডুলিপি থেকে (১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত) যেসব মন্দিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করেছেন, তার মধ্যে প্রাচীন বাংলার দণ্ডভুক্তির যজ্ঞপিণ্ডিলোকনাথের একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে। সেটি প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত 'স্তূপশীর্ষভদ্র' রীতির বলে জানা যায়। (দ্রষ্টব্য, Architecture of Bengal, Book 1, 1976/ S. K. Saraswati, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩)। প্রাচীন দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও তৎসংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও ওড়িশার বালেশ্বর নিয়ে গঠিত ছিল বলে জানা যায়। এই দৃষ্টান্তটি থেকে মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর এক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত শিখর, পিঢ় বা ভদ্র, স্তূপশীর্ষ ভদ্র ও শিখরশীর্ষভদ্র- এই চার প্রকার মন্দির এই জেলাতেও নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

এই জেলার মন্দিরশিল্প প্রাচীনকালে, বিশেষত আদিমধ্যযুগে, দক্ষিণদিক থেকে আগত ওড়িশার 'শিখর'-মন্দিরশৈলীর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল, একথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে, বিশেষ করে, মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে ওড়িশার যোগসূত্রটা সেসময় খুবই ঘনিষ্ঠ থাকায় ওড়িশী-রীতির 'শিখর'-মন্দির (যা প্রাচীন ভারতের 'নাগর' রীতিরই এক বিবর্তিত রূপ) এই জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের ওড়িশা-সংলগ্ন অঞ্চলে নির্মিত হ'তে থাকে, বাঁকুড়া ও বর্ধমানেও এই শৈলী ক্রমপ্রসারিত হয়। মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন শিখরমন্দিরগুলির সবই তাই ওড়িশী 'নাগর'-রীতিতে নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার খুব কম জেলাতেই এখানকার মতো খাঁটি ওড়িশী রীতিতে তৈরি মন্দির দেখা যায়। এই ওড়িশী শিখরমন্দিরশৈলীর দুই ভিন্ন প্রবাহ বা রূপ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানাসংলগ্ন ওড়িশার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলা থেকে এই জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। এই দুই ভিন্ন রূপের

একটি হোল, ময়ুরভঞ্জের খিচিং-এ বিকশিত একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভঞ্জরাজাদের শাসনকালে 'মুখমণ্ডপ'-বর্জিত শিখর-রীতি। (দ্রষ্টব্য), Note on Some Ancient Monuments of Mayurbhanj-R. P. Chanda, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, June, 1927.। এই রীতির প্রচলন বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে এবং বাঁকুড়া ও বর্ধমানে হয়েছিল (দ্রষ্টব্য, Indian Architecture, Brown Vol 1, পৃষ্ঠা১৪৯)। মেদিনীপুর জেলায় এই রীতির প্রাচীন মন্দির খুব কম হলেও পরবর্তীকালে এই জেলার নানা স্থানে নির্মিত সরলীকৃত দেউলরূপটির সঙ্গে (মুখমণ্ডপ-বর্জিত) এই রীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই দেউলগুলি আঠারো-উনিশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছে বেশি এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে এগুলির রূপও বহুলাংশে পরিবর্তিত। খিচিং শৈলীর এক প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায় গিলাকাঁটিয়ার (গোপীবল্লভপুর থানা) তথাকথিত মদনমোহনের ইঁটের পরিত্যক্ত মন্দিরে। উল্লেখ্য, এই স্থান ময়ূরভঞ্জ জেলার প্রান্তবর্তী। 'জগমোহন'-বর্জিত এই দেউলটি খিচিংশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ, এরই প্রায় দশ কিলোমিটার পূর্বে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী রামেশ্বরনাথের মন্দিরটিতে জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ যুক্ত রয়েছে দেখা যায়। ওড়িশী শিখরশৈলীর দ্বিতীয় রূপটি 'বিমান' বা মূল শিখর মন্দির এবং তার সম্মুখ-সংলগ্ন জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। 'বিমান' ছাড়া বাকি সবগুলি পিঢ় বা ভদ্ররীতিতে তৈরী। মেদিনীপুর জেলার এই রীতির মন্দিরগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাট-মন্দির ও ভোগমণ্ডপ দেখা যায় না। এই জেলার নানাস্থানে এই রীতির মন্দির বেশ কিছু নির্মিত হয়েছে। তাদের জগমোহনের সঙ্গে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 'বারদুয়ারী' নাটমন্দির যুক্ত হয়েছে। মূলমন্দির বা বিমানও কোন কোন ক্ষেত্রে শিখররীতির না হয়ে পিঢ় রীতির হয়েছে, যেমন কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা (এখানকার বারদুয়ারী নাটমন্দির লক্ষণীয়)।

এই দ্বিতীয় রীতির মন্দিরগুলির বেশিরভাগই মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কয়েকটি অবশ্য উত্তরাংশেও লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণাঞ্চলের স্থানগুলি হোল, সহস্রলিঙ্গ বা সন্তনি ও দেউলবাড় (নয়াগ্রাম), কেশিয়াড়ী, দাঁতন, এগরা, বাহিরী (কাঁথি) প্রভৃতি। উত্তরাঞ্চলের স্থানগুলি কর্ণগড় (শালবনী), ধলহরা ও কুঁয়াই (কেশপুর), গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা (রঘুনাথবাড়ি)। একমাত্র কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা ও বাহিরীর পরিত্যক্ত জগন্নাথ মন্দির ছাড়া কোন স্থানের মন্দিরেই লিপি নাই। বাহিরী (১৫৮৪ খ্রীঃ) ও কেশিয়াড়ীর (১৬০৬-১৬১২ খ্রীঃ) মন্দির যথাক্রমে ষোল শতকের শেষ ও সতেরো শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। উল্লেখযোগ্য, বাহিরী ও কেশিয়াড়ীর মন্দিরে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ওড়িয়া লিপি আছে। সুবর্ণরেখার দক্ষিণতীরবর্তী নয়াগ্রাম থানার সন্তনি গ্রামের সহস্রলিঙ্গ ও দেউলবাড়ের রামেশ্বরনাথের মন্দির জগমোহন প্রভৃতি যুক্ত। এগরার হটনাগর ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত বলে জানা যায়। এটিই একমাত্র ইঁটের তৈরি। দাঁতনের শ্যামলেশ্বর ভদ্ররীতির। বাহিরীর মন্দিরও জগমোহনযুক্ত, তবে ভদ্ররীতির নয়। কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর ও মহামায়া, ধলহরার বটেশ্বর, কুঁয়াই-এর কামেশ্বর (স্থানীয়ভাবে এটি 'নেড়াদেউল' নামে পরিচিত), গড়বেতার সর্বমঙ্গলা এবং রঘুনাথবাড়ির (অযোধ্যা, চন্দ্রকোণা) রঘুনাথমন্দির জগমোহন যুক্ত। গড়বেতার সর্বমঙ্গলায় জগমোহনের সঙ্গে 'অন্তরাল' বা 'যোগমণ্ডপ' এবং একটি বৃহৎ 'চারচালা' নাটমন্দির (চতুর্দশদ্বারী) যুক্ত হয়েছে। গড়বেতায় কণ্ডরেশ্বর মন্দির 'ভদ্র'রীতির, কিন্তু জগমোহন নেই। নিকটবর্তী কানু গোঁসাই এর সমাধিমন্দিরও এই রীতিতে তৈরি। উল্লিখিত সব মন্দিরই আনুমানিক পনের শতক থেকে আঠারো শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। তবে এগুলির মধ্যে সহস্রলিঙ্গ, রামেশ্বরনাথ, কামেশ্বর ও গড়বেতার সর্বমঙ্গলা আরও প্রাচীন বলে

অনুমান করা যায়। সব মন্দিরেই পিষ্ট, বাঢ়, গন্ডী ও শীর্ষ নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত।

এই মন্দিরগুলি মেদিনীপুর জেলায় ওড়িশী শিখর বা পিঢ়রীতির স্থাপত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে বিবেচিত হলেও এরূপ খাঁটি ওড়িশী রীতির মন্দির আরও পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে, যেমন, কেদার গ্রামে (এগরা) গিরিমোহান্তদের কেদার ভুড়ভুড়ির দেউল ও মাড়োতলায় (সত্যপুর, ডেবরা) সত্যেশ্বর দেউল। এই দুটি মন্দিরেই জগমোহন নেই। ডেবরা থানার কেদার গ্রামে কেদার ভুড়ভু ড়ির দেউল জগমোহন ও নাটমন্দির যুক্ত। কিন্তু সংস্কারের ফলে এটির আসল রূপ অনেকটা পরিবর্তিত। আবার ইঁটেরতৈরী রাজনগরের (পাঁশকুড়া) ঝাড়েশ্বরের দেউলটি অনেকটা পরিবর্তিত হলেও এতে ওড়িশী শিখর রীতির রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। ওড়িশী শিখরমন্দিরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তমলুকের বর্গভীমা, জিষ্ণুহরি, রামজীউ ও তমলুক রাজবাড়ির দেউলগুলিতে। প্রতিটির সঙ্গেই 'চারচালা' জগমোহন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু শীর্ষে আমলকের ওপর স্তূপের মতো একটি গোলাকার বস্তু বর্তমান, বিশেষ করে, বর্গভীমায় এটি সহজেই লক্ষ করা যায়। এটি কি প্রাচীন স্তূপশীর্ষ-ভদ্র বা দেউলের পরিবর্তিত রূপ? চারচালা জগমোহনযুক্ত অপর একটি দেউল মন্দির পাইকভেড়ির শ্যামসুন্দর (ভগবানপুর)। আবার মালঞ্চের (খড়গপুর) নন্দেশ্বর (১৭২০ খ্রীঃ), নিকটবর্তী চণ্ডীপুরের বীজেশ্বর এবং পঁচেটের (পটাশপুর) কিশোররায়ের শিখরমন্দিরের সঙ্গে যে জগমোহন যুক্ত রয়েছে তার চাল 'থাকে থাকে' সন্নিবদ্ধ হলেও চালার ভাবটি স্পষ্ট। শিখররীতির আরও বহু মন্দির এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে।

মেদিনীপুর জেলায় এই ওড়িশী রীতির মন্দিরগুলির সংখ্যাধিক্যের পশচাতে দুটি কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, এগারো শতকের শেষদিকে ওড়িশার রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সময় থেকে এই জেলার প্রায় সমস্ত অংশই ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ওড়িশী সংস্কৃতি এই জেলার বিস্তীর্ণ ভূভাগকে প্রভাবিত করেছিল। পরে বাংলাদেশে মুসলমান-বিজয়ের গোড়ার দিকে উৎকলরাজ অনঙ্গভীমদেবের সময়ে ওড়িশী সংস্কৃতি আরও প্রসার লাভ করে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই দুই দিকেই সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ওড়িশা রাজ্যের প্রভাবাধীন থাকে অন্তত ষোল শতকের মাঝামাবি মুকুন্দদেবের সময় পর্যন্ত সম্ভবত এই সময়ের মধ্যেই পূর্ব কথিত বিলুপ্তপ্রায় মন্দিরগুলি এবং আরও বহু মন্দির এই জেলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমাংশের বহু স্থানে নির্মিত হয়েছিল। কেশিয়াড়ী থানার গগনেশ্বর গ্রামে কুরুমবেড়া দুর্গে গগনেশ্বর শিবের যে ওড়িশী শিখরমন্দিরের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, সেটিও পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের শাসনকালে নির্মিত হয় বলে জানা গেছে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যখন মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত, সেসময়ে ওড়িশা ও বর্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্বাংশে ওড়িশার হিন্দু রাজাদের শাসন অব্যাহত। সুলতানী শাসন এই দিকে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। এর ফলে ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ওড়িশী রীতির 'শিখর'-মন্দির নির্মাণ নির্বাধে চলতে থাকে।

ওড়িশী শিখররীতি ছাড়া শেষ-মধ্যযুগের 'বাংলা'-রীতির মন্দির এই জেলায় নির্মিত হয়েছে অসংখ্য। পূর্বকথিত পরিবর্তিত দেউলরীতির মন্দিরও এই সময় অনেক তৈরী হয়েছে। এই জেলার 'চালা' 'চাঁদনি, 'রত্ন' ও পরিবর্তিত ওড়িশী 'দেউল' মন্দিরগুলি উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশেই সর্বাধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে সতেরো শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ওড়িশী শিখর মন্দিরের ধারা যেমন দক্ষিণে ওড়িশা থেকেএই জেলার নানা অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল, শেষ-মধ্যযুগীয়

'বাংলা' মন্দিরশৈলীর প্রবাহও সেইরূপ উত্তরে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে গড়বেতা ও সংলগ্ন স্থানসমূহের মধ্য দিয়ে ক্রমশ পূর্বদিকে রূপনারায়ণ ও কংসাবতী-তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করেছিল। 'বিষ্ণুপুর-ঘরানা'র অন্ততঃ তিনটি প্রাচীন মন্দির গড়বেতা অঞ্চলে আছে— গড়বেতায় রাধাবল্লভের আটচালা (১৬৮৬ খ্রীঃ), উড়িয়াশাহীর বিধ্বস্ত মন্দির (১৬৯০ খ্রীঃ) এবং রঘুনাথবাড়ির (বগড়ি) পরিত্যক্ত নবরত্ন (আ: ১৭ শতকের শেষ)। গোয়ালতোড়ের সনকার 'চারচালা'ও এই সময়ের বলে মনে করা হয়। উক্ত মন্দিরগুলি মাকড়া পাথরে তৈরি। রঘুনাথবাড়ির মধ্যে ভাস্কর্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গড়বেতাসহ কাড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল। পরে আঠারো শতকের শুরু থেকে বিষ্ণুপুর-শৈলীর 'চালা' ও 'রত্ন' মন্দির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে রূপনারায়ণ উপত্যকাসন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। পরবর্তীসময়ে বহু সংখ্যক ইঁটের ও টেরাকোটা-অলংকৃত মন্দির এই জেলার উত্তর ও পূর্বাংশে নির্মিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম-এই দু-ভাগে ভাগ করলে উত্তরে চন্দ্রকোণা থেকে দক্ষিণে দাঁতন পর্যন্ত যে একটি বিভাজনরেখা পাওয়া যায় (রেলপথও এই রেখার সমান্তরালে অবস্থিত), সেই রেখার পূর্বভাগে পূর্বোক্ত রীতির মন্দিরগুলির সর্বাধিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই অংশে উত্তর দিক থেকে শুরু করে চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, পাঁশকুড়া, তমলুক, পিংলা, ময়না, সবং, ভগবানপুর, পটাশপুর, কাঁথি থানাগুলি অবস্থিত। শিলাই, কাঁসাই, রূপনারায়ণ ও হুগলি নদীর পলিমাটিতে গড়া এই সব অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সব চেয়ে বেশি 'বাংলা'-রীতির মন্দির রয়েছে চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, পিংলা ও পাঁশকুড়া থানায়। চন্দ্রকোণার কয়েকটি মন্দির ও তার পাশাপাশি কিছু কিছু স্থান ছাড়া মন্দিরগুলি সবই ইঁটের তৈরী। চালা, চাঁদনী ও রত্নরীতির মন্দিরগুলি সবচেয়ে বেশী কেন্দ্রীভূত হয়েছে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ক্ষীরপাই ও জাড়ায় এবং দাসপুর থানার নানা স্থানে। এই সব স্থানে 'একচালা' ও 'দোচালা'-রীতির মন্দির একপ্রকার নেই বললেই চলে। অন্যত্রও খুবই বিরল। রামপুরে (দাসপুর) কালুরায়ের 'দোচালা' (আ: ১৯ শতক) ও পাইকপাড়ির (ডেবরা) সিংহবাহিনীর দোচালা নাটমন্দির, শিলদা রাজবাড়ির (বিনপুর) প্রবেশপথের ওপরও দোচালা লক্ষ করা যায়। দোচালার মতো 'চারচালা' অল্প না হলেও খুব বেশি বলা যায় না। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে খড়ের চালার বাঁকানো কার্ণিশ ও চালের ঢালু ভাবটি এসব মন্দিরে সুস্পষ্ট। সুন্দর চারচালা ও তৎসংলগ্ন চারচালা মুখমণ্ডপ কোন্নগরের (ঘাটাল) সিংহবাহিনী মন্দির। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, এইটি বাংলার 'চালা' শৈলীর প্রাচীনতম মন্দির (১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকারের বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে ১৪১২ শকাব্দ বা ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের লিপিটি প্রকৃত পক্ষে সংস্কারকালীন। ১৭১৭ শকাব্দ বা ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি যখন সংস্কার করা হয় তখন পোড়ামাটির দুটি লিপিফলক সন্নিবেশিত হয়। গঠন-বৈশিষ্ট্য ও টেরাকোটা অলংকরণ পর্যবেক্ষণ করে এটি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে মনে করা যেতে পারে। এই জেলার 'চারচালার' অপর একটি সুন্দর নিদর্শন গোয়ালতোড়ের সনকা। মাকড়া পাথরে তৈরি এই মন্দিরটির লিপি না থাকলেও গঠনবৈশিষ্ট্যে এটি সতেরো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে করা যায়। 'চারচালা'র অপর নিদর্শনগুলি চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাড়ির রঘুনাথের 'তোষাখানা'। এটিও মাকড়া পাথরের এবং আনুমানিক আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি। জয়ন্তীপুরে (চন্দ্রকোণা) রাধাবল্লভ ও রঘুনাথপুরের (চন্দ্রকোণা) মন্দিরদুটিও চারচালা। এগুলি

ছাড়া কেশপুর থানার মোষদায় বিশালাক্ষী (১৭৬৩ খ্রীঃ), অজিড়িয়ায় (দাসপুর) সাঁইদের 'রথ'বিন্যাসযুক্ত মনসার চারচালা এবং বিনপুর থানার শিলদা ও জয়পুরেও কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি চারচালা আছে। দেউলমন্দিরের সঙ্গে 'চারচালা'র 'জগমোহন'রূপে ব্যবহারও হয়েছে। যেমন, পাইকভেড়ি (ভগবানপুর) এবং বর্গভীমা (তমলুক)। সমাধি মন্দিরের ক্ষেত্রে এই শৈলীটি জেলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একসময়, বিশেষ করে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। ডিহিবলিহারপুরে (দাসপুর) গিরিধারীলাল গোস্বামীর 'চারচালা' সমাধিমন্দির বেশ প্রাচীন বলে মনে হলেও লিপির অভাবে সঠিক কাল নিরূপণ করা কঠিন। এই শৈলীর সমাধি মন্দির আরও আছে রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা), তমলুক (মহাপ্রভুবাড়ি) এবং গোপীবল্লভপুর বৈষ্ণবমঠের সমাধিক্ষেত্রে।

'আটচালা' মন্দির সর্বাধিক নির্মিত হয়েছে এই জেলায়। শুধু সংখ্যায় নয়, আটচালার বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায় অনেক স্থানে। আয়তন ও গঠনেও আটচালার বৈচিত্র্য বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে নীচের চারচালাটি ওপরের তুলনায় এত বড়ো যে ওপরের চালাটিকে শুধুমাত্র অলংকরণমাত্র মনে হয়। এই জেলার আটচালার অন্য একটি রূপ দেখা যায় ওপরের চালাটি একটি পৃথক কক্ষের আকার না নিয়ে চারচালার ওপরের চারিদিক কেটে দিলে যেমন দেখায়, সেইরূপ। অনেক খড়ের চালার ওপরের চারপাশ এইভাবে কাটা থাকে, তাতে ওপরের অংশকে একটি আলাদা চালার মতো দেখায়। বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে এই রীতির সূত্রপাত বলে কেউ কেউ মনে করেন (দ্রষ্টব্য, 'বাংলার মন্দির'- পঞ্চানন রায়)। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা এই রীতির কিছু কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, Late Mediaeval Temples of Bengal, Mccutchion, পৃষ্ঠা৩২)। এধরণের আটচালা মন্দিরস্থপতিদের কাছে 'বিষ্ণুপুরী আটচা'লা নামে পরিচিত ছিল। (দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৬)। এই জেলার 'বিষ্ণুপুরী আটচালা'র নিদর্শন, গড়বেতার রাধাবল্লভ (১৬৮৬) এবং সম্ভবত উড়িয়াশাহীর (গড়বেতা) মন্দির (১৬৯০ খ্রীঃ)। অপর দৃষ্টান্ত শিলদার (বিনপুর) কিশোর-কিশোরী (১৮২০ খ্রীঃ) ও রাজার গড়ের (কর্ণগড়) পরিত্যক্ত মন্দির। মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে এই রীতিটি প্রচলিত হলেও অন্যত্র তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। অবশ্য, ঘাটাল মহকুমার কোন কোন স্থানে এই রীতির মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। আটচালার অপর একটি রূপ হোল, নীচের চালাটি অনেক ক্ষেত্রে বেশ খাড়া ও উঁচু হয়ে ওঠার পর ওপরের চালাটি খর্বাকৃতি হয়। অনেক সময় শীর্ষে তিনটি স্তূপিকা বা শিখা (ফিনিয়েল) বসানো থাকে। এই রীতির মন্দির জেলার নানা স্থানে নির্মিত হয়েছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উনিশ শতকের দিকে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নির্দশনঃ (১) শীতলানন্দ (ক্ষীবপাই, হাটতলা, ১৮৩৯ খ্রীঃ) ও খড়কেশ্বর (ক্ষীরপাই,কদমকুণ্ডি ১৮৬১ খ্রীঃ), উমাপতি (গঙ্গাদাশসপুর, চন্দ্রকোণা, আ: ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), তারকনাথ (গোবিন্দপুর, পাঁশকুড়া, ১৮৮১ খ্রীঃ) এবং শীতলানন্দ (ছয়রসিয়া, পাঁশকুড়া, ১৮৯৮ খ্রীঃ)। অপর একটি রূপ, ওপরে একটি পৃথক কক্ষযুক্ত চালা। বাসুদেবপুরে (দাসপুর) রণরামের মন্দির এর একটি নিদর্শন ছিল। বহুকাল আগে মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই জেলার বৃহদায়তন আটচালাগুলি নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, যেমন খুকুড়দহের শিব (দাসপুর, আ: ১৯ শতক) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২২ ফুট ৬ ই. X ২২ফুট ১ই. এবং আ: উচ্চতা ৪৫ ফুট, লালজিউ (চন্দ্রকোণা, রঘুনাথবাড়ি, আ: আঠার শতকের প্রথমার্ধ)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৩৬ ফুট ৯ ই. X ২৪ফুট এবং আ: উচ্চতা ৪০ ফুট, রাধাগোবিন্দ (চাঁইপাট, দাসপুর, ১৭৫৯ খ্রীঃ)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৩ ফুট X ২০ফুট ২ই এবং আ: উচ্চতা ৪৫ ফুট, জগন্নাথ (তমলুক, হরিরবাজার)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৩৩ ফুট ১১ ই.

X ২৮ফুট ১১ ই. এবং আ: উচ্চতা ৫০ ফুট, জগন্নাথ (রামবাগ, মহিষাদল ১৭১০ খ্রীঃ)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪১ ফুট ৬ ই. X ৩৭ফুট ২ ই. এবং আ: উচ্চতা ৬০ ফুট, রামসীতা (বাসুদেবপুর, এগরা)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৭ ফুট ৫ ই. X ২৬ ফুট এবং আ: উচ্চতা ৫০ ফুট এবং শ্যামাঠাকুরাণী (মালঞ্চ, খড়্গপুর, ১৭১২ খ্রীঃ)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৫ ফুট ৫ ই. X ২৩ ফুট এবং আ: উচ্চতা ৪৬ ফুট ৬ ই.। আটচালার সঙ্গে মুখমণ্ডপরূপে অপর একটি আটচালাও যুক্ত দেখা যায়, যেমন, কুশপাতার (ঘাটাল) শিবমন্দির।

'বারো চালা' রীতির মন্দিরের প্রচলন খুব কমই হয়েছে মেদিনীপুর জেলায়। এই শৈলীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত, জলসরার (ঘাটাল) জলেশ্বর এবং নতুক-জয়কৃষ্ণপুরে (ঘাটাল) সাঁতরাদের দুটি মন্দির। অপর একটি মন্দির এগরা থানার চিরুলিয়ার রামচন্দ্রের মন্দির (১৮৪৩ খ্রীঃ, দ্রষ্টব্য, ম্যাক্‌কাচ্চন,পৃষ্ঠা ৪০)।

বার চালার মতো 'জোড়বাংলা'-শৈলীটিও এই জেলায় তেমন দেখা যায় না। সর্বপ্রাচীন মন্দিরটি চন্দ্রকোণার দক্ষিণবাজারে অবস্থিত। মাকড়া পাথরে তৈরী পরিত্যক্ত ও ভগ্ন এই মন্দিরটি সতেরো শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। বারান্দার ভিতরে, গর্ভগৃহে ও বাইরের দেওয়ালে মূর্তি খোদিত। মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। অপর নির্দশন লালগড় রাজবাড়ির (বিনপুর) রাধাকৃষ্ণ , জেলেপাড়ার (মেদিনীপুর শহর) ধর্মের মন্দির এবং পাইকপাড়ির (ডেবরা) প্রামাণিকদের সিংহবাহিনী (১৮১৬ খ্রীঃ, পরিত্যক্ত)

চালার ন্যায় 'চাঁদনি' নামে এক রীতির মন্দির এই জেলায় প্রচুর নির্মিত হয়েছে। কেউ কেউ এই রীতির মন্দিরকে 'দালান' নামে উল্লেখ করেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, দালানের সঙ্গে 'চাঁদনি'র এক সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। আকার ও আয়তনের দিক থেকে চাঁদনি ও 'দালান' পৃথক বলেই মেদিনীপুরের মন্দিরস্থপতিরা এই দুটি স্বতন্ত্র রীতিকে 'চাঁদনি' ও 'দালান' এই দুই ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। মন্দিরলিপিতেও তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। প্রকৃত দালানকে তাঁরা লিপিতে 'দালান' ও প্রকৃত 'চাঁদনি'কে তাঁরা লিপিতে 'চাঁদনি' বলে উল্লেখ করেছেন। ক্ষীরপাই এর (চন্দ্রকোণা) 'হাটতলায়' শিবপ্রসাদ দের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের (১৮৬৪ খ্রীঃ) টেরাকোটা লিপিতে 'চাঁদনি' এই কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রামজীবনপুরের পুরাতনহাটে নন্দীদের কালীর ভগ্ন মন্দিরে সংস্কারকালীন যে লিপি আছে, তাতে 'চাঁদনি' এই কথাটি পাওয়া যায়। তমলুকের হরির বাজারে জগন্নাথ ও রামজীউ মন্দিরের সামনে যে নাটমন্দিরদুটি বর্তমান, সেখানেও 'চাঁদনি' এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চাঁদনি দুটি তৈরী করেন হুগলি জেলার সেনহাটীর অশ্বিনীকুমার মিস্ত্রী ১৯২০ সালে। চাঁদনি রীতির মন্দির প্রায় সবই ক্ষুদ্র, আয়ত বা বর্গক্ষেত্রাকার, সমতল ছাদ ও সরল কার্ণিশ যুক্ত। সামনের বারান্দার দুটির বেশী খিলানপ্রবেশপথ থাকে না এবং গর্ভগৃহের একটিমাত্র প্রবেশপথ। উল্লিখিত লিপিযুক্ত মন্দিরগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ফারসী 'দালান' শব্দটির 'লম্বা পাকা ঘর', 'পাকাবাড়ি', 'বারান্দা', 'দরদালান' এইসব অর্থ 'চলন্তিকা'য় (১৩৮০ সং, পৃ: ৩২৯) এবং 'লম্বাপাকা ঘর', 'পাকাবাড়ি', 'ঘরদালান', 'হলের মত ঘর' এই অর্থ 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' (১৯৬৬ সং, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১০০) পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লম্বা পাকা ঘর ও দরদালান অর্থেই 'দালান' শব্দটির বহুল প্রচলন হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্য-গুলি দালান মন্দিরগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। জাড়ার এই মন্দিরও লম্বা পাকা ঘর এবং সামনে বারান্দার ও গর্ভগৃহের প্রতিটির তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বর্তমান। আরও উল্লেখযোগ্য, ঐ দালানটির ছাদে একটি ছোট্ট চাঁদনিও স্থাপিত (চলন্তিকা মতে 'চাঁদনি' শব্দের অর্থ 'ছাদের উপরিস্থিত গৃহ', 'বঙ্গীয়শব্দকোষে' এটিকে 'প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ' বলা হয়েছে। 'চাঁদনি' ও 'দালানে'র পার্থক্যটি

এথেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়। 'চাঁদনি' মন্দিরগুলি মেদিনীপুর তথা পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে অসংখ্য নির্মিত হয়েছে ছাদের ওপরের ঘরের অনুকরণে। এই স্থাপত্যে চন্দ্রশালার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই মন্দিরশিল্পীর উদ্দেশ্য। সামনে স্তম্ভের ওপর বারান্দা সমতল ছাদযুক্ত আয়ত বা বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির গুপ্তযুগেও প্রচলিত ছিল। (দ্রষ্টব্যঃ Temple Architecture in the Gupta Age, S.K. Saraswati, Journal of the Indian Society of Oriental Art, vol. 7, 1940)। বাংলাদেশে আঠারো-উনিশ শতকে নির্মিত চাঁদনি রীতির অসংখ্য দেবালয় গুপ্তযুগের সেই সমতল ছাদযুক্ত মন্দিরগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই 'চাঁদনি' মন্দিরের অনুকরণে সম্ভবত নদী বা পুকুরের বাঁধানো ঘাটের মুখে ঠিক এই ধরণের চারদিক খোলা চাঁদনি নির্মিত হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে, 'দালান' বলতে বহুদ্বারযুক্ত পাকা ঘরকে বোঝায়। ধনীদের বাসগৃহরূপে এই দালান নির্মিত হয়েছে। ধনী ব্যক্তি ও জমিদারেরা দুর্গা ও কালীপুজোর জন্য আঠারো-উনিশ শতকে অনেক 'দালান' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঐসব 'দালান' 'দুর্গাদালান' বা কালীদালান' নামে পরিচিত । যে কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম বা শহরে এই ধরণের 'দালান' মন্দির লক্ষ্য করা যায়। ডেভিড্ ম্যাককাচ্চনও ঐসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে সমতল ছাদ ও কার্নিশযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ঐ মন্দিরগুলিকে যে 'চাঁদনি' নামে উল্লেখ করেছেন, তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। (ম্যাক্‌কাচ্চন, পৃষ্ঠা, ১৫ ও ৬২)।

মেদিনীপুর জেলায় 'চাঁদনি' মন্দির এত বেশি তৈরী হয়েছে যে তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। এই মন্দির অধিক সংখ্যায় লক্ষ করা যায় চন্দ্রকোণা, জাড়াও রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা), দাসপুর, আমনপুর (কেশপুর) প্রভৃতি স্থানে। লিপিদৃষ্টে এই জেলার দাসপুর থানার ডিহিবলিহারপুরে অধিকারীদের রাধাকৃষ্ণের চাঁদনিটি সর্বপ্রাচীন (১৭২৪ খ্রীঃ)। কিন্তু এরও আগের যে চাঁদনি মন্দির ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চাঁদনির বহু নিদর্শনের মধ্যে রামকৃষ্ণপুরের (দাসপুর) গোঁসাইদের (১৭৮৪ খ্রীঃ), শিলদা রাজবাড়ির রাধাকৃষ্ণ (আ: ১৯ শতক), গোঁসাইবাজারের (চন্দ্রকোণা) 'দে'পরিবারের পরিত্যক্ত মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতল চাঁদনিও এই জেলায় বিরল নয়। কাটানের (ঘাটাল) প্রামাণিকদের, খাঞ্জাপুরের (দাসপুর) গুঁইপরিবারের ও দক্ষিণবাড়ের (দাসপুর) চক্রবর্তীদের, নতুক-জয়কৃষ্ণপুরের (ঘাটাল) সাঁতরাদের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলির বেশির ভাগই দ্বিতল পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। 'দালান' মন্দিরও খুব কম নির্মিত না হলেও সেগুলির বেশির ভাগ উনিশ শতকের দিকে নির্মিত হয়েছে। এগুলি সবই দুর্গা ও কালী দালান, অবশ্য লাওদার (দাসপুর) ভূতনাথ শিবের মন্দির 'দালান' রীতির। পক্ষান্তরে, 'চাঁদনি'তে রাধাকৃষ্ণ, দামোদর বিগ্রহই বেশি স্থান পেয়েছে। এই জেলায় 'দালান'-রীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত, নাড়াজোল-রাজবাড়ির দুর্গাদালান, রঘুনাথবাড়ির (পাঁশকুড়া) রঘুনাথ, ঘোষপুরে (পাঁশকুড়া) 'দে' পরিবারের লক্ষ্মীবরাহ প্রভৃতি। 'দালান' মন্দিরের থাম, খিলান, কারুকার্য প্রভৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য স্থাপত্যরীতির কিছু প্রভাব স্পষ্ট।

মেদিনীপুর জেলায় প্রশস্ত চাঁদনীর ওপর 'রত্ন' মন্দির সন্নিবেশের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই ধরণের মন্দিরের সব কটি ক্ষেত্রেই 'পঞ্চরত্নের' সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত, পিংলার পালচৌধুরীদের রাধাকান্ত (১৮৫৭ খ্রীঃ), পাইকভেড়ির (ভগবানপুর) মাইতিদের শ্যামসুন্দর (আ: ১৯ শতক, ১৭৩০ খ্রীঃ বিশ্বাসযোগ্য নয়) এবং ঈশ্বরপুরের (ঘাটাল) ঘোষেদের শ্রীধর (১৯ শতক)।

মেদিনীপুর জেলার 'রত্ন'-মন্দিরগুলি সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এত বেশি যে অল্পকথায় সে সকলের আলোচনা সম্ভব নয়। 'একরত্নে'র থেকে 'পঞ্চরত্নের' সংখ্যাই অধিক। 'নবরত্নের' স্থান

'পঞ্চরত্নের' পরেই। এয়োদশ, সপ্তদশরত্নগুলি বিরল। 'রত্ন' মন্দিরের অধিক সমাবেশ দেখা যায় চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, খড়ার, দাসপুর, নাড়াজোল, আনন্দপুর (কেশপুর), রাজবল্লভ (পিংলা), জলচক (পিংলা), লোয়াদা (ডেবরা) প্রভৃতি স্থানে। রঘুনাথবাড়ির (চন্দ্রকোণা) লালজীউমন্দিরে রক্ষিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, চন্দ্রকোণার 'ভান' রাজাদের আমলে গিরিধারীলালের 'নবরত্ন' মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। লিপিসাক্ষ্যে সেটিই এই জেলার প্রাচীনতম 'রত্ন' মন্দির ছিল। এখন তার কোন চিহ্নই নেই। দাসপুরে শ্যামরায়ের 'একরত্ন' (১৬৯৯ খ্রীঃ) বেশ কয়েক বছর আগে লুপ্ত। বর্তমান গ্রন্থকার মন্দিরটি দেখেছিলেন। উক্ত দুটি মন্দিরই লিপিসাক্ষ্যে এই জেলার প্রাচীনতম মন্দির ছিল বলে অনুমান করা যায়। এই জেলায় 'একরত্নে'র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন (প্রাচীনত্বের দিক থেকে) শ্যামরায় (ভগ্ন ও পরিত্যক্ত, রাণীর বাজার, আ: ১৭ শতকের শেষ), দাসপুরের গোপীনাথ (১৭১৬খ্রীঃ) ও মামুদপুরের (দাসপুর) কালী (ভগ্ন ও পরিত্যক্ত, আ: ১৮ শতক), রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) গোপীনাথ (আ: ১৮ শতকের প্রথম), শিরোমণির (শালবনী) সিংহবাহিনী (পরিত্যক্ত), রাজারগড়ের (কর্ণগড়,শালবনী) পরিত্যক্ত মন্দির (আ: ১৮ শতক), বলিহারপুরের (দাসপুর) গৌড়িবুড়ি (১৭৫৭ খ্রীঃ) ও ব্রজরাজকিশোর (১৭৭২ খ্রীঃ), বৈকুণ্ঠপুরের (দাসপুর) মদনমোহন (আ: ১৮ শতকের প্রথম) প্রভৃতি মন্দিরগুলি উল্লেখ যোগ্য। এগুলি ছাড়া আঠারো শতকের শেষ বা উনিশ শতকে নির্মিত গড়বেতার লক্ষ্মীজনার্দন, আনন্দপুরে (কেশপুর) কুণ্ডুদের রাধামাধব প্রভৃতি মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। আলঙ্গিরি (এগরা) ও মোহনপুরে (মোহনপুর) যথাক্রমে গোকুলানন্দকিশোর ও জগন্নাথের মন্দিরদুটির রত্ন বেশ দীর্ঘাকৃতি, (ম্যাক্‌কাচ্চন, পৃষ্ঠা ৪২)।

এই জেলায় 'পঞ্চরত্নে'র মধ্যে লিপিসাক্ষ্যে সর্বপ্রাচীন নবগ্রামের (ঘাটাল) সিংহবাহিনী (১৭০৯ খ্রীঃ)। এর পরেই মাকড়া পাথরে তৈরী রাধানগরের (ঘাটাল) গোপীনাথমন্দিরটি (পরিত্যক্ত) নির্মিত হয়েছিল (১৭১৮ খ্রীঃ)। দক্ষিণ ময়নাডালের (পাঁশকুড়া) মধ্বাচার্যমঠের রাধাগোবিন্দের মন্দির সংস্কারকালে ঐ মন্দিরেরই বিচ্যুত লিপিফলক থেকে জানা যায়, ১৭৩৮ খ্রীঃ নির্মিত হয়েছিল। দাসপুরে পালেদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৭৯১ খ্রীঃ), চেঁচুয়ার (দাসপুর) রাধাগোবিন্দ (১৭৮১ খ্রীঃ), মল্লেশ্বরপুরের (চন্দ্রকোণা) মল্লেশ্বর (মাকড়াপাথরে তৈরী আ: ১৮ শতক), নাড়াজোলের (দাসপুর) জয়দুর্গা (আ: ১৮ শতকের শেষার্ধ), শ্যামসুন্দরপুরের (পাঁশকুড়া) সিদ্ধিনাথ (বর্তমানে কোনলিপি নেই, ম্যাক্‌কাচ্চন-১৭৬৮ খ্রী, পৃষ্ঠা ৪৭), গোঁসাইবেড়ের (পাঁশকুড়া) রাধাবল্লভ (আ: ১৮ শতকের প্রথমার্ধ), রাজবল্লভ গ্রামে (পিংলা) পালিতদের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (আ: ১৮ শতক), বাসুদেবপুরের (দাসপুর) বিদ্যাবাগীশপাড়ার (বর্তমানে লুপ্ত) পঞ্চরত্ন (আ: ১৮ শতাকের শেষ), পূর্বগোপালপুরের (পাঁশকুড়া) রাধাগোবিন্দ, পাইকপাড়ির প্রামাণিকদের সিংহবাহিনী (১৭৭০ খ্রীঃ, বর্তমানে একরত্নে পরিণত) প্রভৃতি মন্দিরগুলি সবই আঠারো শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছে। উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য পঞ্চরত্নের নিদর্শন লোয়াদার (ডেবরা) বামুনবেড়ে পরিত্যক্ত মন্দির (১৮০৫ খ্রীঃ), শ্যামসুন্দরপুর-পাটনায় (পাঁশকুড়া) পাহাড়ীদের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (১৮১৩ খ্রীঃ), তিলন্ত পাড়ার (সবং) জানকীবল্লভ (১৮১১ খ্রীঃ), ক্ষীরপাইয়ের শীতলা ও রাধাদামোদর (১৮১৭ খ্রীঃ), কাণাশোলের (কেশপুর) ঝাড়েশ্বর (১৮৩৪ খ্রীঃ), জলচকের (পিংলা) রামচন্দ্র (১৮১৭ খ্রীঃ), গৌরায় (দাসপুর) হাঁড়াদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৮২৭ খ্রী), উত্তর ধানখালে (দাসপুর) ভুঁঞাদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৮৩৩ খ্রীঃ)। এই মন্দিরগুলি টেরাকোটার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। দাসপুর থানার আরও বহু 'পঞ্চরত্ন' উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্যন্ত

নির্মিত হয়। আনন্দপুরে (কেশপুর) বাগেদের ও সরকারদের 'পঞ্চরত্ন'দুটি এই শতকের শেষ দিকে তৈরি হয়। এগুলিতেও প্রচুর টেরাকোটা লক্ষ্য করা যায়।

এই জেলায় বর্তমান 'নবরত্ন' মন্দিরের মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে মনে করা যায় রঘুনাথবাড়ির (গোয়ালতোড়, বগড়ি) মাকড়াপাথরের পরিত্যক্ত মন্দির। উল্লেখ্য, এই মন্দিরের সব রত্নই 'চালার' ছাদের উপর সন্নিবেশিত। আনুমানিক সতেরো শতকের শেষ দিকে এটি নির্মিত হয়েছিল। এখানে প্রচুর ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নবরত্নগুলি জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। টেরাকোটা ও স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন— রাণাপুরের (দাসপুর) রঘুনাথ (১৮০১ খ্রীঃ) ও লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায় (১৮০১ খ্রীঃ), লস্করদীঘির (পাঁশকুড়া) রঘুনাথ (১৭৯৬ খ্রীঃ), কোন্নগরের (ঘাটাল) বৃন্দাবনচন্দ্র (১৭৯৪ খ্রীঃ), দলপতিপুরে (ঘাটাল) সঙ্কর্ষণ রাধাদামোদর (১৮০৩ খ্রীঃ), কুশপাতার (ঘাটাল) পরিত্যক্ত লক্ষ্মীজনার্দন (আ: ১৮ শতকের শেষ), ধেলুয়ার (ভগবানপুর) রাধাগোবিন্দ (আ: ১৮ শতক), কাজলাগড়ের (ভগবানপুর) পরিত্যক্ত গোপাল (আ: ১৮ শতকের শেষ), মাড়োতলার (ডেবরা) শীতলানন্দ রাধাকৃষ্ণ (আ: ১৯ শতকের প্রথম), মহিষাদলের (রাজবাড়ি) মদনগোপাল (আ: ১৮ শতক), বাগরুই (কেশপুর)-এর মাইতিদের লক্ষ্মীবরাহ ও জানাদের লক্ষ্মীজনার্দন (দুটিই পরিত্যক্ত এবং আ: উনিশ শতকে নির্মিত), বাদাড়ের (কেশপুর) জগন্নাথ (আ: উনিশ শতকের প্রথমার্ধ), রাজবল্লভ গ্রামে (পিংলা) ঘোষেদের পরিত্যক্ত ও ভগ্ন শ্যামসুন্দর (আ:আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), ভেমুয়ার (সবং) ভট্টাচার্যদের রামচন্দ্র (আ: ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), রামচন্দ্রপুরে (ময়না) ঘোড়াইদের পরিত্যক্ত নবরত্ন (আ: ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), নজরগঞ্জে (মেদিনীপুর শহর) জানাদের রাধাবল্লভ (১৮০৮ খ্রীঃ) , মিত্রসেনপুরের (চন্দ্রকোণা) শান্তিনাথ (১৮২৮ খ্রীঃ), লোছিপুর (ঘাটাল) বাগেদের শ্রীধর (১৮৫৬) , রামজীবনপুর (বামুনপাড়া, চন্দ্রকোণা) চাটুজ্যেদের রাধাকান্ত (১৮২২ খ্রীঃ) প্রভৃতি মন্দির। এই নবরত্নগুলির সবই দ্বিতল কক্ষযুক্ত এবং বেশ কয়েকটিতে ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে, যেমন ধেলুয়া, রামচন্দ্রপুর, বাগরুই ইত্যাদি। ত্রয়োদশ ও সপ্তদশরত্ন এই জেলায় খুব কমই নির্মিত হয়েছে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য ত্রয়োদশরত্নের নিদর্শন খড়ারে (ঘাটাল) মাঝিদের সীতারাম (১৮৬৪ খ্রীঃ) এবং রামগড় (বিনপুর) রাজবাড়ির কালাচাঁদ (১৮৫৬ খ্রীঃ)। রামগড়ের মন্দিরটি স্থাপত্য ও টেরাকোটা প্রাচুর্যের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশরত্নরীতির একটিমাত্র মন্দির আছে চন্দ্রকোণাব রঘুনাথপুরে। এটি পার্বতীনাথ শিবের মন্দির। আনুমানিক ১৯ শতকে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

এই জেলার রত্নমন্দিরের শিখরগুলির সঙ্গে ওড়িশী 'রেখ' দেউলের পরিবর্তিত রূপটির মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি কতকটা 'চালার' রূপ নিয়েছে। আবার অনেক রত্নের শিখরাংশ সমান্তরালভাবে খাঁজকাটা, কতকটা পিঢ়ের অনুকরণে তৈরি হয়েছে। খাঁটি ওড়িশী 'শিখর'রত্ন এই জেলার একটিমাত্র মন্দিরে লক্ষ করা গেছে— সেটি মাড়োতলার (ডেবরা) শীতলানন্দ রাধাকৃষ্ণের পূর্বোক্ত নবরত্ন। এর কেন্দ্রীয় শিখরটির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সত্যেশ্বর মন্দিরের অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, সত্যেশ্বর মন্দিরটি খাঁটি ওড়িশী শিখর মন্দিরের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। 'রত্ন'মন্দির গুলির নীচের অংশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঁকানো কার্ণিশযুক্ত 'চালা' রীতিতে তৈরি হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরল কার্ণিশযুক্ত চাঁদনির ওপর রত্নগুলি সন্নিবেশিত দেখা যায়।

এই জেলায় ওড়িশী 'শিখর' মন্দিরের শৈলী বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে আঠারো-উনিশ শতকে, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই পরিবর্তিত রীতির 'দেউল'মন্দির জেলার নানা স্থানে বিপুল

সংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল। ওড়িশী শিখররীতির 'বাঢ়' ও 'গণ্ডী' এই দুটি অংশ নামমাত্র এই সব দেউলে লক্ষ করা যায়। শীর্ষে আমলক,কলশ, চক্র ইত্যাদি থাকলেও আমলক অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। কোন কোন মন্দিরে বৃহৎ আমলকও দেখা যায়। 'রথ'- বিন্যাস প্রায়ই অগভীর এবং স্থাপত্যগত অলংকরণ বহুলাংশে বর্জিত। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, 'গণ্ডী'র বক্রভাব অনেকটা হ্রাস পেয়ে সেটি কতকটা চালার রূপ নিয়েছে। গণ্ডি অংশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরলীকৃত, আবার অনেক সময় গণ্ডীতে সমান্তরাল খাঁজ ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। সামনে জগমোহন নেই বললেই চলে। ভেতরের ছাদে লহরার পরিবর্তে ভল্ট ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গণ্ডী গোলাকার গম্বুজের রূপ নিয়েছে। এধরণের দেউল মন্দির শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বেশ কিছু দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর থানায় এই দেউল মন্দির সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। আবার পাঁশকুড়া, তমলুক, কেশপুর,পিংলা প্রভৃতি থানার স্থানে স্থানেও এই মন্দির নির্মিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু ওড়িশা-সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলায় এই রীতির মন্দির প্রায় একটিও নেই। এই রীতির কয়েকটি মন্দিরের নিদর্শন সিংহডাঙার (ঘাটাল) শিব (এর শিখরটি খুব ভারী ও কতকটা গোলাকার, আ: ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), রামজীবনপুর বামুনপাড়ার দেউল, দলপতিপুরের (ঘাটাল) শীতলানন্দ (১৮৫০ খ্রীঃ),দাসপুর হোসনাবাজারের শীতলানন্দ (১৮৪৯ খ্রীঃ) , বৈকুণ্ঠপুরের (দাসপুর) শিব (আ: ১৯ শতক), জনার্দনপুরের (দাসপুর) সীতারাম (১৮১৪ খ্রীঃ), বেলেঘাটার (দাসপুর) শীতলানন্দ (আ: ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), পশ্চিম রাজনগরে (পাঁশকুড়া) সামন্তদের ঝাড়েশ্বর ও কামেশ্বর (ঝাড়েশ্বর প্রাচীন, আ: ১৮ শতকের শেষ), রাজহাটির (পাঁশকুড়া) গোস্বামীদের পরিত্যক্ত যুগলকিশোর (আ: ১৯ শতক), বলরামপুরের (ডেবরা) মল্লিকবেড়ে শিব (১৮৫৬ খ্রীঃ) ও সীতারাম (১৮৬০-১৮৬১ খ্রীঃ, এর সামনে জগমোহনের চালগুলি থাকে থাকে সন্নিবদ্ধ), লোয়াদায় (ডেবরা) পোদ্দারদের পরিত্যক্ত রাধাগোবিন্দ (১৮৫৮-৬০ খ্রীঃ), লোয়াদাবাজারে রাধাকৃষ্ণ (১৮৪৩ খ্রীঃ), চকবাজিত গ্রামে (ডেবরা) শিব (১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ), পিংলার সিংহপাড়ায় বাণলিঙ্গ (আ: ১৯ শতক) ও উত্তরপাড়ায় চৌধুরীদের শিব ইত্যাদি। বেশ উচ্চ ও ক্ষীণাকৃতি শিখরযুক্ত কিছু কিছু মন্দিরও এই জেলার মেদিনীপুর শহর, চিল্‌কিগড়ের (জাম্বনী) কনকদুর্গা ও রাজবাড়িতে আছে। বিনপুর থানার শিলদা, শুকজোড়া ও রাজপাড়া গ্রামে পরিবর্তিত ওড়িশী শিখররীতির দেউল দেখা যায়। এগুলি সবই উনিশ শতকে নির্মিত। উপরিউল্লিখিত দেউলমন্দিরগুলির কয়েকটি দাসপুর-সূত্রধরদের নির্মিত।

এই জেলার রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চগুলি রত্নরীতির এবং এক্ষেত্রেও পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, সপ্তদশরত্ন প্রভৃতি রীতির প্রচলন হয়েছে। রাসমঞ্চগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নবরত্ন ও সপ্তদশরত্নরীতির। কিছু কিছু স্থানে 'রত্ন' দেউলরীতির হলেও বেশিরভাগ রাসমঞ্চের রত্নগুলি এক বিশেষ শৈলীতে অর্থাৎ রত্নগুলি কতকটা রসুনের কোয়ার মতো স্থূলাকৃতি হয়ে শীর্ষে ক্রমসূক্ষ্মভাব ধারণ করেছে। দাসপুরসূত্রধরেরা এর নাম দিয়েছেন 'বেহারী রসুনচূড়া' বা 'রসুনচূড়া' ('European baroque art'- Mccutchion,পৃষ্ঠা ৭৩)। এই রীতি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মেদিনীপুর জেলার উল্লেখযোগ্য রাসমঞ্চ— রামগড় রাজবাড়ি (১৭ চূড়া, আ: ১৯ শতক), মহিষাদল (১৭ চূড়া, ১৮২৭ খ্রীঃ, বর্তমানে লুপ্ত), মাংলই-শ্যামবল্লভপুর (পাঁশকুড়া, ১৭ চূড়া,১৮৫৯ খ্রীঃ), পূর্বগোপালপুর (পাঁশকুড়া, ১৭ চূড়া, সংস্কার ১৮৯১ খ্রীঃ), নাড়াজোল (দাসপুর,পঁচিশ চূড়া, আঃ ১৯ শতক), গোপালপুর (দাসপুর, ন'চূড়া, ১৯ শতক), ডিহি বলিহারপুর (দাসপুর, ন'চূড়া,১৮২৭

খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রামে আছে। এগুলির মধ্যে নাড়াজোল ও ডিহিবলিহারপুরে দেউলরত্ন এবং গোপালপুরে চালারত্ন সন্নিবেশিত হয়েছে। দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চ একরত্ন ও পঞ্চরত্ন-রীতিতে তৈরি হয়েছে, কিন্তু কোন কোন স্থানে আটচালা তুলসীমঞ্চও লক্ষ করা যায়। নিদর্শন স্থলঃ দলপতিপুরের মাখালদের সঙ্কর্ষণ রাধাদামোদর ও দ্বন্দ্বীপুর (ঘাটাল) এবং লস্করদীঘির (পাঁশকুড়া) রাসমঞ্চ। উনিশ শতকের গোড়ায় ঘাটাল গম্ভীরনগরের 'দে'পরিবারের নির্মিত 'দেউলরত্নের' একটি পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চ টেরাকোটা কাজের এক সুন্দর নিদর্শন। কিছু কিছু তুলসীমঞ্চ 'বিষ্ণুপুর রীতি'তে কতকটা 'ইমারতি' থামের আকারে তৈরি হয়েছে। বিষ্ণুপুর- মন্দিরপ্রাঙ্গণেও ঠিক এই জাতীয় তুলসীমঞ্চ দেখা যায়। গড়বেতার পূর্বোক্ত রাধাবল্লভ, শিলদার কিশোর- কিশোরী ও দাসপুরের গোপীনাথ এই রীতির তুলসীমঞ্চের নিদর্শন।

উপরি উক্ত আলোচনায় মেদিনীপুর জেলার অসংখ্য মন্দিরের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থিত করা হয়েছে মাত্র। এই মন্দিরগুলির প্রায় সবই ইঁটের তৈরি। এর মধ্যে বেশ কিছু টেরাকোটা-অলংকরণে সমৃদ্ধ। লক্ষ করার বিষয় এই জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে রত্নরীতির মন্দির যে একেবারে নেই, তা নয়। তবে সেগুলি স্থাপত্য ও অলংকরণের দিক থেকে নিম্ন শ্রেণীর বলা চলে। দুএকটি অবশ্য সুদৃশ্য রত্নমন্দির ঐ অঞ্চলে লক্ষ করা যায়, যেমন নারায়ণগড় রাজবাড়ির নবরত্ন, চিল্‌কিগড়ে কনকদুর্গার পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন অথবা রোহিণীর (শাঁকরাইল) ষড়ঙ্গীদের পঞ্চরত্ন। কিন্তু সাধারণভাবে রত্ন বা চালারীতি নির্মাণের ব্যাপারে ঐ অঞ্চল খুবই পশ্চাৎপদ। সাম্প্রতিক কালে দু-একটি রত্নমন্দির নির্মাণে স্থপতিদের অপটুতা লক্ষ্য করা গেছে, যেমন, কেশিয়াড়ীর হাসিমপুর পল্লীতে সাহুদের কৃষ্ণবলরামের পঞ্চরত্ন, এর নীচের 'চাঁদনি' অংশটিকে অনাবশ্যক উচ্চ ও খাড়া করে ওপরে খর্বাকৃতি রত্নগুলি বসানো হয়েছে। অপর একটি নিদর্শন, ঝাড়গ্রাম মহকুমার আলামপুর গ্রামে (জাম্বনী থানা) পড়িয়াদের মন্দির। এটি চালা ও চাঁদনির একটি মিশ্ররূপ পেয়েছে, যদিও প্রচেষ্টাটা ছিল শিখর মন্দিরের ব্যাপারে। এ মন্দিরটি ১৯ শতকের শেষার্ধে নির্মিত হয়েছে। ঐ সময়ের আরও কয়েকটি মন্দির ঝাড়গ্রাম মহকুমায় নির্মিত হয়েছে যাদের প্রায় সবগুলিই প্রশস্ত দালানের ওপর গীর্জার চূড়ার মতো অথবা পিরামিডাকৃতি উচ্চ শিখরযুক্ত। এই ধরণের নিদর্শন ঝাড়গ্রামের সাবিত্রীমন্দির, নুনিয়ায় (জাম্বনী) পণ্ডাদের ও দুবড়ায় (জাম্বনী) ষড়ঙ্গীদের মন্দিরগুলিতে পাওয়া যাবে। জঙ্গল-অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাচীনকালে শিখরমন্দির নির্মাণ যতখানি প্রসার লাভ করেছিল, শেষ- মধ্যযুগ বা আরও পরবর্তীকালে চালা, চাঁদনি ও রত্নরীতির মন্দির নির্মাণ সেখানে একরূপ হয়নি বললেই চলে। এর কারণ, সম্ভবত ঐসব অঞ্চলে উপযুক্ত মন্দির স্থপতি বা ধনী ব্যক্তির আনুকূল্যের অভাব। অপরপক্ষে, মেদিনীপুরের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে শিলাই, কাঁসাই, রূপনারায়ণ ও হুগলি নদীর পলিমাটিতে গড়া বিস্তীর্ণ ভূভাগে আঠারো-উনিশ শতকে গড়া যে সুদক্ষ সূত্রধরকুলের উদ্ভব হয়েছিল, তার ফলেই এই অংশে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা মন্দির গড়ে ওঠে।

মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা স্থানে আঠারো উনিশ শতকের মধ্যে মন্দিরস্থপতি সূত্রধরসম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছিল। রূপনারায়ণের পশ্চিমতীরবর্তী ঘাটাল, দাসপুর এলাকার অদূরবর্তী হুগলি জেলার সেনহাটিতেও মন্দিরস্থপতি শিল্পীদের বসতি ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ বা তার কিছু পরেও ঘাটাল অঞ্চল হুগলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের বেশ কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল সেনহাটির মিস্ত্রীদের দ্বারা। তবে দাসপুর অঞ্চলে যে বহু সূত্রধরবসতি গড়ে ওঠে, তাঁরাই এই দিকের অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন। লিপিসাক্ষ্যেও এর প্রমাণ মিলছে। প্রথম দিকে তাঁদের বৃত্তি ছিল

মন্দির ও টেরাকোটা নির্মাণ এবং কাঠের খোদাই কাজ। পরে জীবিকার প্রয়োজনে এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁরা সাধারণ দালান নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে, মন্দির-সূত্রধরদের বসতি কেন্দ্রীভূত ছিল এই জেলার কয়েকটি স্থানে। সেগুলি হোল, দাসপুর, কলমিজোড়,নাড়াজোল, গৌরা, খেপুত, রাজনগর, হরিরামপুর (দাসপুর থানা); খড়ার ও বরদা (ঘাটাল থানা); ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা থানা); রঘুনাথবাড়ি ও রাজহাটী (পাঁশকুড়া থানা) এবং পাথরা (মেদিনীপুর সদর)। মন্দিরলিপি থেকে তাঁদের বাসস্থানের এই ঠিকানা জানা গেছে। অবশ্য, এই জেলার আরও অনেক স্থানে সূত্রধরদের কিছু ঠিকানা পাওয়া যায়, যেমন তোড়াপাড়া, নেহড়পাড়া, পোল, ময়ালবন্দিপুর ইত্যাদি। তবে পূর্ব আলোচিত বেশিরভাগ মন্দির দাসপুর ও দাসপুর থানার মিস্ত্রীরা তৈরি করেছিলেন। এমনকি, কোন মন্দিরে তাঁদের নাম ঠিকানা না থাকলেও তাঁদের তৈরী মন্দির বুঝতে অসুবিধে হয় না। দাসপুর ও নিকটবর্তী কলমিজোড়ের মিস্ত্রীরা দাসপুর এলাকা ছাড়িয়ে পাঁশকুড়া, ডেবরা, কেশপুর, পিংলা, সবং, খড়গপুর থানার নানা স্থানে বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। এই সব মিস্ত্রীর পদবী ছিল শীল, দাস, চন্দ বা চন্দ্র, দে, সাঁই, কুণ্ডু ইত্যাদি। অনেক শিল্পী তাঁদের নামের পাশে 'মিস্ত্রী', 'সূত্রধর' 'কারিকর' এই উপাধিগুলিও ব্যবহার করতেন। এমনকি, 'ছুতার' শব্দটিও কোন কোন শিল্পী তাঁর নামের পাশে জুড়ে দিতেন, যেমন, বেড়-জনার্দনপুরের (খড়গপুর লোক্যাল) মজুমদারদের প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা মন্দিরে (১৭৮৭ খ্রীঃ) পাথরার (মেদিনীপুর) নারায়ণ ছুতারের নাম আছে। উল্লেখ্য, পাথরা বেড়জনার্দনপুরের বিপরীত দিকে কাঁসাই-তীরবর্তী। ঐ গ্রামের (বেড় জনার্দনপুর) মজুমদারদের একটি পঞ্চরত্নের লিপিতে তাঁর নাম 'নারায়ণ কারীকর' পাওয়া যাচ্ছে। রামজীবনপুরের এক মন্দিরে ওখানেরই এক মিস্ত্রীর নামের উল্লেখ আছে 'পেলারাম সূত্রধর'। তিনি রামজীবনপুরের পিরিপাড়ায় প্রামাণিকদের দামোদরের পঞ্চরত্নটি তৈরি করেছিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। কাশীগঞ্জের (চন্দ্রকোণা) হারাধন সাউ ও রামদয়াল মিস্ত্রী ক্ষীরপাই অঞ্চলে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেন উনিশ শতকের শেষদিকে। পাঁশকুড়া থানার রঘুনাথবাড়ির শ্রীরাম মিস্ত্রী ও চন্দ্রকোণা ইলামবাজারের ভক্তারাম দাস মিস্ত্রী উভয়ে আনন্দপুরে বাগেদের রাধাকৃষ্ণ ও দামোদরের পঞ্চরত্ন নির্মাণ করেন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। বিষ্ণুপুরের কোন কোন মিস্ত্রী গড়বেতা অঞ্চলে যে মন্দির করেছিলেন সেকথা আগে বলা হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না। তবে বগড়ি কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণরায়ের পঞ্চরত্নে (১৮৫৫ খ্রীঃ) সনাতন মিস্ত্রী নামে একজন মিস্ত্রীর নাম পাওয়া যায়।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মন্দিরলিপিতে মিস্ত্রীদের নামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই। অবশ্য, চন্দ্রকোণার লালজীউ মন্দিরে রক্ষিত শিলালিপিতে (১৬৫৫ খ্রীঃ) যে গোকুল দাসের নাম পাওয়া যায় তিনি বিলুপ্ত নবরত্নটির স্থপতি ছিলেন কিনা বলা কঠিন।

দাসপুর-সূত্রধরদের মধ্যে লিপিসাক্ষ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মন্দির তৈরি করেছেন ঠাকুরদাস শীল। এই জেলায় পর পর তিনি যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন সেগুলি হোল—(১) দাসপুর গ্রামে রাসবিহারী চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত দধিবামনের পঞ্চরত্ন (প্রচুর টেরাকোটা আছে, ১৮৪৬ খ্রীঃ), নিকটবর্তী সুরৎপুরগ্রামে শীতলার পঞ্চরত্ন (প্রচুর টেরাকোটা, ১৮৪৫ খ্রীঃ), দাসপুর হোসনাবাজারে বিন্দাদেবীর ছোট্ট পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চ (এখানেও প্রচুর টেরাকোটা আছে,১৮৫৩ খ্রীঃ),বলরামপুরে (ডেবরা) শিবের দেউল (১৮৫৬) ও সীতারামের জগমোহনযুক্ত দেউল (১৮৬০-৬১ খ্রীঃ) এবং চকবাজিত গ্রামে (ডেবরা) শিবের দেউল (১৮৬৬ খ্রীঃ)। ঠাকুরদাস আরও কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু লিপির অভাবে সেগুলি

তাঁর কিনা সনাক্ত করা কঠিন। কিন্তু তারও আগে দাসপুরের স্থপতি সাফলরাম চন্দ্র চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণ করেন ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। দাসপুরের গোপাল চন্দ, বৃন্দাবন চন্দ,শত্রুঘ্ন চন্দ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লোয়াদা বামুনবেড়ের দুটি টেরাকোটা রত্নমন্দির নির্মাণ করেন। হরহরি চন্দ মিস্ত্রী পাইকপাড়ি (ডেবরা) ও জোতমুরি (দাসপুর) গ্রামে দুটি মন্দির করেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। আনন্দমিস্ত্রী পিংলার বোসেদের চাঁদনি, উত্তর গোবিন্দনগরের (দাসপুর) একটি আটচালা এবং চন্দ্রামেড়ের একটি 'রাসমঞ্চ' তৈরি করেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। কলমিজোড়ের বদনচন্দ্র মিস্ত্রী ও হরি মিস্ত্রী যথাক্রমে পাশকুড়া থানার হরেকৃষ্ণপুর ও দক্ষিণ ময়নাডালের মন্দির নির্মাণ করেন। কলমিজোড়ের রাজারাম চন্দ হোসেনপুর ও চাঁদপুরের মন্দিরনির্মাতা ছিলেন। বর্তমান বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও দাসপুরের মিস্ত্রীরা নানাস্থানে মন্দির করেছেন, যেমন, শশিভূষণ শীল চকবাজিতে ও ধামতোড়ে (ডেবরা) যথাক্রমে চাঁদনি ও দেউলমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এই শতকেরই গোড়ার দিকে। শিবনারায়ণ চন্দ চকবাজিতে একটি পঞ্চরত্ন 'রাসমঞ্চ' ও 'চাঁদনি' নির্মাণ করেন ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মাধব দাস মিস্ত্রী রামচন্দ্রপুরে (ময়না) ঘোড়াইদের বিশাল দালান নির্মাণ করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ দালানটি সাড়ে দশহাজার টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল। আরও বহু দাসপুর মিস্ত্রীর নাম অনেক মন্দির-গাত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

দাসপুরের এই সূত্রধর-সম্প্রদায় মেদিনীপুর জেলার এই অঞ্চলে টেরাকোটা-অলংকরণ ও মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক পৃথক শৈলীর প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। এঁদের তৈরি দেউল ও রত্ন মন্দিরগুলিতে স্থাপত্য-সৌন্দর্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে দেখা যায়। সুদৃশ্য দেউলমন্দির নির্মাণেও এঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রত্নমন্দিরের ক্ষেত্রে চালার সহজসুন্দর বঙ্কিম কার্ণিশ ও রত্ন শিখরগুলির ঋজু ও বলিষ্ঠভাব এঁদের হাতে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা মন্দিরস্থাপত্যের বেশ কয়েকটি নিজস্ব পরিভাষারও উদ্‌ভাবন করেছিলেন, যেমন,একরত্নের তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'আলগোছটুঙ্গী'। এই নামটি খুবই তাৎপর্যবহ অর্থাৎ চালার ওপর চূড়াটিকে এমনভাবে বসাতে হবে দূর থেকে দেখলে মনে হবে চূড়াটি ছাদের সঙ্গে যুক্ত নয়। এরমধ্যে সৌন্দর্য ফুটে উঠত বেশি। দাসপুরে এরূপ মন্দির এখনও কয়েকটি আছে, যেমন সিংহদের গোপীনাথ, বলিহারপুরের গোঁড়িবুড়ি ও ব্রজরাজকিশোর এবং রাধাকান্তপুরের গোপীনাথ। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলান ও স্তম্ভের এবং মন্দিরঅলংকারের তাঁরা অনেকগুলি নাম দিয়েছিলেন। খিলানের নামঃ দরুণ, হাঁসগলা, হাইকোর্ট, চামচিকা ওগোল। থামের নামঃ ইমারতি, কলাগেছ্যা, চৌকা, গোল ও চুমকি। মন্দির অলংকারঃ তুরুজ, কমলাতুরুজ, কোণ, কল্‌কা, সোনাগেছ্যা এবং খাঁজবন্দী। বর্তমান গ্রন্থকার-কর্তৃক খিলানের আরও কয়েকটি নাম জানা গেছে, যেমন গোলন্দর, মেহরাব, বাদামী ও সুরাইদার। দাসপুর-সূত্রধরদের উদ্ভাবিত ঐসব পরিভাষার অর্থ ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচ্চন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ১৫-১৬)।

টেরাকোটা, প্রস্তরভাস্কর্য ও কাঠ-খোদাই কাজে সব শিল্পীই দক্ষতা দেখিয়েছেন কম-বেশি। মেদিনীপুর জেলাতেও তা বিরল নয়। কিন্তু এই জেলায় পাথরে তৈরি প্রাচীন 'শিখর' মন্দিরগুলিতে কারুকার্য তেমন চোখে পড়ে না। পক্ষান্তরে, ইঁটের তৈরি মন্দিরে টেরাকোটা-অলংকরণ লক্ষ করার মতো। প্রাগুক্ত ইঁটের 'চালা', 'চাঁদনি', 'দেউল' ও 'রত্ন'মন্দিরগুলির অন্তত কুড়ি শতাংশ মন্দিরে এই অলংকরণ কমবেশি স্থান পেয়েছে। চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর ও পাঁশকুড়া থানার কোন কোন মন্দিরে টেরাকোটার প্রাচুর্য বিস্ময় সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে টেরাকোটা মূর্তিগুলির প্রায় সবই ছোট-বড়ো

টালিতে 'বাস-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি একখিলান বা ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরে, কার্ণিশের নীচে ও দুপাশে ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্তম্ভগাত্রে এই ধরণের টেরাকোটা টালি স্থাপন করা হয়েছে দেখা যায়। সাধারণতঃ মন্দিরের সামনের দিকেই টেরাকোটা সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়,আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দিরের দুদিক বা তিনদিকেও লক্ষ্য করা গেছে। তবে মন্দিরের গর্ভগৃহের বারান্দাসংলগ্ন দেওয়াল ছাড়া ভিতরের দেওয়ালে টেরাকোটা আদৌ স্থান পায়নি। অবশ্য, কোন কোন মন্দিরের দ্বিতলের দেওয়ালেও টেরাকোটার সমাবেশ হয়েছে, যদিও এধরণের মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাণাপুর, বাগরুই, বাদাড় ও রামচন্দ্রপুর মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। টেরাকোটা অলংকরণের মধ্যে দেবতা, মানুষ ও পশুপক্ষীর মূর্তি, ফুল ও লতাপাতার নক্‌শা স্থান পেয়েছে। বেশিরভাগ মন্দিরের ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালে পশুপক্ষী ও সেকালের সামাজিক দৃশ্যের (যেমন, পশুশিকার, যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি) প্যানেল সন্নিবেশিত থাকে। স্তম্ভগাত্রে কার্ণিশ ও দুপাশের কুলুঙ্গীতে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন প্রচলিত রীতি। কিন্তু বারান্দার খিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে রামায়ণীয় ঘটনাবলী ও রাম-রাবণের যুদ্ধ-দৃশ্য সব টেরাকোটা মন্দিরেই প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে স্থানে স্থানে পৌরাণিক কাহিনী ও কৃষ্ণলীলাদৃশ্যও উপস্থিত থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা-মন্দিরে যেক্ষেত্রে রামায়ণের কাহিনী আবশ্যিকভাবে রূপায়িত হয়েছে, সেখানে মহাভারতীয় দৃশ্যচিত্র অতি অল্প। পশ্চিম বাংলার খুব কম মন্দিরেই মহাভারতীয় উপাখ্যান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। টেরাকোটায় রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে খিলানের ওপরের প্রস্থে আবশ্যিক রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য ছাড়া সীতাহরণ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ, অশোকবনে সীতা, রাম-সীতার রাজ্যাভিষেকপ্রভৃতি চিত্র লক্ষ্য করা যায়। রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্যের মাঝখানে কোন কোন স্থানে মহিষমর্দিনী দশভুজার মূর্তি সন্নিবেশিত থাকে। চাঁইপাটের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দের আটটচালায় (১৭৫৯ খ্রীঃ) লঙ্কাযুদ্ধের এক জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। খিলান প্রবেশপথের ওপরের গোটা অংশটাতেই বানর ও রাক্ষস সেনার ভয়ঙ্কর যুদ্ধদৃশ্য স্থান পেয়েছে। এই মন্দিরের ভিত্তিবেদি সংলগ্ন প্যানেলগুলিতে সেকালের সামাজিক দৃশ্যের বহু টেরাকোটা সন্নিবেশিত ছিল। বেশ কয়েকটি বর্তমানে লুপ্ত।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী ও শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শের প্রভাবে লৌকিক চণ্ডী উপাখ্যান এবং চৈতন্যলীলার কিছু কিছু টেরাকোটা ফলকও মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত হয়েছিল। তবে লৌকিক চণ্ডীর সদাগর উপাখ্যানের মধ্যে কমলেকামিনীদৃশ্য ও দুপাশে ধনপতি ও শ্রীপতির নৌকাযাত্রা দৃশ্যই বেশি লক্ষ করা যায়। কালকেতু-উপাখ্যান খুব কম মন্দিরেই উপস্থিত। গৌর-নিতাই এর সংকীর্তনরত মূর্তি বহু মন্দিরে স্থান পেয়েছে। পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে প্রায় সব মন্দিরেই দশাবতার, মহিষমর্দিনী, কালী প্রভৃতির মূর্তিফলক স্থাপিত। দশাবতারমূর্তির মধ্যে বুদ্ধমূর্তির বদলে জগন্নাথ অথবা শ্রীচৈতন্যের মূর্তি এই জেলায় ওড়িশার জগন্নাথ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক। এর সঙ্গে বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ প্রচ্ছন্ন। এছাড়া কৃষ্ণলীলা-উপাখ্যান কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত সব মন্দিরেই লক্ষ্য করা গেছে। কৃষ্ণলীলার সাধারণ দৃশ্যগুলি, যেমন, গোপীদের বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, কদম্ববনে কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রত্যাবর্তন ও গোপীদের বিলাপ প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা মন্দিরে উপস্থিত।

মিথুনফলকের বিচিত্র সমাবেশ মেদিনীপুর জেলার টেরাকোটা-মন্দিরগুলিতে যতখানি লক্ষ করা যায় অন্য কোন জেলার মন্দিরে সেরূপ দেখা যায় না। এই জেলার প্রাচীন 'শিখর' মন্দিরসমূহে মিথুনদৃশ্য কিছু কিছু স্থান পেয়েছে সত্য, কিন্তু প্রাগুক্ত ইঁটের মন্দিরগুলিতে মিথুনফলক অধিক মাত্রায়

স্থান পেয়েছে। ওড়িশার মিথুনভাস্কর্য একসময় যে এই জেলার টেরাকোটাশিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, মিথুনদৃশ্যের বাহুল্যই তার প্রমাণ। এছাড়া, আঠারো শতকের শেষ থেকে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে সংস্রবের ফলে স্থাপত্য ও অলংকরণে যে য়ুরোপীয় প্রভাব পড়েছে তাও বোঝা যায়। উনিশ শতকের বহু মন্দিরে ফ্যান লাইট্, অর্ধোন্মুক্ত ভিনিসীয় দরজায় প্রতীক্ষারতা নায়িকা, সাহেব-মেমের মূর্তি এবং টেরাকোটা মূর্তির সাজপোষাকে য়ুরোপীয় প্রভাবের পরিচয় দেয়।

এই জেলার টেরাকোটা-মন্দিরসমূহে স্থান ও কালের ব্যবধানে অলংকরণ-রীতিরও যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৭ শতক বা ১৮ শতকের গোড়ার দিকে ঘাটাল ও দাসপুর অঞ্চলে যে-সব মন্দির নির্মিত হয়েছে, সেখানে মূর্তিগুলি ছোট ছোট টালিতে অগভীরভাবে অঙ্কিত হলেও রেখা-বিন্যাস ও ভাবভঙ্গীর ক্ষেত্রে উন্নত শৈলীর পরিচয় দেয়। এ-ধরণের নিদর্শন রাণীর বাজারের (ঘাটাল) শ্যামরায় বা শ্যামপুরের (ঘাটাল) প্রাগুক্ত মন্দির। অদূরবর্তী নবগ্রামের (ঘাটাল) সিংহবাহিনীতেও (১৭০৯ খ্রীঃ) ঐ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। ঐ একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় দাসপুর ও রাধাকান্তপুরের গোপীনাথ, বৈকুণ্ঠপুরের নিম্বার্কমঠের পরিত্যক্ত মদনমোহন এবং মামুদপুরের ভগ্ন কালীমন্দিরে। দাসপুরের চৌধুরীদের শ্যামরায়ের একরত্নেও (বর্তমানে লুপ্ত, ১৬৯৯ খ্রীঃ) ঐ একই বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐ ধরণের আরও অনেক টেরাকোটা-মন্দির এইসব স্থানে এবং অন্যান স্থানে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। টেরাকোটা-শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য কিছুকাল অব্যাহত ছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যেসব টেরাকোটা-মন্দির এই অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে, সেগুলিতে টালি ও মূর্তির আকার আরও বড়ো হতে দেখা গেছে, রেখা ও ভঙ্গীর ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। এই ধরণের টেরাকোটার দৃষ্টান্ত রয়েছে দাসপুরে পালেদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৭৯১ খ্রীঃ), পুরুষোত্তমপুরের (দাসপুর) ব্রজরাজকিশোর (১৭৭২ খ্রীঃ), ডিহিবলিহারপুরের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দ (১৭৯৮ খ্রীঃ), পূর্বগোপালপুরের (পাঁশকুড়া) রাধাবিনোদ (১৭৫৯ খ্রীঃ), চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দ (১৭৮১ খ্রীঃ), রাণাপুরের (দাসপুর) রঘুনাথ (১৮০১ খ্রীঃ), লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায় (১৮০১ খ্রীঃ) মন্দিরে। এগুলির মধ্যে আবার কোন কোনটিতে বড়ো বড়ো মূর্তিফলক সান্নিবেশিত হয়েছে, যেমন চেঁচুয়া ও লাওদায়।

উনিশ শতক থেকে টেরাকোটা অলংকরণ-শৈলীর অবক্ষয়ী রূপটি চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, পাঁশকুড়া প্রভৃতি স্থানের বহু মন্দিরে লক্ষ করা যায়। মূর্তিগুলির স্থূল আকার ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কলেবর এসময় প্রধান্য লাভ করায় রৈখিক সৌন্দর্য বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। চন্দ্রকোণার টেরাকোটার মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এটা বেশি করে চোখে পড়ে। তবুও কিছু কিছু মন্দিরে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন, নিমতলায় হেমন্তনাথের আটচালা (যদিও এটি প্রায় নিকটবর্তী রাণাপুর মন্দিরের সমসাময়িক), ব্রাহ্মনবসানের (দাসপুর) মন্ডলদের আটচালা, বাগরুইয়ের লক্ষ্মীবরাহ, বাদাড়ের জগন্নাথ, ভেমুয়ার (সবং) ভট্টাচার্যদের নবরত্ন ইত্যাদি। উনিশ শতকে এই জেলায় টেরাকোটা মন্দির অনেক তৈরী হয়েছে। প্রচুর টেরাকোটার সমাবেশ প্রাগুক্তগুলি ছাড়া আনন্দপুরে বাগেদের ও কাণাশোলের (কেশপুর) ঝাড়েশ্বর, মাংলই-শ্যামবল্লভপুরে (পাঁশকুড়া) মাইতিদের রাসমঞ্চ, তিলন্তপাড়ার (সবং) জানকীবল্লভ, বৃন্দাবনপুরের (দাসপুর) মহাপ্রভু প্রভৃতি মন্দিরের নাম করা যেতে পারে। ঐসময়ের মন্দিরগুলিতে টেরাকোটার সঙ্গে 'স্টাকো' মূর্তি ও 'পঙ্কে'র অলংকরণ প্রচুর লক্ষ করা যায়। পঙ্কের অলংকরণে নানা রঙের ব্যবহারও দেখা যায়। আনন্দপুরের হেটেলাপাড়ায় সরকারদের পঞ্চরত্নে (১৮৯৩ খ্রীঃ) টেরাকোটার সঙ্গে 'স্টাকো' ও 'পঙ্কে'র কাজের সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সবগুলিই

নিম্নমানের পরিচায়ক। তিলন্ত পাড়ার মন্দিরে 'টেরাকোটা' ও 'স্টাকো' দুইই সন্নিবেশিত হয়েছে। 'স্টাকো'র দ্বারী মূর্তি এসময়ের প্রায় সব মন্দিরেই দেখা যায়। ফুল-লতাপাতার উৎকৃষ্ট রঙীন পঙ্কের কাজ কম-বেশি বহু মন্দিরের গর্ভগৃহের মণ্ডপে বা গর্ভগৃহ প্রবেশপথের ওপরে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোক্ত বাগেদের মন্দিরে এবং রামজীবনপুরের কয়েকটি মন্দিরের গর্ভগৃহ-মণ্ডপে 'পঙ্কে'র সুন্দর অলংকরণ লক্ষ্য করা গেছে।

'টেরাকোটা' ছাড়া কাঠখোদাই কাজেও মেদিনীপুরের শিল্পীরা উন্নত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। মন্দিরের কাঠের দরজায় সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও নক্‌শা এবং দরজার চারপাশের ফ্রেমের সূক্ষ্ম কারুকার্য বেশকিছু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। মন্দিরদরজায় উল্লেখযোগ্য খোদাই কাজের নিদর্শন আছে শ্রীধরপুরের (দাসপুর) সামন্তদের মন্দিরে (আ: ১৮৯৩ খ্রীঃ), চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দ, উত্তর ধানখালে (দাসপুর) ভূএগ্রাদের লক্ষ্মীজনার্দন, রাণীর বাজার অঞ্চলে এবং রামগড়ের (বিনপুর) টিনের আটচালার কাঠের খুঁটিতে। মেদিনীপুর জেলায় পিতল ও কাঠের রথও তৈরী হয়েছে বেশকিছু। রামগড়ের (বিনপুর) নবরত্ন পিতলের রথটি পঞ্চতলযুক্ত। তিওরবেড়িয়ার (দাসপুর) রথটিও পিতলের। বৈকুণ্ঠপুর (দাসপুর) নিম্বার্কমঠে একটি ছোট্ট একরত্ন পিতলের রথ সুদৃশ্য। কাঠের বিশাল রথ আছে রঘুনাথবাড়ি (পাঁশকুড়া) , মহিষাদল প্রভৃতি স্থানে। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত মন্দিরগুলি ছাড়া এই জেলায় বিস্তীর্ণ ভূভাগে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মন্দির। কোন কোন মন্দিরে উন্নতমানের পোড়ামাটির অলঙ্করণও লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চলভেদে স্থাপত্য ও অলঙ্করণে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে নেই, এমন নয়। তবে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হলেও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে প্রাগুক্ত নির্দিষ্ট দুটি শৈলীই অনুসৃত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে নির্মিত ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের কয়েকটি মন্দির অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কিন্তু সেগুলি বিচ্ছিন্ন নিদর্শনমাত্র এবং খুবই অর্বাচীন।

মেদিনীপুর জেলার বহুবিচিত্র ও পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি একদা কাদের হাতে তৈরি হয়েছিল এবং কারা এগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সে-সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠালিপিফলক থেকে। মন্দির-স্থপতিরা 'সূত্রধর' বা চলিত কথায় 'ছুতার' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা একই সঙ্গে মন্দিরের গঠন ও তার অলংকরণকর্মে দক্ষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণী কাঠের কাজ করতেন। তাঁরা মন্দিরের দরজা ও তার কারুকার্য, দেববিগ্রহের অধিষ্ঠানের জন্য কাঠের সিংহাসন, কাঠের রথ প্রভৃতি তৈরি করতেন। সূত্র বা সূতার দ্বারা নিখুঁত মাপজোপ করে তাঁরা সুন্দর সুন্দর মন্দির, দালান ও সূক্ষ্ম কারুকার্য যুক্ত কাঠের আসবাব পত্র তৈরি করতেন। মাটি, পাথর ও কাঠ— এই তিন প্রকার কারুকার্যে তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৃতির পরিচয় মেলে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 'সূত্রধার ' বা 'সূত্রধরকে' হীনজাতি বলে উল্লেখ করা হলেও (দ্রষ্টব্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ম অধ্যায়) প্রাচীন কালে এই জাতি উচ্চ বলে গণ্য হতেন। সেসময় 'সূত্রধর' 'রথকার' অর্থাৎ রথ তৈরি করতেন এবং তাঁদের উপনয়নের ব্যবস্থাও ছিল।

মেদিনীপুর জেলার যেসব মন্দিরের লিপিফলকে মন্দিরসূত্রধরের নাম ও বাসস্থান উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে এই জেলার সূত্রধর সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। অবশ্য প্রতিটি লিপিফলকেই যে তাঁদের নাম-ধামের উল্লেখ আছে তা নয়। তবু বেশ কিছু লিপিফলক থেকে তাঁদের পরিচয় জানতে অসুবিধে হয় না। এই জেলার শিলাই, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই নদীর সংলগ্ন স্থানসমূহে প্রধানত মন্দিরস্থপতি -সূত্রধরদের বসতি কেন্দ্রীভূত ছিল। এই অংশের মধ্যে চন্দ্রকোণা, ঘাটাল ও দাসপুর থানার নানা স্থানে

তাঁরা একসময় দলবদ্ধভাবে বসবাস করতেন। আর এই অংশেই বেশির ভাগই তাঁদের হাতে গড়া অনেক মন্দির লক্ষ্য করা যায়। এঁদের হাতে তৈরি বহু মন্দির আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও যেসব মন্দিরে এখনও তাঁদের নাম-ধামের বিবরণ রয়েছে, সেগুলি গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান। লিপিসাক্ষ্যে এবং বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, সূত্রধরশিল্পীদের সর্বাধিক বসতি গড়ে উঠেছিল দাসপুর ও তার আশপাশের আরও অনেক গ্রামে। এই শিল্পীরা দূর-দূরান্তর গ্রামাঞ্চলে যে সব মন্দির করেছিলেন, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোটামুটি আঠারো শতক থেকে বর্তমান বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। দাসপুর থানার অনেক স্থানে মন্দির নির্মাণ করা ছাড়াও এই জেলার কেশপুর, ডেবরা, পিংলা, সবং, খড়গপুর থানার বেশকিছু মন্দির দাসপুরের মিস্ত্রীরা নির্মাণ করেছিলেন। অনেক মন্দির কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন মিস্ত্রীর নাম আজ আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। তবু, বহু লিপিফলক থেকে দাসপুর সূত্রধর-গোষ্ঠীর মোটামুটি এক পরিচয় পেতে আমাদের অসুবিধে হয় না। দাসপুরের এই সূত্রধরকুল 'চালা', 'চাঁদনি', 'রত্ন', ও 'দেউল'- এই চারপ্রকার মন্দির নির্মাণেই নিপুণ ছিলেন। তাঁদের হাতে তৈরি মন্দিরসমূহে তাঁদের নিজস্ব শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি, কোন কোন মন্দিরে তাঁদের নাম-ঠিকানার উল্লেখ না থাকলেও এগুলি তাদের তৈরি চিনে নিতে তেমন অসুবিধে হয় না। এঁদের তৈরি চালার সহজসুন্দর বঙ্কিম কার্নিশ এবং রত্ন ও দেউলের সুচারু শিখর খুবই দর্শনীয়। দীর্ঘকাল ধরে মন্দির নির্মাণের কাজে নিযুক্ত থাকায় দাসপুরের মিস্ত্রীরা মন্দিরস্থাপত্যের কয়েকটি 'স্থানীয় পরিভাষারও সৃষ্টি করেছিলেন। সেগুলিকে আঞ্চলিক মন্দির-গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায়। প্রচলিত 'একরত্ন'রীতির মন্দিরকে তাঁরা বলতেন 'আলগোছটুঙ্গী'। ওড়িশী 'শিখর-রীতির মন্দির যা তাঁদের হাতে আঠারো-উনিশ শতকে কতকটা 'চালার' রূপ নিয়েছিল তার নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'উৎকলীয়', ছোট আকারের সমতল ছাদযুক্ত চৌকা বা আয়তক্ষেত্রাকার মন্দিরকে তারা 'চাঁদনি' বলতেন। এই 'চাঁদনি' নামটি খুবই তাৎপর্যবহ। বড়ো পাকা বাড়ি বা দালানের ছাদের ওপরে যে ছোট্ট চিলেকোঠা দেখা যায়, তাকে বলা হয় 'চাঁদনি'। এই ধরণের যে বহু মন্দির মেদিনীপুর জেলা তথা পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে দেখা যায়, সেগুলিকে চাঁদনি মন্দির বলা হয়। 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' বলে এক ধরণের আটচালার তাঁরা নাম দিয়েছেন যার ওপরের চারটি চাল খোড়ো ঘরের ওপরের চারপাশ কাস্তে দিয়ে, কেটে দিলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাত। বিষ্ণুপুরের আসপাশে এই রীতির মন্দির বেশ কিছু তৈরি হয়েছিল। 'আলগোছটুঙ্গী' নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চাঁদনি বা চালার ছাদের ওপর একটি চূড়া এমনভাবে বসানো হোত যেটিকে নীচু থেকে দেখলে মনে হোত, যেন চূড়াটি 'আলগোছ' বা আলতোভাবে বসানো হয়েছে। ছাদের সঙ্গে যেন চূড়াটির কোন সংযোগ নেই। স্থাপত্যসৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য দাসপুরের মিস্ত্রীরা এধরণের অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। দাসপুর ও তার আসপাশে এই 'আলগোছটুঙ্গী' মন্দির এখনও কিছু আছে। এই রীতির বেশ কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া 'ইসলামীয়-দেউল' নামে এক ধরণের মন্দিরের তাঁরা নামকরণ করেছিলেন যার 'শিখর' কতকটা গোলাকার গম্বুজের মতো করে তৈরী করা হোত। এই প্রকারের কিছু মন্দির শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এই রীতির মন্দির যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, তার প্রমাণ এর অল্প কয়েকটি নিদর্শন। বর্ধমান জেলায় কালনার প্রতাপেশ্বরের দেউল এই রীতির মন্দিরের এক সুন্দর নিদর্শন। মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে (দাসপুর থানা) শিবের দেউল আর একটি নিদর্শন। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে এই ধরণের গম্বুজাকৃতি শিখরযুক্ত

কয়েকটি মন্দির আছে, যেমন, চন্দ্রপাড়ার কামারগলিতে শিবমন্দির (১৮৩৭খ্রী:), এটি সোনামুখীর রামহরি মিস্ত্রীর তৈরি, যিনি কালনার প্রতাপেশ্বর দেউলটিও তৈরি করেছিলেন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। সোনামুখীর রণীরবাজারে বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ-প্রতিষ্ঠিত এরূপ একটি মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের শ্রীবাটিতেও (কাটোয়া) এ ধরণের মন্দির আছে।

দাসপুরের মিস্ত্রীরা মন্দিরপ্রবেশপথের 'খিলান' ও 'থামের'ও আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণ করেছিলেন। খিলানের নামগুলি হোল- 'দরুণ', 'হাঁসগলা', 'চামচিকা', 'বাঁশফালা', 'হাইকোর্ট', ও 'গোল'। নানা আকারের থামের তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'ইমারতি', 'কলাগেছ্যা', 'গোল', 'চৌকা' এবং 'চুমকি'। এই নামগুলি তাঁরা কিভাবে উদ্‌ভাবন করেছিলেন, তা আজও রহস্যাবৃত থেকে গেছে। তবে, বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষদের মুখে মুখে এই নামগুলি শুনে তাঁদের বংশধরেরাও এগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সেটা অনুমান করা যায়। প্রবেশপথের ওপরে কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার বক্র রেখার সমন্বয় ক'রে 'দরুন' খিলান তাঁরা নির্মাণ করতেন। এই খিলান অনেক প্রাচীন মসজিদেও লক্ষ্য করা যায়, যেমন, গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ, ত্রিবেণীর (হুগলি) জাফর খাঁর মসজিদ ও আরও অনেক মসজিদে। মুসলমান আমলে মসজিদ প্রভৃতিতে প্রথম ও আরও অনেক মসজিদে। এই খিলানের প্রচলন হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। 'হাঁসগলা'র আকার কতকটা হাঁসকলের ন্যায়। 'দরুণ' এর অর্ধবৃত্তাকার বলয়ের কৌণিক অংশগুলি পরস্পর নিম্নে প্রসারিত হয়ে ঈষৎ বক্রাকার যে চ্যাপ্টা অংশের সৃষ্টি করে, সেটি কতকটা হাঁসকল বা হাঁসের গলার মতো দেখতে হোত। ওপরে-নীচে পরপর চারটি অর্ধবৃত্তাকার বলয় সন্নিবেশিত ক'রে 'চামচিকা' খিলান তাঁরা তৈরী করতেন। আধফালা বাঁশের মতো দেখতে হোত 'বাঁশফালা' খিলান। গথিক-স্থাপত্যে যে ধরণের প্রবেশ খিলানের ব্যবহার আছে, কতকটা পরস্পর সেই ধরণের খিলান তাঁরা বেশকিছু মন্দিরে নির্মাণ করেছিলেন। এর নাম তাঁরা দিয়ে ছিলেন 'হাইকোর্ট' খিলান। সম্ভবত কলকাতা হাইকোর্টের খিলানগুলি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একক বৃত্তাকার খিলানের নাম ছিল, 'গোল'। বলা বাহুল্য, মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে উপরি উক্ত খিলানগুলির সুন্দর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এর প্রতিটির মধ্যেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করার প্রয়াসটা চোখে পড়ে।

বারান্দার প্রস্তার যে স্তম্ভগুলির ওপর ন্যস্ত থাকে, সেই স্তম্ভগুলিরও স্থানীয় কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে 'ইমারতি' থাম তৈরী হোত বত্রিশ থাক ইঁট বা পাথর দিয়ে। এই থামের ওপর ও নীচু অংশ চওড়া, কিন্তু মাঝের অংশ সরু। মুসলমান-পূর্ববর্তী যুগের কিছু কিছু ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির ও পরবর্তীকালে মসজিদেও এই ধরণের থামের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হুগলি জেলার ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়ায়। জানা যায়, এই দুটি স্থানেরই মসজিদ প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কলাগাছের মতো করে তৈরি করা হোত কলাগেছ্যা থাম। একসঙ্গে চার থেকে ষোলটি কলাগাছের কাণ্ডের মতো থাম যুক্ত করে এই থাম তৈরি করা হোত। গোলাকার থাম হলে বলা হোত 'গোল' এবং চারকোণা থামের নাম হোত 'চৌকা'। 'চুমকি' ঘটির মতো থামকে বলা হোত 'চুম্‌কি'। নানা আকারের এই থামগুলি শুধুমাত্র দর্শনীয় হোত না, এগুলির প্রতিটির মধ্য দিয়ে মন্দির-প্রবেশপথের সামগ্রিক সৌন্দর্য প্রকটিত হোত। মন্দিরগাত্রের কিছু কিছু স্থাপত্যালংকারের স্থানীয় নামও পাওয়া যায়, যেমন-তুরুজ, কমলাতুরুজ, কোণ, কলকা, সোনাগেছ্যা, খাঁজবন্দী ইত্যাদি। খিলানের আরও কিছু নাম সম্প্রতি জানতে পারা গেছে, এগুলির নাম— মেহরাব, গোলন্দর, বাদামী ও সুরাইদার। বলাবাহুল্য, এই নামগুলি সবই যে দাসপুর-সূত্রধরদের উদ্‌ভাবিত, তা বলা যায় না। কিছু কিছু নাম তারা নিজেরা

উদ্‌ভাবন করলেও পরম্পরাক্রমে যে এগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রচলিত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের শাস্ত্রীয় পরিভাষা ও ওড়িশার আঞ্চলিক পরিভাষার কথা বাদ দিলে বাংলার মন্দিরশিল্পের নিজস্ব অনেক পরিভাষা যে স্থানীয় সূত্রধরদের উদ্‌ভাবিত, তা অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের বিষয়, এই সব পরিভাষা আজ অনেকটাই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। গ্রন্থকারের পিতৃদেব প্রয়াত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় দাসপুর অঞ্চলের প্রবীণ অনেক মন্দিরসূত্রধরের মুখে এর কিছু কিছু শুনেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থকার আরও কোন কোন সূত্রধরের কাছ থেকে নতুন কিছু পরিভাষা উদ্ধার করেছেন, যার কয়েকটি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এসম্পর্কে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

দাসপুর গ্রাম ছাড়া এই জেলায় আরও যে-সব স্থানে মন্দির-সূত্রধরদের বসতি গড়ে উঠেছিল সেগুলির নাম হোল: কলসিজোড় (এখানে যুগলচন্দ্র নামে একজন মন্দির তৈরি করতেন), নাড়াজোল গৌরা, খেপুত, নিমতলা, রাজনগর, হরিরামপুর (দাসপুর থানা), ঘাটাল গম্ভীরনগর, খড়ার, উদয়গঞ্জ, নবগ্রাম (ঘাটাল থানা), ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ, লাহিরগঞ্জ, জাড়া, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা থানা), রাজহাটি, রঘুনাথবাড়ি (পাঁশকুড়া থানা) পাথরা (মেদিনীপুর সদর)। ঘাটাল মহকুমার পার্শ্ববর্তী হুগলি জেলার সেনহাটিতেও মন্দির-সূত্রধরদের এক প্রধান ঘাঁটি ছিল। এখানকার মিস্ত্রীরা ঘাটাল থানার যে যে স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, কয়েকটি মন্দিরলিপি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি, দাসপুর থানার কোন কোন স্থানেও তাঁরা মন্দির নির্মাণ করেছেন। বহু মন্দির কালকবলিত ও বিধ্বস্ত হওয়ায় জেলার অন্যান্যস্থানেও যে তাঁদের বসতি গড়ে উঠেছিল, তা আজ আর জানার উপায় নেই। বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে উপরিউক্ত স্থানসমূহে যে তাঁদের বসতি ছিল, সেবিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেছে। মন্দিরলিপির ঠিকানায়ও উপরিউক্ত স্থানগুলির কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সূত্রধরদের পদবী ছিল চন্দ্র, দে, দাস, কুন্ডু,শীল, সাঁই। মন্দিরলিপিতেও তাঁদের এই সব পদবী পাওয়া যাচ্ছে। (পরবর্তী তালিকাটি থেকে তা প্রমাণিত হবে।) তবে অনেক লিপিতে তারা নিজেদের সূত্রধর, ছুতার, মিস্ত্রী, কারিগর এইসব পেশাগত পদবীতে ভূষিত করেছেন। কোন কোন মন্দিরলিপিতে 'চিত্রকার', 'শিল্পী' এই নামেও নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। সূত্রধর-সম্প্রদায় মন্দির ও পোড়ামাটির মূর্তি নির্মাণ ছাড়াও কাঠের কাজ ও মাটির পুতুল তৈরি করতেন। দালান নির্মাণও তাদের পেশা ছিল। ময়না থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে ঘোড়াইদের বিরাট দালান তৈরি করেছিলেন দাসপুরের মাধবচন্দ্র মিস্ত্রী ১২৭১-১২৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে। এই দালানের পার্শ্ববর্তী তিনটি মন্দির মাধব মিস্ত্রীরই তৈরি বলে জানা যায়। তিনি আরও পঁচিশটি স্থানে মন্দির তৈরি করেছিলেন। তাঁরই বংশধর সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র ঐ রামচন্দ্রপুর গ্রামেই কাঠের কাজ করেন। সুরেন চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গোষ্ঠচন্দ্র জয়চণ্ডীগ্রামে (পাঁশকুড়া থানা) এখন মাটির পুতুল ও প্রতিমা তৈ রি করেন।

মন্দিরশিল্পী সূত্রধর-সম্প্রদায় কালক্রমে তাঁদের এই পেশা ছেড়ে দিয়ে কাঠের কাজ, প্রতিমা ও মাটির পুতুল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করিতেথাকেন। কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ ভিন্নবৃত্তি জীবিকার জন্য গ্রহণ করেছেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সংখ্যাল্পতাই এর প্রধান কারণ। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই জেলায় কিছু কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছে। কিন্তু তাদের পূর্ব উপজীবিকা পরিত্যাগ করলেও এখনও এই জেলার দাসপুর থানার কোন কোন শিল্পী সাম্প্রতিককালেও মন্দির নির্মাণে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ১৩৭৮ সালে (ইং ১৯৭১) চেঁচুয়া গোবিন্দনগর গ্রামে ঘাঁটিদের সত্যেশ্বর শিবের 'আটচালা' মন্দিরটি

নির্মাণ করেছেন গৌরা ও রাধাকান্তপুর গ্রামের (দাসপুর থানা) যথাক্রমে পঙ্কজকুমার চন্দ ও বিভূতি দে। সিমেন্টের পলেস্তারায় আবৃত ক্ষুদ্রাকৃতি এই মন্দির নির্মাণ করতে প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন ঘাঁটির সেসময় খরচ পড়েছিল ছয় হাজার টাকা। মেদিনীপুর শহরের সুকুলপাড়ায় (মাণিকপুর মহল্লা) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে শিবের একটি ছোট্ট 'আটচালা' মন্দির নির্মাণ করেছেন পাঁশকুড়ার এক মিস্ত্রী শেখ আখতার। প্রতিষ্ঠাতা নাড়ুগোপাল সুকুলের কাছে মিস্ত্রীর নাম জানা গেছে। এছাড়া পাঁশকুড়া স্টেশনের কাছে সাম্প্রতিক কালেও একটি 'আটচালা' রীতির মন্দির নির্মিত হয়েছে দেখা যায়। 'চালা', 'দেউল' ও রত্নরীতির বহু সমাধি মন্দির এখনও তৈরি হতে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার গ্রামেগঞ্জে। এ থেকে মনে হয়, মন্দির নির্মাণ-ধারার সাময়িক বিরতি ঘটলেও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর। এছাড়া, গ্রামেগঞ্জে 'চারচালা', আটচালা', রত্ন', 'দেউল'-রীতির বহু সমাধি মন্দির আজও নির্মিত হতে দেখা যায়।

মেদিনীপুর জেলার প্রায় বেশিরভাগ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভূস্বামী জমিদার ও সামন্তরাজ পরিবার। সমৃদ্ধিশালী বণিক-সম্প্রদায়ও মন্দির-নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন কমবেশি। সম্পদ ও বিত্তের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তাঁরা পুণ্যার্জনের জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েছিলেন। রাজা ও ধনী ভূস্বামীদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা এক পারিবারিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অপরপক্ষে, বিত্তবান বণিক-সম্প্রদায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ সাধারণ অবস্থা থেকে ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা যে সব ব্যক্তি প্রভূত বিত্ত লাভ করেছিলেন তারা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য সেকালে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন বড়োলোক হলেই 'দুর্গাদালান' বা 'কালী-দালান' তৈরি করে মহাসমারোহে পুজো করা এক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ বেশির ভাগ বিত্তবানদের এক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দৈবানুকূল্য ছাড়া অধিকতর ঐশ্বর্যলাভ সম্ভবপর নয়। এইভাবে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। জমিদার ও ভূস্বামীরা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ জাতীয় হলেও বণিক ও ধনবান্ কৃষিজীবী পরিবার সেসময় তথাকথিত নীচু জাতি বলে সমাজে গণ্য ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় এই সব সমৃদ্ধ পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছিলেন সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তাম্বুলি, তন্তুবায়, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, গোপ, কর্মকার-জাতি। এই জেলায় যেসব বৈষ্ণব মঠ-মন্দির আছে, সেগুলি বৈষ্ণব মঠাধ্যক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও কোন সম্পন্ন ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় সেগুলি নির্মিত হয়েছিল। কোন কোন সমৃদ্ধিশালী তথাকথিত নীচুজাতীয় ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ ক'রে বৈষ্ণব গোস্বামীকে দান করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও এই জেলায় বহু দেখা যায়। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এই জেলার নানা স্থানে মাহিষ্য ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেক বৈষ্ণব মন্দির নির্মিত হয়েছিল। উচ্চ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থপরিবারও কিছু কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই অল্প।

উপরিউক্ত আলোচনায় মন্দির-সূত্রধর ও প্রতিষ্ঠাতার যে বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে, তার মূল সূত্র হচ্ছে মন্দিরলিপি। কিন্তু বহু লিপিবিহীন মন্দির আজও রয়েছে মেদিনীপুর জেলায়, যাদের স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আবার, অনেক লিপিযুক্ত মন্দিরেও এঁদের কারুরই নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এবিষয়ে তাই আমাদের জ্ঞান আজও সীমিত।

৯
অন্যান্য জেলার মন্দির : একটি সমীক্ষা

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি ও পলিমাটি অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় হুগলি, হাওড়া, উত্তরচব্বিশ পরগণা , বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় শেষমধ্যযুগে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এগুলির কিছু কিছু 'টেরাকোটা'-অলংকরণেও সমৃদ্ধ। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এদের বেশির ভাগ বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের অনুরূপ। ইঁটের মন্দিরই বেশি। পাথরের মন্দির প্রায় নেই বললেই চলে। গাঙ্গেয় উপত্যকার সহজলভ্য পলিমাটিতে গড়া এই মন্দিরগুলিতে কোমলতা ও সৌকুমার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকার এই অঞ্চলকে বাংলার মন্দিরের 'হৃদয়ভূমি' বলা যায়। উত্তরবঙ্গের মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের তুলনায় খাঁটি বাংলা-রীতির মন্দির এইদিকেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে বেশি। 'চালা', 'চাঁদনি', 'দেউল', 'রত্ন' সব রীতির মন্দিরই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভেদও ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়, যেমন, মহানাদের (হুগলি) লালজীউর মন্দির (১৮৫১), নদীয়ার 'শিবনিবাস' ও 'গঙ্গাবাসে'র মন্দির। হুগলির সুখাড়িয়ায় (বলাগড়) এবং বর্ধমানের কালনায় আকর্ষণীয় কয়েকটি 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি যেগুলির তুলনা পশ্চিমবাংলায় বিরল। পক্ষান্তরে, সুবিখ্যাত নবদ্বীপে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কোন মন্দিরের অভাব আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈষ্ণব ভক্তিবাদ- আন্দোলনের ফলে বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও অলংকরণের যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল, শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান সেই নবদ্বীপে তার কোন নিদর্শনই প্রায় নেই। এখানের প্রায় সব মন্দিরই আধুনিক ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত। পক্ষান্তরে, হুগলি ও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে যে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা মন্দির তৈরি হয়েছিল, তা বাংলার মন্দিরশিল্পের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় বেশ কিছু মন্দির খ্রীস্টীয় সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। দশঘরার (হুগলি) বিশ্বাসদের গোপীনাথের পঞ্চরত্নটি (১৭২৯) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মন্দিরটির সামনে টেরাকোটামূর্তি-অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। যদিও ১৯৩৭ সালে সংস্কারের সময় কয়েকটি নতুন মূর্তিফলক বসানো হয়। বাঁশবেড়িয়ায় (হুগলি) অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯ খ্রী:) টেরাকোটা- অলংকরণে সমৃদ্ধ জেলার একটি প্রসিদ্ধ মন্দির। এরই পাশে বিখ্যাত হংসেশ্বরীর 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দিরটি (পাথরে তৈরি,১৮১৪ খ্রী:) স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অভিনব। এর 'রত্ন'-শিখরগুলি পদ্মকোরকাকৃতি। বালি-দেওয়ানগঞ্জের 'নবরত্ন'- দুর্গামন্দিরের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এটি একটি 'জোড়বাংলা' মন্দিরের ওপরে স্থাপিত 'নবরত্ন' (আ:১৯ শতক)। ক্ষীরকুণ্ডির (হুগলি) নারায়ণের 'রত্ন'-মন্দিরটি (১৭৭০খ্রী:) উচ্চ দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু আয়তনে অপ্রশস্ত। এর 'রত্ন'-শিখরগুলি 'পিঢ়'-রীতির। জয়দেব-কেন্দুলীর (বীরভূম) প্রসিদ্ধ রাধামাধবের 'নবরত্ন' (আ:১৬৮৩-১৬৯২ খ্রী:) 'নবরত্ন'-মন্দিরের এক উল্লেখ্য নিদর্শন। এরও 'রত্ন'-শিখর 'খাঁজকাটা' পিঢ়া এবং নীচের দালানের কার্ণিশ ধনুকের মতো বাঁকা। ত্রিখিলান প্রবেশ-পথের ওপরের প্রস্থে 'টেরাকোটা'-মূর্তির সমারোহ বর্তমান। আসণ্ডার (হাওড়া) শ্রীধরের 'নবরত্ন' (১৭৮৯খ্রী:) খর্বাকৃতি, কিন্তু বৃহদায়তন। এরও 'রত্ন' শিখর খাঁজকাটা 'পিঢ়া'। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-মূর্তি ও অন্যান্য অলংকরণের সমারোহ। কার্ণিশ ধনুকের মতো বাঁকানো ও সুদৃশ্য। ঘুড়িষায় (বীরভূম) লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন'-মন্দিরটিতে (১৮৩৯ খ্রী) উনিশ

শতকের অবক্ষয়ী শৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। নীচের দালানটির ওপরের ছাদের চারপাশে পাকা রেলিং দেওয়া বারান্দা, কার্ণিশ সোজা। 'রত্ন'-শিখর খাঁজকাটা 'পিঢ়া'। কিন্তু ইলামবাজারের (বীরভূম) লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন'-মন্দির (১৮৪৬ খ্রী:) এক বলিষ্ঠ 'রত্ন'-শৈলীর উদাহরণ। ধনুকের মতো বাঁকানো কার্ণিশ এবং পিঢ়-শৈলীর রত্ন-শিখরগুলি কিছুটা ভারী ও গম্বুজাকৃতি।

পশ্চিমবাংলায় পূর্বোক্ত 'দেউল'- রীতির মন্দিরের আঞ্চলিক বিশেষরূপ ধরা পড়েছে। এগুলির 'শিখর' (গণ্ডী) অংশ অনেকগুলি সমান্তরাল 'পিঢ়ার' সমষ্টি। শ্রীরামপুরের (হুগলি) বিখ্যাত মাহেশের জগন্নাথের দেউল মন্দির এবং চৌধুরীপাড়ায় মহাপ্রভুপার্ষদ কাশীশ্বরপণ্ডিত- প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দির এই ধরণের। মাহেশের মন্দিরটির নতুন করে নির্মাণ ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হলেও 'চৌধুরীপাড়া'র মন্দির ষোল শতকের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অব্যবহিত পরে বলে সংস্কারকালীন লিপিতে উল্লিখিত আছে। কুলীনগ্রামের (বর্ধমান) মদনগোপালের 'দেউল'-মন্দিরও ঐরূপ এবং ষোল শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে মনে করা হয়। বক্রেশ্বরে (বীরভূম) বক্রনাথ শিবের মন্দিরও (১৭৬৩ খ্রী:) কতকটা ঐরূপ। তবে এতে ওড়িশী 'রেখ'-দেউলের ভাব স্পষ্ট। উনিশ শতকে 'দেউল' মন্দিরের অপর এক সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন রূপ পশ্চিমবাংলার কোন কোন অঞ্চলে লক্ষ্য করা গেছে। এর বৈশিষ্ট্য হোল, দেউলের 'শিখর' কতকটা গম্বুজাকৃতি, খাঁজগুলি সমান্তরাল সরলরেখায় বিন্যস্ত। খাঁজগুলি শীর্ষদেশ থেকে নীচের দালানের ছাদের ওপর পর্যন্ত ঈষৎ বক্র রেখার দ্বারা বিভাজিত হওয়ায় স্থাপত্য-সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়েছে। এর কয়েকটি নিদর্শন হোল, সোনামুখীর (বাঁকুড়া) চন্দ্রপাড়ায় 'চন্দ্র'-পরিবারের শিবের দেউল, কালনার (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বরের দেউল (১৮৪৯ খ্রী:), চেতুয়া-বাসুদেবপুরের (দাসপুর, মেদিনীপুর) 'বারোয়ারিতলা'য় শিবের দেউল, শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) দেউল, দেবীপুরের (বর্ধমান) লক্ষ্মীজনার্দনের দেউল (১৮৪০-১৮৪৪) খ্রী: প্রভৃতি। শেষোক্তটিতে একটি সুদৃশ্য 'একচালা' মণ্ডপ যুক্ত হওয়ায় মন্দিরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া ও বর্ধমান অঞ্চলে এই শৈলীর অপর একটি আঞ্চলিক রূপ বীরভূমের কোন কোন স্থানে লক্ষ্য করা গেছে। এটি কবিলাসপুরের 'ধর্মরাজের মন্দির' নামে পরিচিত (১৬৪৩ খ্রী:)। এই ধরণের মন্দিরের নীচে (বাঢ়) ও ওপরের (গণ্ডী) অংশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 'মন্দিরটির গঠনপ্রণালী একটু বিচিত্র ধরণের। মন্দিরের 'পা-ভাগ' অর্থাৎ ভিত্তিবেদী হইতে শিখরটি কৌণিকভাবে উদ্‌গত হইয়া 'মস্তকে' উপনীত, মধ্যের 'বাড়' ও 'গণ্ডী'র মধ্যে কোন ব্যবধান দেখা যায় না'। এই ধরণের অপর এক দেউল সিউড়ি থানার অন্তর্গত ভাণ্ডীরবনের বিভাণ্ডীশ্বর শিবের ইঁটের তৈরি 'রেখ'-দেউল (১৭৫৪ খ্রী:)। মন্দিরটি কবিলাসপুরের তুলনায় অধিক উচ্চ এবং দেওয়ালের রেখাগুলি সোজা ওপরের দিকে উঠে পরে ঈষৎ বক্রাকার হয়ে শীর্ষে মিলিত হয়েছে। অপর আর একটি এ-ধরণের মন্দির হোল মহুলার মউলেশ্বর শিবের। কবিলাসপুর মন্দিরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য স্পষ্ট। মন্দিরটি পাথরে তৈরি।

মুর্শিদাবাদের বড়নগরে পূর্বোক্ত 'চারবাংলা' নামে পরিচিত মন্দির (১৭৬০ খ্রী:) 'চালা'- শৈলীরই নামান্তর। বড়নগরে 'চালা'র অপর একটি উল্লেখ্য নিদর্শন ভুবনেশ্বরের মন্দির। মন্দিরটির ছাদ ঢালু আটটি চালের সমষ্টি এবং এর শীর্ষভাগে স্থাপিত রয়েছে ওল্টানো পদ্ম (ইন্‌ভারটেড্ লোটাস) এবং তার ওপরে সম্ভবত চারদিকে ধারযুক্ত ঘন্টা। দক্ষিণ বাংলার নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় পূর্বোক্ত শৈলীর প্রায় সব মন্দিরই লক্ষ্য করা গেছে। নদীয়া জেলার কিছু মন্দিরের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। 'শিবনিবাসে' (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বুড়ো-শিবের (রাজরাজেশ্বর) মন্দিরটি (১৭৫৪

খ্রী:) এক অভিনব স্থাপত্যের পরিচায়ক। সু-উচ্চ এই মন্দিরটির চাল 'চালা'-আকারের হলেও এটি কতকটা গির্জার চূড়ার ন্যায় এবং নীচের অংশেও গির্জার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। নবদ্বীপের মন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই। উত্তর চব্বিশপরগণার দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর 'নবরত্ন' মন্দির (১৮৫৫ খ্রী:) বিশ্বখ্যাত। এর সঙ্গে শিবের বারোটি আটচালা- ও উল্লেখ্য। এই 'নবরত্নটির সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে তালপুকুরের (ব্যারাকপুর) অন্নপূর্ণার 'নবরত্নের'। ভবতারিণীর মন্দিরের প্রায় সমসময়িক এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণিরই এক কন্যা। এখানে ছয়টি 'আটচালা' শিবমন্দিরও বর্তমান। হালিশহরের (উত্তর চব্বিশপরগণা) 'বারেন্দ্রগলি'তে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি কয়েকটি 'আটচালা' রীতির মন্দির টেরাকোটা-অলংকরণে সমৃদ্ধ।

উপরিউক্ত শৈলীর মন্দির ছাড়া পশ্চিম বাংলায় আরও যে চারটি শৈলী পরিচিত হয়ে উঠেছিল, সেগুলি হোল, 'চাঁদনি', 'দালান' 'দোল' ও 'রাসমঞ্চ'। 'চাঁদনি' ও 'দালান' দুটিই সমতল ছাদযুক্ত সৌধ। কার্ণিশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমরেখ, অল্পক্ষেত্রে বক্রাকৃতি। কিন্তু 'চাঁদনি'- রীতি 'দালান' অপেক্ষা অপ্রশস্ত ও ক্ষুদ্রাকৃতি। সম্মুখস্থ আবৃতমণ্ডপে দুই বা তিনের বেশি 'খিলান'-প্রবেশপথ থাকে না, পক্ষান্তরে, 'দালান' বৃহদাকৃতি। এই রীতির স্থাপত্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আঠার-উনিশ শতকে উদ্ভূত এবং এতে যুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। অনেক দালানে 'গথিক' স্তম্ভ লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, 'চাঁদনি' শৈলীটি বহু প্রাচীন। গুপ্তযুগে এ ধরণের মন্দির নির্মিত হোত। বাংলায় এই রীতি নূতনভাবে উদ্ভূত হোল, কিন্তু আকৃতির তেমন কোন পরিবর্তন হোল না। এই রীতির অসংখ্য মন্দির গ্রাম-গ্রামান্তরে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন লিপিসাক্ষ্যে 'চাঁদনি ও 'দালান' যে দুটি পৃথক্ শৈলী তাও প্রমাণিত। বহু সুদৃশ্য দুর্গা ও কালীদালান তৈরি হয়েছিল আঠার-উনিশ শতকে যেগুলিকে 'পঙ্কের অলংকরণে' সজ্জিত করা হয়েছিল। 'রাসমঞ্চ'-শৈলীর স্থাপত্যকে 'রত্ন' শৈলীও বলা যায়। কেননা, গোলাকার বা বর্গক্ষেত্রাকার উচ্চ মঞ্চের ওপর অবস্থিত সবদিক উন্মুক্ত সৌধটির ছাদের চারপাশে যে চূড়াগুলি স্থাপন করা হোত, সেগুলি বেশির ভাগই ছিল বেহারি রসুনের মতো। তাই দাসপুরের (মেদিনীপুর) সূত্রধরেরা একে 'বেহারিরসুন চূড়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ধরণের চূড়ার সন্নিবেশ একরূপ প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। সারা পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের চূড়া রাসমঞ্চে লক্ষ্য করা যায়। ম্যাক্কাচ্চন একে 'European boroque art' বলেছেন। রাসমঞ্চের চূড়াগুলিও সংখ্যায় পঁচিশটি পর্যন্ত নির্মিত হোত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাসমঞ্চে 'রেখ'-দেউল বা 'পিঢ়া' রত্নও স্থাপিত হতে দেখা গেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গির্জার কোণাকৃতি 'টাওয়ারের' মতো করেও এর রত্নগুলি তৈরি হোত। দৃষ্টান্ত, মহিষাদলের (মেদিনীপুর) অধুনালুপ্ত রাসমঞ্চ (১৮২৭ খ্রী:)। 'দোলমঞ্চ' একটি উচ্চ পীঠিকা বা বেদির ওপর অবস্থিত চারদিক খোলা একটি দেউল বা পিঢ়াশৈলীর 'রত্ন', কোন কোন ক্ষেত্রে উন্মুক্ত 'চারচালা'ও স্থাপিত হ'ত।

উক্ত প্রথাগত শৈলীর মন্দিরস্থাপত্যের অঞ্চলবিশেষে আরও কিছু পরিবর্তন হয় উনিশশতকে। কোন কোন মন্দিরের চূড়া গির্জার আকারে তৈরি হতে থাকে, যেমন মহানাদের (হুগলি) লালজীউ (১৮৫১ খ্রী:)। বর্তমান বাংলাদেশে আরও কিছু বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যার দৃষ্টান্ত রাজশাহী ও অন্যান্য জেলায় আছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলসমূহে মন্দির সমাবেশের আধিক্যের কথা বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, ঐ মন্দিরগুলির বেশির ভাগই ইঁটের তৈরি এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ,

পাথর এই অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য আর ইঁটের মন্দিরগুলি শতকরা দশ থেকে পনের ভাগ টেরাকোটা- অলংকরণে সজ্জিত। বহু প্রাচীন মন্দির কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেলেও অবশিষ্ট যা বর্তমান, তাও অসংখ্য। মধ্যযুগের শেষভাগে মন্দির-নির্মাণের বন্যা নেমে এসেছিল। উনিশ শতকের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে পড়ে, যদিও বর্তমান বিংশ শতকে মন্দিরনির্মাণ-ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু তা খুবই ক্ষীণ এবং বিশেষত্ববর্জিত।

দক্ষিণ বাংলায় মন্দিরগুলির প্রচুর সমাবেশ ও অলংকরণ-বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে আমরা যদি উত্তর বাংলার দিকে তাকাই, তাহলে তা যে হতাশাব্যঞ্জক হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার নিজস্ব 'চালা', চাঁদনি, 'দালান', 'রত্ন' ও 'দেউল' রীতির মন্দির উত্তর বাংলার কোন কোন জেলায় থাকলেও তা সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও অলংকরণের দিক থেকে খুবই সাধারণ মানের বলা যায়। যদিও বহু প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ উত্তরবাংলায় নানা স্থান থেকে উদ্ধার হওয়ায় অনুমান করা যেতে পারে এই দিকে পাল-সেন আমলের উচ্চ 'শিখর'-মন্দির বেশ কিছু তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা আজ আর অবশিষ্ট নেই। পাল-সেন আমলের বলে অনুমিত মালদহ জেলার বামনগোলা থানার হরিহর শিবমন্দির। গৌড়ের 'দোচালা' মন্দিরের কথা আগেই বলা হয়েছে। জগদলা গ্রামের (বামনগোলা, মালদহ) শিবের 'একরত্ন' এবং মালদহ থানার আইহোতে শিবের দুটি 'একরত্ন' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরে পুরাতাত্ত্বিক অজস্র নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য। অপরূপ শিল্পের নিদর্শন ঐ মূর্তিগুলি এই অঞ্চলের নানা স্থানের প্রাচীন মন্দিরে যে অবস্থিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া সেসব মন্দিরের কোন অস্তিত্ব নেই। তর্পণদীঘির কাছাকাছি করদহে (তপন থানা) আঠার শতকে তৈরি একটি ইঁটের মন্দির বর্তমান। দেবগ্রামে শিবমন্দির, দোলমঞ্চ ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। ইটাহার থানার অন্তর্গত পোর্ষায় 'পালযুগের' একটি দ্বিতল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিন্দোলেও (রায়গঞ্জ) একটি প্রাচীন মন্দির আছে। অনুমান, এটি ষোড়শ শতকে নির্মিত। সোনাপুরের একটি প্রাচীন মন্দিরে নবদুর্গা মূর্তি স্থাপিত। উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ির সব চেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দির জল্পেশ বা জল্পেশ্বরের (ময়নাগুড়ি থানা) মন্দিরটির স্থাপত্য-শৈলী তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়, একটি দালানের ওপর গম্বুজশীর্ষ 'দেউলরত্ন' স্থাপিত, বর্তমান মন্দির বিশেষ পুরানো নয়। প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বর্তমান বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই মন্দির নতুন করে তৈরি করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সব মন্দিরই ময়নাগুড়ি থানা ও সদর জলপাইগুড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ময়নাগুড়ি থানার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হোল, পূর্বডহর, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, ধূমবাবা, সদরখৈ, পেটকাটি। সদর জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির বৈকুণ্ঠনাথ ও কালীমন্দির উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার জেলার অধিকাংশ মন্দির কোচবিহার শহরের নানা স্থানে অবস্থিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দির কোচবিহার রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহনের। মন্দিরটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য প্রথাগত শৈলীর 'একরত্ন' না হলেও বহুদ্বারযুক্ত একটি বৃহদায়তন দালানের ওপর একটি গম্বুজাকৃতি 'রত্ন' স্থাপিত। জনশ্রুতি অনুসারে কোচবিহার রাজবংশের তৃতীয় রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৫৪-১৫৮৮ খ্রী:) এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এ বিষয়ে মতানৈক্যও আছে। কোচবিহারের অপরাপর মন্দির হোল, অনাথনাথ শিবমন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। অনাথনাথ শিব মন্দিরটি 'ইঁটের তৈরি ...২ ফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত ....কোচবিহারের অন্যান্য মন্দিরের মত এই মন্দিরটিও চারকোণা এবং বাঁকানো চালের উপর গম্বুজবিশিষ্ট। গম্বুজের উপর পদ্ম-আমলক-কলস ও ত্রিশূল ইত্যাদি পরপর স্থাপিত। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা কে'তা সঠিকভাবে জানা যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের (১৮৪৭-১৮৬৩ খ্রী:) রাণী নিশিময়ী দেবী সম্ভবত: মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কোচবিহারের কামতেশ্বরী মন্দির ও মধুপুরধামের মন্দিরও পরিচিত। কোচবিহারের একটি প্রাচীন মন্দির বাণেশ্বর শিবের। মন্দিরটি চতুষ্কোণাকৃতি ও পশ্চিমমুখী। মন্দিরের উপরি ভাগে স্থাপিত আছে একটি গম্বুজ। অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজটির উপর যথারীতি পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল স্থাপিত আছে। পূর্বোক্ত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির সম্পর্কে বলা হয়েছে, আটকোণাযুক্ত দেওয়ালের উপর গম্বুজ-শোভিত মন্দির কোচবিহার জেলার অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। এক্ষেত্রে মন্দিরটির প্রস্থচ্ছেদ আটকোণা অর্থাৎ প্রায় বৃত্তাকার হওয়ায় এর ওপর কোন গ্রীবা নির্মাণ করা হয়নি। খিলানযুক্ত দেওয়ালের ওপর 'লহরা' থেকে সৃষ্ট বৃত্তের উপরেই গম্বুজটি স্থাপন করা হয়েছে।' কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলের শেষ দিকে (১৭৮৩-১৮৩৯) মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল অনুমান করা যায়। জেলার ধলুয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবমন্দির 'পঞ্চরত্ন'-রীতির হলেও কেন্দ্রীয় বৃহত্তম রত্নটি নেই। পোড়ামাটির ফলকযুক্ত এরকম সুদৃশ্য শিবমন্দির কোচবিহার জেলায় আর নেই। এমনকি, একমাত্র পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাড়া উত্তরবঙ্গের অন্য স্থানে এরূপ পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত মন্দির বিরল : মন্দিরটির আনুমানিক প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯৯-১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।

উত্তর বাংলার উপরি উক্ত মন্দিরগুলি ছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে। কিন্তু দক্ষিণবাংলা, বিশেষকরে,গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের পূর্বোক্ত জেলাগুলিতে মধ্যযুগে মন্দির-শিল্পের যে অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তার সেরূপ প্রভাব উত্তরবাংলায় পড়েনি। মন্দিরের স্বল্পতা ও বৈচিত্র্যহীনতা এটাই প্রমাণ করে। পশ্চিমবাংলার মন্দিরস্থাপত্যের আলোচনায় তাই দক্ষিণ ও দক্ষিণ- পশ্চিম বাংলাই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। এ প্রসঙ্গে মহানগর কলকাতার দু একটি মন্দিরের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। কলকাতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'আটচালা' মন্দিরই লক্ষ্য করা গেছে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে মণ্ডলদের 'নবরত্ন' মন্দিরটি (উনিশ শতকের গোড়ার দিক) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'রত্ন'-মন্দির অবশ্য আরও আছে। বৌবাজার এলাকায় মহেশ্বরের তিনটি 'নবরত্ন'-ও (১৭৮৫-কেনডারডাইন লেন) উল্লেখযোগ্য। বৈচিত্র্যপূর্ণ বড়ো কোন মন্দির কলকাতায় এখন আর নেই।

মধ্যযুগে বাংলার মন্দিরশিল্পে টেরাকোটা-অলংকরণের প্রাচুর্য আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের দেবদেবী-লীলা এবং সমকালীন সামাজিক ঘটনা ও ইতিহাসকে মন্দির -টেরাকোটাভাস্কর্যে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া পোড়ামাটির অদ্ভুত অদ্ভুত ফুলকারি নক্‌শা, চুনের নানাবিধ অলংকরণ (স্টাকো) মন্দিরগাত্রে 'পঙ্কচুনে' রঙিন চিত্র ও নক্‌শা অসংখ্য মন্দিরে স্থান পেয়েছিল। মন্দিরের সম্মুখভাগে ছোট ছোট ফলকে মূর্তি ও নকশা-সন্নিবেশ করা হোত। অবশ্য, 'টেরাকোটা'অলংকৃত মন্দির যে সংখ্যায় কম, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মন্দিরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। অবহেলা অনাদরে বাংলার এই প্রাচীন শিল্প ধ্বংসের পথে। কিছু কিছু প্রসিদ্ধ মন্দির সংরক্ষিত করা হলেও বেশির ভাগই ভগ্নজীর্ণ অবস্থায় ধ্বংসের পথে। সুন্দর কারুকার্যযুক্ত বহু 'টেরাকোটা' অলংকরণযুক্ত মন্দিরগুলিও ধ্বংসপ্রায়। পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে এই মন্দির-টেরাকোটার বৈচিত্র্য ও প্রস্তরভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার: *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি*,পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১
চক্রবর্তী, দেবকুমার: *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গসরকার, ১৯৭৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার ও দাশ, সুধীররঞ্জন (সম্পাদিত): *নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত (পুরাতত্ত্ববিভাগ): পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার (সম্পাদিত): *হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত (পুরাতত্ত্ববিভাগ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৬
রায়, প্রণব: *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গসরকার, ১৯৮৬
ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা দেবলা মিত্র): *হুগলি জেলার পুরাকীর্তি*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গসরকার, ১৯৯৩
দাস, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত): *উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি* (মালদহ, কমল বসাক; কোচবিহার, বিশ্বনাথ দাস) ১৯৮৫
Mccutchion, David : *The Temples of Bankura District,* Writers Workshop, Calcutta,1972
Do :*The Temples of Birbhum,* The Viswa Bharati Quarterly, Vol. 31, No.4
Mccutchion, David: *The Temples of Calcutta,* Bengal Past and Present, January-June, 1968
Do : *Late Mediaeval Temples of Bengal, Origins and Classifications,* The Asiatic Society, 1972
Michell, George (ed.) : *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983
রায়, প্রণব: *(নদীয়ার) পুরাকীর্তি* - স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত *'নদীয়া* গ্রন্থে দীর্ঘ প্রবন্ধ। নদীয়ার পুরাতত্ত্বসম্পর্কিত প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭৩।

১০
মন্দির-'টেরাকোটা'য় রামায়ণ

উত্তর ভারতের মতো পূর্ব ভারতে রাম-উপাসনা তেমন জনপ্রিয় না হলেও রামায়ণের কাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে খুবই পরিচিত ছিল। তার সাক্ষ্য মেলে বাংলার 'নবপর্যায়ে'র অসংখ্য ইঁটের মন্দিরে। 'নবপর্যায়ে'র মন্দির বলতে আমরা এখানে শ্রীচৈতন্যোত্তরযুগের নির্দিষ্ট বিভিন্ন শৈলীর মন্দিরের কথাই বলতে চাইছি। এই শৈলীগুলি হোল: 'চালা' (একচালা, দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা), 'রত্ন' (একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, এয়োদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন), 'দালান', 'চাঁদনি' এবং 'দেউল'। এই শৈলীর মন্দির বাংলার গ্রাম ও শহরে অজস্র তৈরি হয় খ্রীস্টীয় পনের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত। এমনকি, বর্তমান বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মন্দির নির্মাণের ধারা কিছুটা অব্যাহত থাকে, যদিও সংখ্যা ও মানের দিক থেকে উৎকর্ষ নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। ইঁট ও পাথর---- এই দুই প্রকার উপাদানে মন্দিরগুলি তৈরি হলেও ইঁটের মন্দিরই বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, পশ্চিম বাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের নদীনালার পলিমাটিতে গড়া সমভূমি এলাকায় ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা যেন অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক বেশি। পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, পূর্ব দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় ইঁটের সুন্দর সুন্দর মন্দির কমবেশি লক্ষ্য করা গেছে, যার অনেকগুলির আয়ুষ্কাল সতের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বলে জানা যায়। ইঁটেরএই মন্দিরগুলিতে ছোটবড় পোড়ামাটির মূর্তি ও নকশা-ফলক সন্নিবেশিত হতে দেখা যায় ষোল শতক থেকে, যদিও সেসময় এর ব্যবহার খুবই অল্প বা সীমিত ছিল। নানা শৈলীর মন্দিরনির্মাণের পর বাইরের দেওয়ালে, বিশেষত সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-ফলক (মূর্তি ও নকশা)- সংস্থাপন মন্দিরের অলংকরণ বা শোভাবৃদ্ধির জন্যে করা হোত। কোন কোন মন্দিরের শুধুমাত্র সামনের দেওয়াল, আবার কোন কোনটির দুদিক, তিনদিক বা চারদিক 'টেরাকোটা' ফলকে সাজানো হোত। অতি অল্প ক্ষেত্রে, যেমন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩খ্রী.) ও কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দিরের (১৬৫৫খ্রী.) ভিতর ও বাইরের দেওয়াল, এমনকি, ওপরের দ্বিতলও অসংখ্য 'টেরাকোটা'-ফলকে সাজানো হয়। পূর্ব দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তনাথের মন্দিরও (১৭৫২খ্রী.) এইরূপ 'টেরাকোটা'-সজ্জিত বলে জানা যায়। কোন কোন স্থানে 'নবরত্ন' বা 'আটচালা' শৈলীর মন্দিরের দ্বিতল কক্ষের দেওয়ালেও 'টেরাকোটা'-অলংকরণ লক্ষ্য করা গেছে। শ্রীচৈতন্যোত্তরযুগে পূর্বোক্ত শৈলীর মন্দিরগুলিতে বাঙালির নিজস্ব স্থাপত্যশিল্পভাবনা ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রাক্-মুসলিম হিন্দুযুগে মগধ এবং গৌড়বঙ্গে উচ্চ 'শিখর' যুক্ত যেসব দেউল মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার খুব কমই এখন অবশিষ্ট থাকলেও তাতে মূর্তিসন্নিবেশের থেকে স্থাপত্যালংকারের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। পাল-সেন আমলে তৈরি বর্তমান ইঁটের মন্দিরগুলির মধ্যে বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর এবং সোনাতপলের তথাকথিত ভগ্ন সূর্যমন্দির, বর্ধমানের সাতদেউলিয়ার জীর্ণ দেউল, দক্ষিণ চব্বিশপরগণার জটার দেউল মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইঁটের মন্দিরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে রাজশাহীর পাহাড়পুরের সোমপুরবিহারে, উত্তর চব্বিশপরগণার চন্দ্রকেতুগড়ে এবং মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে। উল্লেখ্য, এই সব স্থানের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেশ কিছু মন্দির-টেরাকোটা ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে।

মন্দিরের বাইরের দেওয়ালকে এই সব ফলক দিয়ে সাজানো হোত। পাহাড়পুরের প্রসিদ্ধ সোমপুরবিহারের 'টেরাকোটা'ফলকগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আমাদের আকৃষ্ট করে। বিহারটি খ্রীষ্টীয় নবম শতকে পালসম্রাট ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়। ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিহারও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এগুলিও নানা শ্রেণীর 'টেরাকোটা'ফলকে সজ্জিত ছিল। সেগুলির সঙ্গে পাহাড়পুর-ফলকের সাদৃশ্য কিছুটা স্পষ্ট হলেও বৈসাদৃশ্যও আছে, পাহাড়পুরের ফলকগুলিতে রামায়ণীয় ও পৌরাণিক দৃশ্যাবলী ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্যপটও উৎকীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঐ ধরণের টেরাকোটাফলক পাল-সেন যুগের পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে আর পাওয়া যায়না। কার কারও ধারণা, 'টেরাকোটা'-শিল্পের এই ধারা বা শৈলী (যাকে 'লোকায়ত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে) পরবর্তীকালে কোন কারণে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই শৈলীর নির্দর্শন পাহাড়পুর ছাড়াও প্রায় সমসাময়িক কালে মহাস্থানগড় (বগুড়া, বাংলাদেশ) এবং ময়নামতীতেও (কুমিল্লা, বাংলাদেশে) পাওয়া গেছে।[১]

উপরি উক্ত স্থানসমূহের মন্দিরগুলি খ্রীঃ অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত বলে অনুমিত। এগুলিতে যেসব 'টেরাকোটা'ফলক পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রামায়ণের কোন কোন কাহিনী রূপায়িত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথার নানা গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথার নানা কাহিনী এই ফলকগুলিতে দেখা যায়। কিন্তু সেই সব গল্পের আবেদন লোকায়ত সমাজজীবনে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।[২] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় ফলকগুলিতে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার স্পর্শ সামান্যই, কিন্তু লক্ষণীয়, ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ বোধ। .....এই শিল্প একান্তই লৌকিক। শিল্প প্রথাবদ্ধ প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ নাই। ....জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নির্দশনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায় নাই, সে স্পর্ধাও ছিল না'।[৩]

বাংলার একান্ত নিজস্ব শৈলীতে নির্মিত এই ধরণের মন্দিরটেরাকোটা -ফলকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী কয়েকশতক পরে খ্রীষ্টীয় ষোলো-সতেরো শতক থেকে মন্দিরদেওয়ালের অলঙ্করণ রূপে আবার ব্যবহৃত হতে থাকে। এ সম্পর্কে আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে এই ছ-সাতশ বছরের মধ্যে পাল ও সেন রাজাদের শাসনাধিকার, মুসলমানবিজয়, সুলতানী আমলে দেশজ স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশের পথে বাধা মন্দির টেরাকোটা শিল্পের নব রূপায়ণে কোনরূপ উৎসাহ সঞ্চার করেনি। কারণ, সেসময় মন্দিরনির্মাণে কোন উচ্চ পরিকল্পনা রাজকীয় শাসনে নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য, তার আগে দশম শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ইঁটের উচ্চ শিখরযুক্ত বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সব মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক দেবদেবীলীলাদৃশ্য একান্তভাবেই অনুপস্থিত ছিল। এই সময়কালের বহু মন্দিরই ছিল বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির। হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিফলক স্বাভাবিকভাবেই তাতে সন্নিবেশিত হয়নি। ষোল শতকের প্রারম্ভে সুলতানী আমলের অবসান ও মুঘল শাসনকালে সাধারণ মানুষের ভাব ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ বাংলাসাহিত্যের যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায় রামকথা ও ভারতকথা কাব্যে, মঙ্গলকাব্যসৃষ্টিতে, বিভিন্ন পাঁচালী ও গীতিগাথায় এবং বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে, তাতে বাঙালি-সংস্কৃতির এক নবজাগরণ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতকথার অসাধারণ জনপ্রিয়তা সাধারণ গ্রাম্য সহজ সরল মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। এই সময় থেকেই রামকথা ও পৌরাণিক

কাহিনীগুলির দৃশ্যচিত্র 'টেরাকোটা'-মন্দিরগাত্রে স্থান পেতে থাকে। এই শিল্পের অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল সম্পূর্ণ দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা, যা ছিল 'রাজপ্রাসাদ, অভিজাতচক্র এবং পুরোহিতবর্গের শাস্ত্রানুগ শিল্পের স্পর্শবিমুক্ত'।[৪] মন্দিরস্থাপত্যেও দেখা গেল বাঙালির নিজস্বতা- 'চালা', 'রত্ন', সহজ সরল 'দেউল'-শৈলীর সৃষ্টির মধ্যে। এই নবপর্যায়ের স্থাপত্য ও অলঙ্করণের সঙ্গে প্রাক্-মুসলিম যুগের স্থাপত্য ও অলঙ্করণের সাদৃশ্য তেমন ছিল না। মুঘল আমলে, বিশেষ করে, সতের শতকের শুরু থেকে ইঁটের মন্দিরকে যে সুন্দরভাবে মূর্তি ও নানা ধরণের নকশাফলকে সজ্জিত করার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় থেকে অন্যান্য অলঙ্করণের মধ্যে রামকথা বা রামায়ণের বিশেষ বিশেষ কাহিনী অলঙ্করণের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। কেউ কেউ মনে করেন মন্দির-অলঙ্করণে রামকথা সেন-রাজাদের আমল থেকে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু রাম বা রামসীতার মূর্তিপূজা সে সময় অজ্ঞাত ছিল।[৫] পূর্বভারতে, বিশেষ করে, বাংলা ও অসমে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রাম-উপাসনা চলিত হলেও রামকে বিষ্ণুর অবতারভাবে পূজা করা খুব একটা ছিল না। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচররূপে কেউ কেউ রামভক্ত ছিলেন, যেমন, মুরারিগুপ্ত। চৈতন্যদেব তাঁকে কৃষ্ণভজনার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু মুরারির রামনিষ্ঠা লক্ষ্য করে চৈতন্যদেব নিরস্ত হন।[৬] পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের প্লাবনে কৃষ্ণ-আরাধনা বাঙালি-সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হলেও রাম-উপাসনাও ভক্তিধর্মের প্রভাবে এক নতুন মাত্রা লাভ করে। বাংলার নবপর্যায়ের ইঁটের মন্দিরে 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণের যে প্রাচুর্য সতের শতক থেকে লক্ষ্য করা যায়, সেখানে কৃষ্ণলীলাদৃশ্যচিত্র প্রধান স্থান অধিকার করলেও রামায়ণকাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণভক্তির প্রচারক হলেও রামকথা মন্দির-অলঙ্করণের জন্যে অসংখ্য 'টেরাকোটা'-মন্দিরে আবশ্যিকরূপে স্থান পেয়েছিল। এর মূলে ছিল রামের অবতাররূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ যখন রচিত হয়, সেসময় থেকে রাম অবতারভাবে স্বীকৃত হন। যদিও আরও আগে তিনি পূজিত হতেন, কিন্তু জনমনে তিনি ভক্তির স্থান লাভ করেন নি। রামকে ভক্তিভাবে আরাধনা করার প্রথা শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মপ্রভাবিত হলেও তাঁরও অনেক আগে সারা ভারতে রামানন্দের (১২৯৯খ্রী.) অনুগামীরা রামভক্তিধর্ম প্রচার করেন।[৭] মুঘল আমলে বাংলায় বহু রামায়েৎ সাধু এসে রাম পূজা প্রবর্তন করেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষক বেশির ভাগ ছিলেন পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রী রাজপুত ও ব্যবসায়ী। এঁরা যুদ্ধ ও ব্যবসা উপলক্ষে এখানে এসে বসতি করেন। পশ্চিমভারতে এই রামভক্তিধর্ম পূর্বভারতের তুলনায় বেশি জনপ্রিয় ছিল।[৮] মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা এবং অন্যান্য স্থানে রামায়েৎ-সাধুদের দ্বারা অনেক 'অস্থল' বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রামায়েৎ সাধুদের দ্বারা বাংলায় রামভক্তি বা রাম- উপাসনা প্রচারিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৯] বাংলার গ্রাম-শহরে রাম বা রামসীতার কিছু কিছু মন্দিরও তৈরি হয়। রাম-উপাসক কোন কোন রাজা-জমিদার ঐ মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন, চন্দ্রকোণার অযোধ্যাপল্লীতে রঘুনাথবাড়ির রঘুনাথের দেউল-মন্দির ও ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমানের রাজা, একথা জানা যায়। রামায়েৎ-সাধুদের প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রকোণার রামানুজ ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের 'অস্থল' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং অন্যান্য জেলায় রামচন্দ্র বা রঘুনাথের নামে কিছু কিছু মন্দিরও তৈরি হয় এবং সেখানে রাম-সীতা বিগ্রহ স্থাপিত হয়। গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রমন্দির ও ভদ্রকালীর 'রামবাড়ি' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। রামায়েৎ সাধুদের কিছু কিছু 'আখড়া'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্টগোমারি মার্টিন দিনাজপুরে রামায়েৎ-সাধুদের একটি আখড়া মঠ দেখেছিলেন যেখানে এক মোহন্তের অধীনে সাধুরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করতেন।[১০]

সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে ইঁট ও পাথরের যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়, তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে বহু রাম বা রঘুনাথ মন্দিরও ছিল। এগুলি 'বিষ্ণুমন্দির' নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। রামায়েৎ-সাধুদের দ্বারা রামের উপাসনা প্রচারিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করলেও এর কারণ ছিল অন্য।

শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের কিছু আগে থেকেই বাঙালির মধ্যে বিষ্ণুভক্তির উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। বিষ্ণুর অবতাররূপে রাম ও কৃষ্ণ জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। রামকথা-অবলম্বনে মহাকবি কৃত্তিবাস রচনা করেন তাঁর ভক্তিরসাশ্রিত মহাকাব্য রামায়ণ। এই কাব্যের সঠিক রচনাকাল আজও নির্ণীত হয়নি। তবে সুকুমার সেনের মতে এই কাব্য শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে রচিত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে ষোল শতকের প্রথমভাগে রামায়ণরচয়িতা কৃত্তিবাসের নাম অজ্ঞাত ছিল।[১১] তবে শ্রীচৈতন্যের সমকালে 'রামচরিত নাটগানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল।' আবার, ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে মালাধর বসুরচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে 'রামকথা প্রথম পাওয়া যায়' [১২] কিন্তু কৃত্তিবাস সতেরো শতকের আগে তাঁর জনপ্রিয় রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন নি বলে সুকুমার সেন মনে করেন। [১৩] এই সময়ে বা কিছু আগে পরে শঙ্কর 'কবিচন্দ্রে'র লেখা রামায়ণ বেশ জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া রামানন্দ ঘোষ নামে এক কবি ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে বর্ধমান থেকে 'রামলীলা' নামে এক কাব্য রচনা করেন।[১৪] এছাড়া আরও অনেক রামকথা বা রামপাঁচালী এই সময় রচিত হয়।

উল্লিখিত রামায়ণকাব্যগুলির উপজীব্য বাল্মীকি-রামায়ণ হলেও কবিরা তাঁদের কাব্যে কিছু কিছু নতুন কাহিনী সন্নিবেশিত ক'রে তাকে ভক্তিরসাত্মক করে তুলেছিলেন। ষোল শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভক্তির প্রভাব এঁদের ওপর অবশ্যই পড়েছিল। তাই এযুগের রামায়ণকাব্য হয়ে উঠেছিল ভক্তিরসে আপ্লুত। বিষ্ণুর অবতার রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের ফলে এঁরা আপামর মানুষের কাছে অসাধারণ ভক্তির পাত্র হয়ে উঠলেন। ভক্তিরসাশ্রিত রামকথাকাব্যগুলি কথকতা ও গানের মাধ্যমে সমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রামাবতারের বিভিন্ন লীলা সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে নাড়া দিতে থাকে। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে রামভক্তি মন্দিরস্থপতি ও টেরাকোটাশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করল মন্দিরগাত্রে রামলীলাদৃশ্যফলক সৃষ্টির জন্য।

শ্রীচৈতন্যোত্তর পর্বে অসংখ্য ইঁটের মন্দিরে রামায়ণকথার 'টেরাকোটা'-ফলক এই কারণেই বেশিমাত্রায় সন্নিবেশিত হতে থাকে। একদিকে মন্দিরগর্ভগৃহে রামসীতালক্ষ্মণের বিগ্রহস্থাপন (বহু মন্দিরে শালগ্রাম শিলায় রঘুনাথ রামচন্দ্রের পূজাও অনুষ্ঠিত হতে আমরা দেখেছি), অন্যদিকে, ইঁটের মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে টেরাকোটাফলকে রামায়ণের বিশেষ বিশেষ কাহিনীকে রূপায়িত করা হয়েছিল। এমনকি, অল্পসংখ্যক পাথরের মন্দিরেও রামায়ণের কোন কোন কাহিনীচিত্র লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু যেহেতু ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশি, তাই এখানে 'টেরাকোটা'-মন্দিরই আলোচ্য। কারণ, ইঁটের মন্দিরের 'টেরাকোটা'-ফলকে রামকথার দৃশ্যটি এত সজীব, স্বতঃস্ফূর্ত ও নমনীয় হয়ে উঠেছে যে পাথরের মন্দিরে প্রস্তরখোদিত ভাস্কর্যে তা বিরল। বাংলার নানাস্থানে পোড়ামাটিমূর্তিসজ্জিত যে মন্দিরগুলি দেখা যায়, তার মধ্যে এমন কোন মন্দির নেই যেখানে রামায়ণকাহিনী পাওয়া যায় নি। এর থেকে বোঝা যায়, রামায়ণকথা সেযুগে মন্দিরশিল্পীদের কাছে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের বাংলায় রামায়ণের কবিরা ভক্তিরসাশ্রিত যেসব চরিত্র ও কাহিনী কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি সাধারণ মানুষের অতিপ্রিয় ও পরিচিত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র টেরাকোটায় নয়, পুঁথির কাঠের

পাটায় এবং পটচিত্র বা কালীঘাট পটেও রামলীলাদৃশ্য পটুয়ারা অঙ্কন করেন।[১৫]

মন্দির- 'টেরাকোটা' সজ্জায় রামায়ণের যে বিশেষ কাহিনীগুলির আমরা চিত্ররূপ পাই, সেগুলি হোল: অদিকাণ্ডে উল্লিখিত মর্ত্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, দশরথের পুত্রলাভের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকর্তৃক যজ্ঞ আরম্ভ, রামের জন্ম, রামের হরধনুভঙ্গ, সীতার বিবাহ, অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত কুব্জার সঙ্গে কৈকেয়ীর মন্ত্রণা, পিতৃসত্যপালনের জন্য রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমন। অরণ্যকাণ্ডে সূর্পণখার লক্ষ্মণের প্রতি প্রণয়ভিক্ষা ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, মারীচের মায়ামৃগরূপ ধারণ, রামের মারীচবধ, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাবণের সীতার নিকট ভিক্ষা, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ ও যুদ্ধ। সুন্দরাকাণ্ডের অন্তর্গত অশোকবনে সীতা এবং হনুমানের সীতাদর্শন, হনুমানকর্তৃক লঙ্কাদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনূমানের ভক্তি, সাগরে সেতুবন্ধন, লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ; অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, রামের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু, লঙ্কাযুদ্ধে বিশাল বানরসেনাবাহিনী, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং লক্ষ্মণের জীবনরক্ষার জন্য ঔষধ আনতে হনূমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, রাবণবধের জন্য অকালবোধন, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক এবং রামসীতার সিংহাসনারোহণ। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিশেষ কোন দৃশ্য 'টেরাকোটায়' তেমন চিত্রায়িত হতে দেখা যায় না।

রামায়ণকাব্যে এইরূপ আরও বহু কাহিনী পাওয়া গেলেও উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলি ও আরও কয়েকটি বিষয় মন্দির 'টেরাকোটা'-শিল্পীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দৃশ্যগুলি কমবেশি বাংলার প্রায় সব 'টেরাকোটা'-অলঙ্কৃত মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে কাহিনীসমূহের মধ্যে লঙ্কাযুদ্ধ অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ায় টেরাকোটায় এর দৃশ্যচিত্র প্রায় প্রতিটি মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে প্রবেশপথের খিলানের ওপরের প্রস্থে (সাধারণতঃ কেন্দ্রীয়প্রস্থে) রাম ও রাবণের সম্মুখসমর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উৎকীর্ণ হয়েছিল। 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণের একটি প্রধান আদর্শরূপে (motif) রামায়ণের এই কাহিনীটি গৃহীত হয়। কোন কোন মন্দিরে প্রবেশপথের ওপরের সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রস্থটির বাঁদিকে রথারূঢ় শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং পশ্চাতে বহু বানরসেনা এবং ডানদিকে দশমুখ ও দশহস্তযুক্ত রাবণ বিশাল একটি রথে আরূঢ় এবং তাঁর পশ্চাতে রাক্ষসসেনা। উভয়ে পরস্পরের প্রতি বাণনিঃক্ষেপরত। বানরসেনা ও রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধদৃশ্য বহু মন্দিরে দেখা যায়। আর একটি যে বিষয় মন্দির 'টেরাকোটা'য় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেটি হোল, রাম-রাবণের মাঝখানে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব। সম্ভবতঃ দেবী দুর্গা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃপাবশত তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছেন। এটি 'অকালবোধন'-কাহিনীর স্মারক। রাবণের সীতাহরণ ও জটায়ুকর্তৃক রাবণের রথ-আক্রমণের দৃশ্যও আমরা বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে লক্ষ্য করেছি। এটিও একটি প্রিয় 'বিষয়'(মোটিফ) ছিল 'টেরাকোটা'-শিল্পীদের কাছে। মারীচের মায়ামৃগরূপ ধারণ ও মারীচবধদৃশ্যও মন্দিরটেরাকোটায় একটি প্রিয় বিষয়। এছাড়া, রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনগমন এবং সর্বোপরি রাম-সীতার রাজ্যভিষেকদৃশ্যও অনেক মন্দিরে পাওয়া গেছে। সরেজমিন অনুসন্ধানে ও প্রকাশিত তথ্য থেকে আমরা পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের মন্দিরে রামায়ণ বা রামকথাকাব্যের যেসব দৃশ্যফলক পাই, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উপস্থিত করছি। উল্লেখ্য, রামায়ণকাহিনীর অসংখ্য টেরাকোটা-ফলকের মধ্যে এ তালিকা নেহাতই নগণ্য। তবুও উল্লেখযোগ্য কিছু 'বিষয়' এখানে দেওয়া গেল।

মন্দির (স্থান ও জেলা)	প্রতিষ্ঠাকাল	বিষয় (টেরাকোটা)

বাসুদেবের 'নবরত্ন', রাজগ্রাম (বাঁকুড়া)	আ: ১৯শতক	রামচন্দ্রের সভাগৃহ
লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন', ইলামবাজার (বীরভূম)	১৯শতক	রামের সভা ও যজ্ঞদৃশ্য
শিবের 'আটচালা', লাভপুর (বীরভূম)	খ্রী ১৮৫২	সিংহাসনে রামসীতা
লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন', সুরুল (বীরভূম)	আ: ১৮শতক	রামরাবণের যুদ্ধ, রাবণের সভা, রামের সভা, রাম-সীতার অভিষেক।
শিবের 'পঞ্চরত্ন', বনকাটি (বর্ধমান)	খ্রী ১৮৩২	রামের সভাগৃহ।
জোড়াশিবের দেউল, কালিকাপুর (বর্ধমান)	খ্রী ১৮৩৯	রামের সভাগৃহ।
কান্তজীউর 'নবরত্ন', কান্তনগর (পূর্বদিনাজপুর, বাংলাদেশ)	খ্রী ১৭৫২	রামজন্মের পূর্ববর্তীঘটনা, দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গমুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, রাম সীতার বিবাহ ইত্যাদি।
মথুরাপুরের অষ্টকোণ 'রেখ' দেউল (ফরিদপুর বাংলাদেশ)	খ্রী ১৭শতক	রাম-সীতার বিবাহ।
রামচন্দ্রের 'একরত্ন', গুপ্তিপাড়া (হুগলি)	খ্রী সতের শতক	লঙ্কাযুদ্ধ
'চারবাংলা' মন্দির, বড়নগর (মুর্শিদাবাদ)	খ্রী ১৭৬০	ঋষ্যশৃঙ্গকর্তৃক দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, শ্রীরামের হরধনুভঙ্গ, জনকের সীতাসম্প্রদান, রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের করজোড়ে প্রার্থনা।
কালী-মন্দির, বড়নগর (ঐ)	খ্রী ১৮ শতকের মধ্যভাগ সম্ভবত:	লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং হনুমানের গন্ধমাদনপর্বত আনয়ন
পুঠিয়ার তিনটি 'একবাংলা' মন্দির (রাজশাহী, বাংলাদেশ)	খ্রী ১৮ শতকের শেষদিক	সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, বনবাসে থাকাকালীন সীতার রন্ধন।
পদ্মাকৃতি গম্বুজযুক্ত শিবমন্দির, বলিহার	খ্রী ১৯ শতকের প্রথমদিক	রাম-রাবণের যুদ্ধকালে

(রাজশাহী, বাংলাদেশ)		রাবণের প্রার্থনা
কান্তনাথের 'নবরত্ন', কান্তনগর (পূর্বোক্ত)	খ্রী ১৭৫২	পূর্বোক্তগুলি ছাড়া রামচন্দ্র ও হনূমান

ওপরে উল্লিখিত মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা'-ফলকে রামকথার পূর্বোক্ত দৃশ্যচিত্র ছাড়া আরও অসংখ্য মন্দিরে রামলীলাদৃশ্যের বহু 'টেরাকোটা'-ফলক লক্ষ্য করা গেছে। এখানে আদিকাণ্ড থেকে রামায়ণের অন্যান্য 'কাণ্ডে'র বিশেষ বিশেষ কাহিনীর টেরাকোটা-ভাস্কর্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হোল। যদিও মন্দির'টেরাকোটা'-অলঙ্করণে রামায়ণের আদি বা বালকাণ্ডের কাহিনীর চিত্ররূপ আমরা খুব কমই পাই।

মন্দির (স্থান ও জেলা)	প্রতিষ্ঠাকাল	টেরাকোটা
অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (বাঁশবেড়িয়া, হুগলি)	খ্রী ১৬৭৯	শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ও অযোধ্যায় আনন্দ-উৎসব, শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ এবং জনকরাজকর্তৃক সীতাসম্প্রদান। এখানে আদিকাণ্ডের আরও বহু ফলক ছিল। বর্তমানে সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে।
কালাচাঁদের 'সপ্তদশ রত্ন', রামগড় বিনপুর (মেদিনীপুর)	খ্রী. ১৮৫৫	শ্রীরামচন্দ্রের হরধনু-উত্তোলন, সীতা এবং তাঁর সহচরীদের দর্শন। দণ্ডায়মান নারদ
মথুরাপুরের দেউল (পূর্বোক্ত)	পূর্বোক্ত	বিবাহের পূর্বে সীতার সাজসজ্জা

সীতার বিবাহ-অনুষ্ঠানদৃশ্যে রাম ও সীতা পূজার ঘটের ওপর পরস্পর হস্তধারণ করে আছেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতার অন্যান্য ভগিনীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। এর পর সকলের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরামকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান। এই দৃশ্যটি বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) 'জোড়বাংলা' মন্দিরে দেখা যায়। উল্লেখ্য, বালকাণ্ডের এই ফলকগুলি প্রায় সবই পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির নীচের দিকে ভিত্তিবেদির কিছু ওপরে দেওয়ালে সন্নিবেশিত দেখা যায়। বালকাণ্ডের বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসনিধনের জন্যে রাম-লক্ষ্মণের যাত্রা, পাষাণময়ী-অহল্যার উদ্ধার, তাড়কারাক্ষসীবধ প্রভৃতি দৃশ্যও আমরা কোন কোন মন্দিরে পাই।

অরণ্যকাণ্ডের কাহিনীর মধ্যে রামসীতা ও লক্ষ্মণের বনগমনদৃশ্য, আশ্রমে অবস্থান, যজ্ঞবিঘ্নকারী

রাক্ষসদের নিধন, লক্ষ্মণকর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন উল্লেখযোগ্য। বহু মন্দিরে এই দৃশ্য পাওয়া যায়। অরণ্যকাণ্ডের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় 'সীতাহরণ'। প্রথমে সীতার জন্য শ্রীরামের স্বর্ণমৃগের অনুসরণ, স্বর্ণমৃগ মারীচের দেহটি হরিণের আকার, কিন্তু ঊর্ধ্বভাগ পুরুষ মনুষ্যমূর্তি। এই মূর্তিটি বহু মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর লক্ষ্য করা গেছে। এটি আঠার-উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতেই বেশি পাওয়া যায়। এরপর রামের মারীচের প্রতি বাণনিঃক্ষেপ। রামের অনুপস্থিতিতে সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী রাবণের সীতার আশ্রমকুটিরে আগমন। এই দৃশ্যগুলি দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (খ্রী ১৭৯১) , গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (১৮ শতক) এবং লোয়াদার পরিত্যক্ত রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (খ্রী ১৮০৫ মেদিনীপুর) লক্ষ্য করা গেছে। এই মন্দিরে জটায়ুর রাবণের রথ-আক্রমণ দৃশ্যটি সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। উড়ন্ত 'পঞ্চরত্ন' শৈলীর রথে অসহায় অবস্থায় সীতা এবং সারথিরূপী রাবণ এবং জটায়ু পক্ষীর বিশাল মুখবিস্তার-দৃশ্যটি আঠার-উনিশ শতকের মন্দিরটেরাকোটা-অলঙ্করণের একটি প্রধান বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। জয়দেব-কেঁদুলির রাধাগোবিন্দের 'নবরত্ন' মন্দিরের দেওয়ালে জটায়ুর দেহকে বিশালভাবে বর্ধিত করা হয়েছে দেখা যায়। উনিশ শতকের বহু মন্দিরে জটায়ুর শুধুমাত্র পক্ষ ও চঞ্চু উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সুরৎপুরের শীতলার 'পঞ্চরত্নে' (দাসপুর, মেদিনীপুর, ১৮৪৯ খ্রী:) এইরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে জটায়ু যেন রাবণের রথকে গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করছে। এখানে রাবণের মূর্তিও সুন্দরভাবে খোদিত হয়েছে। আর একটি নতুন দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি পারুলের রঘুনাথের 'আটচালায়' (আরামবাগ, হুগলি, খ্রী. ১৭৬৮)। এখানে জটায়ু সীতাহরণ-সম্পর্কে রামচন্দ্রকে অবগত করাচ্ছেন।

অশোকবনে বন্দিনী সীতা— এই বিষয়টিও মন্দির 'টেরাকোটা'য় গৃহীত হয়েছে। দৃশ্যটি হোল, সীতা একটি রাজকীয় মণ্ডপে কয়েকজন দাসীর দ্বারা পরিবৃত। সতের এবং আঠার শতকের কোন কোন মন্দিরে দেখা যায় হনূমান একটি লতাকুঞ্জে আসীন হয়ে সীতার সামনে দেখা দিচ্ছে। এ দৃশ্যগুলি আছে অমরাগড়ির দধিমাধবের 'আটচালা' (খ্রী.১৭৬৪), দশঘরার গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (খ্রী.১৭২৯), ঝিকিরার দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে (খ্রী.১৭৬৯)। বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদের 'একরত্ন' মন্দিরে (খ্রী.১৬৫৬) দেখা যায়, হনূমান গাছের ওপর থেকে সীতাকে রামচন্দ্রের বার্তা জানাচ্ছে এবং রাবণের প্রহরীরা পলায়নরত হনূমানকে তাড়া করছে।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য একটি উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু বা 'মোটিফ'রূপে মন্দির'টেরাকোটা'য় গৃহীত হয়। লঙ্কাযুদ্ধের আগে যুদ্ধের প্রস্তুতিবিষয়েও কিছু কিছু টেরাকোটাফলক আমরা পাই। যুদ্ধের প্রারম্ভে বানরযোদ্ধা ও সেনাদের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের পরামর্শ, লঙ্কাযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন দৃশ্যটি বহু মন্দিরে পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত পারুলের রঘুনাথের 'আটচালা' মন্দিরে সেতুটি সিঁড়ির মতো করে দেখানো হয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যের প্রাচীনতম রূপায়ণ বৈদ্যপুরের(বর্ধমান) কৃষ্ণের 'দেউল'মন্দিরে (খ্রী.১৫৯৮) লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের ওপর এই ফলকগুলি সজ্জিত। দুদিকে বানর অনুচর ও মাঝখানে ধনুর্ধারী যোদ্ধারা রথারূঢ় হয়ে শরনিঃক্ষেপরত। সতের শতকে নির্মিত কোন কোন মন্দিরে রাম-রাবণ সম্মুখসমরে লিপ্ত। উভয়ে অদ্ভুত ধরণের মকরমুখ রথে আরূঢ়। বিষ্ণুপুরে এই শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে যুদ্ধদৃশ্য মন্দিরের বহু স্থানেই লক্ষ্য করা যেতে থাকে। বানর ও ধনুর্ধরদের যুদ্ধে তা প্রতিফলিত হয়। বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেবের পূর্বোক্ত 'একরত্ন'

মন্দিরে (১৬৭৯ খ্রী.) রথারোহী প্রধান যোদ্ধাদের চারপাশে অনুচর এবং বানর সেনারাও আছে। ঘুরিষার (বীরভূম) রঘুনাথের 'চারচালা' মন্দিরেও (খ্রী.১৬৩৩) এ দৃশ্য উপস্থিত হয়েছে। গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের 'একরত্ন' মন্দিরে প্রবেশদ্বারের খিলানের উপরিভাগের সমগ্র প্রস্থে অসংখ্য বানর ও রাক্ষসসেনার সমাবেশে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যটি জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। এখানে রথারোহী দশাননের দৃপ্তভঙ্গীটিও আকর্ষণীয়। চাঁইপাটের (দাসপুর) 'নায়েকপাড়া'য় রাধাগোবিন্দের 'আটচালা'মন্দিরের (১৭৫৯ খ্রী) ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থের সর্বাংশে অসংখ্য বানর ও রাক্ষসসেনার সম্মুখ সমর লঙ্কাযুদ্ধের এক জ্বলন্ত চিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে। হাঙরমুখ রথে আরূঢ় রাম ও রাবণ পরস্পর যুদ্ধরত।

আঠার শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে বিশেষভাবে হাওড়া ও হুগলিতে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য একটি নির্দিষ্ট রূপ পায়। রাম-রাবণের সম্মুখসমরে রামের পশ্চাতে লক্ষ্মণ এবং রাবণের সঙ্গে কুম্ভকর্ণকে দেখানো হয়েছে। এরা সকলেই রথে সমাসীন এবং দৃপ্তভঙ্গীতে পরস্পরের দিকে শরবর্ষণ-রত। মূর্তিগুলি আনুভূমিক (horizontal) রেখার দ্বারা বিভাজিত। কালনার (বর্ধমান) লালজীউর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে (১৮ শতকের মধ্যভাগ) এই দৃশ্যরূপের প্যানেল লক্ষ্য করা যায়। এই ফলকগুলি মন্দিরের সামনের প্রবেশদ্বারের কেন্দ্রীয় প্রস্থের সবটাতেই সন্নিবেশিত হয়েছিল। উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে এই লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য কম প্রাধান্য পেতে থাকে, বিশেষ করে, মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থে (facade), যেখানে পূর্ববর্তী শতকে এইদৃশ্য আবশ্যিকভাবে স্থান পেয়েছিল, সেখানে এই শতকে রাম-রাবণের দৃপ্তভঙ্গী এবং যুদ্ধের সামগ্রিক বিভীষিকার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে শুধুমাত্র ধনু উত্তোলন করতে দেখা যায়। অসংখ্য হস্ত ও মস্তকে শোভিত রাবণকে হাতে তরোয়াল ঘোরাতে দেখা যায় বা কখনও দণ্ড আস্ফালনে নিযুক্ত দেখা যায়। মূর্তিগুলি ক্বচিৎ রথারূঢ় অথবা রথের শুধুমাত্র মকরমুখটি পরিস্ফুট হয়। খুব কমক্ষেত্রেই রথটি ঢাকা বা সম্পূর্ণ অবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে। মেদিনীপুরের আলঙ্গিরিতে রঘুনাথের 'নবরত্ন' মন্দিরগাত্রে (খ্রী. ১৮১০) লঙ্কাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের একটি দৃশ্য হোল, রামের হাতে রাবণের কর্তিত মুণ্ড ও মস্তকবিহীন ধরাশায়ী রাবণ। এর নীচের প্যানেলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ দৃশ্যটি রূপায়িত। তার নীচের প্যানেলে সভাসদসহ রাবণ দণ্ডায়মান। এইরূপ দৃশ্য মন্দির 'টেরাকোটা'য় সহজলভ্য নয়। এছাড়া, এই মন্দিরে রামায়ণের অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে জটায়ুর রাবণের রথ গলাধঃকরণের চেষ্টা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বাঁকুড়া জেলার হদলনারায়ণপুরে 'মেজ তরফে'র রাধাদামোদরের যে 'নবরত্ন' মন্দির আছে, তাতে লঙ্কাযুদ্ধের একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হোল, রাম-রাবণের সম্মুখযুদ্ধের মধ্যবর্তী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা দুর্গার আবির্ভাব এবং রামের অনুমতিক্রমে দেবীর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ জ্বলন্তরূপে অঙ্কিত হয়েছে। এই সময়ে মেদিনীপুরের কোন কোন মন্দিরে, যেমন দাসপুরে চক্রবর্তীপরিবারের দধিবামনের পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৬ খ্রী.) এবং লোয়াদার (ডেবরা থানা) রাধাকৃষ্ণের পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৮০৫ খ্রীঃ) কুম্ভকর্ণকে লম্ফ-ঝম্ফ ও বানরভক্ষণে নিযুক্ত দেখা গেছে। দাসপুরের মন্দিরে (দধিবামনের 'পঞ্চরত্ন') কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গদৃশ্যটি আকর্ষণীয়।

প্রায় সব রামায়ণীয় দৃশ্যে নীচের ভিত্তিবেদিসংলগ্ন মন্দিরগাত্রে অথবা প্রবেশদ্বার-খিলানের ওপরের প্রধান প্রস্থগুলিতে বানর-যোদ্ধাদের রাম ও লক্ষ্মণকে সাহায্য করতে দেখা যায়। বানরসেনা ঊর্ধ্বে লাফ দিয়ে রাবণের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে, প্রায়ই রাক্ষস যোদ্ধাদের জড়িয়ে ধরে বা চুল টেনে নাজেহাল করে এবং প্রধান প্রধান রাক্ষস-যোদ্ধাদের চারপাশ ঘিরে ধরে। আবার ক্রীড়াচ্ছলে

এককভাবে পরস্পরযুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিষ্ণুপুরমন্দির ও পূর্বোক্ত ঝিখিরার দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে এরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সময় হনুমানকে রাম-রাবণের মাঝখানে মধ্যবর্তী যোদ্ধারূপে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার জিবটার (কোতুলপুর থানা) দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের (১৮৩৩ খ্রী.) একটি প্যানেলে এরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণ-কাহিনীর মধ্যে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞ বিষয়দুটি বেশ কিছু টেরাকোটা-ফলকে লক্ষ্য করা যায়। আঠার এবং উনিশ শতকের মন্দিরে এই দৃশ্যদুটি সবিস্তারে প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বোক্ত আলঙ্গিরির (মেদিনীপুর) রঘুনাথের 'নবরত্নে'র একটি ফলকে দেখানো হয়েছে, রাম সীতাকে একটি ধর্মীয় অগ্নিকুণ্ডের কাছে নিয়ে এসেছেন। দাসপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরে সীতা অগ্নিকুণ্ডের কাছে উপস্থিত হয়েছেন স্পর্শ করার জন্যে। রামচন্দ্র তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান। রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের একটি চিত্রফলক পূর্বোক্ত সুরুলের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিবে (১৮৩১ খ্রী.) দেখা যায়। এই মন্দিরের প্রবেশপথের ওপরের খিলানে রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে অশোকবনে 'চেড়ী'গণ-পরিবৃতা সীতা, হনুমানকর্তৃক সীতাকে কিছু দান, অসীম বীরত্বের সঙ্গে হনুমানের রাক্ষসবাহিনীকে আক্রমণ, যুদ্ধের জন্য রাবণের সেনাপতিদের সঙ্গে আলোচনা, রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতা, জাম্বুবান ও অন্যান্য বানরাধিপতির রামসীতার প্রতি আনুগত্যপ্রদর্শনদৃশ্যও বর্তমান। এই সঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকির উপস্থিতিতে মুনিদের দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে রামসীতার রাজ্যাভিষেক বা সিংহাসনারোহণদৃশ্য উনিশ শতকের মন্দির 'টেরাকোটায়' বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, সতের এবং আঠার শতকের মন্দিরেও এই 'মোটিফ'টি অনেক মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়। অনুচর বানর ও যোদ্ধা-পরিবৃত সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতাফলক নীচে ভিত্তিসংলগ্ন মন্দিরগাত্রে এই সময় স্থান পেতে থাকে। বিষ্ণুপুরে শ্যামরায় (১৬৪৩ খ্রী.) ও মদনমোহন মন্দিরে (১৬৯৪ খ্রী.) এগুলি এইভাবে স্থাপিত হয়।

কিন্তু উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরে এই 'বিষয়'টি (motif) এমনকি, লঙ্কাযুদ্ধের চেয়ে অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রবেশখিলানপথের ওপরের প্রধান প্রস্থে এটি গুরুত্বের সঙ্গে সংস্থাপিত হয়। এটি 'রামরাজা' নামে পরিচিতও হয়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণের ছোট ছোট প্রতীক ফলকের মতো রামসীতার রাজ্যাভিষেক ফলকও প্রধান প্যানেলগুলিতে স্থান পায় এ-সময়ে। সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত কালনার (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বর দেউলে (১৮৪৯ খ্রী.) এই ধরণের ফলক আমরা লক্ষ্য করেছি। এতে দেখা যায়, রাম-সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট, এঁদের এক পা নীচে দোদুল্যমান বা প্রসারিত, রামচন্দ্রের হস্তে ধনু স্থাপিত। সম্ভবতঃ এই সময়ে হরপার্বতীর যে ফলক প্রচলিত হয়, তার সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্যে এই 'চিহ্ন' স্থাপন করা হয়। এছাড়া মাথার ওপর রাজছত্র স্থাপিত। বানরেরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। বালি-দেওয়ানগঞ্জের দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে (১৮২২ খ্রী.) এরূপ ফলক দেখা যায়। কখনও কখনও হনুমানকে সিংহাসনের নীচে নতজানু হয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) ভোলানাথ শিবের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে এরূপ ফলক আছে।

ওপরের আলোচনায় বাংলার মন্দির-'টেরাকোটা'সজ্জায় রামায়ণ-কাহিনী বা রামকথার যে চিত্ররূপ আমরা পাই, তাতে এর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেকালে অবিভক্ত বাংলায় ও গৌড়ে যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়, তার সবই টেরাকোটা-অলঙ্করণে সজ্জিত ছিল না। বেশ কিছু

মন্দির ছিল নেহাতই সাদামাটা। এই সাদামাটা মন্দিরেও যে দুচারটি অল্প টেরাকোটাফলক সংস্থাপিত হয়, তার মধ্যে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য ও 'রামরাজা'-ফলকই স্থান পায়। অবশ্য, রাধাকৃষ্ণ-ফলকও বহু লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা চৈতন্যোত্তরকালে বাঙালিমনকে ভক্তিরসে গভীরভাবে আপ্লুত করায় টেরাকোটাসজ্জায় এই দুটি 'বস্তু' আদর্শরূপে গৃহীত হয়। এমন কি, গ্রাম-গ্রামান্তরের তুলসীমঞ্চ বা সমাধিমন্দিরে রামলীলা বা কৃষ্ণলীলার ফলক সন্নিবেশিত করা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। এখানে আমরা জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিস্থানীয় আরও কিছু মন্দিরের উল্লেখ করছি যেগুলিতে রামলীলাফলক কমবেশি স্থান পেয়েছিল ঃ

স্থান	মন্দির ও	টেরাকোটা
বাঁকুড়া		
আকুই (থানা ইঁদাস)	রাধাকান্তের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৬১-৬৪)	রামলীলা
কোতুলপুর (কোতুলপুর)	শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)	রামকাহিনী
পাত্রসায়ের (পাত্রসায়ের)	রামরঘুবীরের 'দালান' (পাথর)	টেরাকোটা 'রামরাজা'
বামিরা (পাত্রসায়ের)	শিবের 'নবরত্ন' (আঃ ১৮ শতকের শেষ)	লঙ্কাযুদ্ধ
বিষ্ণুপুর	শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩)	রামায়ণের বহু কাহিনী
	বসুপাড়ায় শ্রীধরের 'নবরত্ন' (আঃ ১৯ শতকের প্রথম ভাগ)	রামায়ণকাহিনী
	কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫)	রামায়ণকাহিনী
	রাধাবিনোদের 'আটচালা' (১৬৫৯)	লঙ্কাযুদ্ধ
মেট্যালা (গঙ্গাজলঘাটী)	লক্ষ্মীনারায়ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৭১৮)	লঙ্কাযুদ্ধ
সোনামুখী (সোনামুখী)	শ্রীধরের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮৪৫)	রামায়ণকাহিনী
মেদিনীপুর		
আজুড়িয়া (দাসপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৮৭১)	রাম-রাবণের যুদ্ধ
আনন্দপুর (কেশপুর)	রঘুনাথবিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৯৩)	ঐ
উত্তরগোবিন্দনগর (দাসপুর)	ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০)	লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রামক্রোড়ে লক্ষ্মণ, হনুমানের গন্ধমাদনপর্বত আনয়ন, রাবণের সীতাহরণ ইত্যাদি
কাটান (ঘাটাল)	শ্রীধরের দ্বিতল 'চাঁদনি'	রামরাবণের যুদ্ধ

কানাশোল (কেশপুর)	ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৪)	ঐ
কুশপাতা-গোবিন্দপুর(ঘাটাল)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (বিধ্বস্ত, ১৮ শতকের শেষ)	রাক্ষস ও বানরদের মুখোমুখি লড়াইদৃশ্য
কোন্নগর-ঘাটাল	বৃন্দাবনচন্দ্রের 'নবরত্ন' (১৭৯১)	বানরসেনার সেতুবন্ধন আশোকবনে সীতা ও হনুমান; রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ
ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা)	রাধাদামোদর ও শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য বানরসেনা ও রাক্ষসের যুদ্ধ
খোরদা-বিষ্ণুপুর (দাসপুর)	রঘুনাথের (পরিত্যক্ত) 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৮-৪৯)	কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, রামরাবণের যুদ্ধ
চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১)	রামরাবণের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতাহরণ
গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া)	তারকনাথের 'আটচালা' (১৮৮১)	রামরাবণের যুদ্ধ
গোঁসাইবেড় (পাঁশকুড়া)	রাধাবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ ১৮ শতকের প্রথমার্ধ)	রামরাবণের-যুদ্ধদৃশ্য, বানর ও রাক্ষসসেনার যুদ্ধ, মারীচবধদৃশ্য
গৌরা (দাসপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন'(১৮২৪)	সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, রামরাবণের যুদ্ধ, রামসীতার রাজ্যাভিষেক
ঘোষপুর (কেশপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ ১৯ শতক)	রামরাবণের যুদ্ধ
চাউলি (ঘাটাল)	শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	রাবণের সীতাহরণ, জটায়ুকর্তৃক রাবণের রথ-আক্রমণ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল
জলচক (পিংলা)	রামচন্দ্রের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	অশোকবনে সীতা, বানর-সেনা, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, লঙ্কাযুদ্ধ, রামসীতার রাজ্যপ্রাপ্তি
তিলন্তপাড়া (সবং)	জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১১)	রামায়ণ দৃশ্য

দ্বন্দ্বীপুর (ঘাটাল)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	মায়ামৃগবধ, রামরাবণের যুদ্ধ
দাসপুর	গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬)	রামরাবণের যুদ্ধ
নবগ্রাম (ঘাটাল)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯)	রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য
বাগরুই (কেশপুর)	লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (পরিত্যক্ত, আঃ ১৯ শতকের গোড়ার দিক)	রাম-রাবণের যুদ্ধ
বাদাড় (কেশপুর)	জগন্নাথের 'নবরত্ন' (আঃ ১৯ শতকের প্রথমভাগ)	ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন, রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য
ব্রাহ্মণবসান (দাসপুর)	শ্রীধরের 'আটচালা' (১৮ শতকের শেষ)	রামরাবণের যুদ্ধ, রামসীতার অভিষেক
মালঞ্চ (খড়গপুর)	দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' (১৭১২)	রামরাবণের যুদ্ধ,
রাধাকান্তপুর (দাসপুর)	গোপীনাথের 'একরত্ন' (আঃ ১৮ শতক)	রামের রাজ্যাভিষেক
শ্রীধরপুর (দাসপুর)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ ১৯ শতকের শেষ)	হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ
সৌলান (দাসপুর)	শ্যামসুন্দরের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ ১৯ শতক)	রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাম-সীতার রাজ্যাভিষেক
হরেকৃষ্ণপুর (পাঁশকুড়া)	দধিবামনের 'নবরত্ন' (আঃ ১৯ শতক)	রাম-রাবণের যুদ্ধ,রাম-সীতার রাজ্যাভিষেক

হাওড়া

অমরাগড়ি (আমতা)	দধিবামনের আটচালা (১৭৬৪)	অশোকবনে সীতা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন হরধনুভঙ্গ, সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, বানরসেনার সেতুবন্ধন
আসণ্ডা (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথের 'নবরত্ন' (১৭৮৯)	লঙ্কাযুদ্ধ
কল্যাণপুর (বাগনান)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬)	রাম-রাবণের যুদ্ধ
দক্ষিণ মাজু (জগৎবল্লভপুর)	দামোদরের 'আটচালা' (আঃ ১৮ শতকের মধ্যভাগ)	রাবণের মূর্তি, কুম্ভকর্ণের বানরভক্ষণ

হুগলি

আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬)	রামরাবণের যুদ্ধ
ইদলবাটি (গোঘাট)	(পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭২৭)	রামায়ণীয় কাহিনী
কামারপুকুর (গোঘাট)	শিবের 'আটচালা' (আঃ ১৮ শতক)	ঐ
দশঘরা (ধনিয়াখালি)	গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯)	রামায়ণ-কাহিনী, বানর ও রাবণসেনার যুদ্ধ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ।
বাখরপুর (পুরশুড়া)	'আটচালা' মন্দির	রামায়ণীয় দৃশ্য
বৈকুণ্ঠপুর (ঐ)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' ও একটি 'পঞ্চরত্ন'	ঐ
হাটবসন্তপুর (আরামবাগ)	জয়চণ্ডীর 'আটচালা' (১৭৩৪)	ঐ

হুগলী জেলার বহু মন্দিরে টেরাকোটার যে কাজ আছে, তার প্রায় প্রতিটিতেই লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, সীতাহরণ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ প্রভৃতি দৃশ্যও আছে।

বীরভূম

ইলামবাজার (ইলামবাজার)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৬)	রাম-রাবণের যুদ্ধ, সিংহাসনে আসীন রামসীতা
গণপুর (মহম্মদবাজার)	বিষ্ণুর ' া' (১৭৬৯)	ফুলপাথরের ফলকে রাম-রাবণের যুদ্ধ
জয়দেব-কেন্দুলী (ইলামবাজার)	রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' (১৬৮৩ বা ১৬৯২)	রামায়ণের বহু ঘটনা—জটায়ুকর্তৃক সীতা-উদ্ধারের চেষ্টা
সুরুল (বোলপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮শতক)	ত্রিখিলান-প্রবেশপথের ওপরের সব প্রস্থে রামায়ণকাহিনী (পূর্বে আলোচিত
	(পশ্চিমপাড়ায়) শিবের দেউল (১৮৬১)	ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন

উপসংহারে এই কথা বলা যায়, রামায়ন- 'টেরাকোটা' বাংলার মন্দিরের কেবলমাত্র অলঙ্করণ ছিল না, এগুলি ছিল বাঙালির ভক্তিসিক্ত প্রাণের প্রকাশ। কৃষ্ণভক্তি ও রামভক্তি বাঙালির হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল একসময়। 'টেরাকোটা'-মূর্তির মধ্যে সেটাই বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলির ভাব-ভঙ্গী, আকার, বেশভূষার মধ্যে দেবলীলা কতটা প্রকটিত হয়েছে, তা

বিচার্য। কিন্তু মূর্তিগুলি যে সাধারণ শিল্পীদের নিজস্ব কল্পনার এক বিচিত্র সৃষ্টি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!

সূত্রনির্দেশ

১. ম্যাককাচ্চন, ডেভিড : বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ, '*পশ্চিমবঙ্গ*', ৭ই জুলাই, ১৯৭২, পৃ. ৬৮২ ('সাহিত্যপত্রে' ১৩৭৭ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত এবং সংক্ষেপে পুনর্মুদ্রিত)

২. রায় নীহাররঞ্জন : *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, ১৪০২ পৃ. ৬৫২-৬৫৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৪

৫. সেন, সুকুমার : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড* আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫ পৃ. ১১২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

৭. পূর্বোক্ত, পৃ.১১২

৮. হক, জুলেখা : *টেরাকোটা ডেকোরেশন্স অফ্ লেট মিডিভ্যাল বেঙ্গল পোরট্রেয়েল অফ সোসাইটি, এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ,* ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৪৯

৯. সেন সুকুমার : পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২, হক, জুলেখা : পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১,

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১১. হক, জুলেখা : পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১২. সেন, সুকুমার : পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৫. সেন, দীনেশচন্দ্র : *বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৮০

১৬. হক, জুলেখা : পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০; মুখার্জি, অজিতকুমার : *ফোক আর্ট অফ বেঙ্গল,* কলিকাতা ১৯৩৯, চিত্র ২০ ও ২৩

সহায়কগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১. George, Michell (ed), *Brick Temples of Bengal From The Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983.

২. Haque, Julekha, *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bangal Portrayal of a Society, Asiatic Society* of *Bangla Desh*, Dacca, 1980

৩. কৃত্তিবাস : *রামায়ণ* (সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত), ১৯৭৭

৪. *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি,* পূর্তবিভাগ, পঃবঃ সরকার, ১৯৭১

৫. *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ,* প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পঃবঃ সরকার, ১৯৮৬

৬. *হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি,* পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ পঃ বঃ সরকার ১৯৭৬

৭. *হুগলী জেলার পুরাকীর্তি,* প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পঃবঃ সরকার, ১৯৯৩

৮. *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি,* পূর্ত বিভাগ, পঃবঃ সরকার, ১৯৭২

৯. *নদীয়ার পুরাকীর্তি* : প্রণব রায় (স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত '*নদীয়া*' গ্রন্থে দীর্ঘ প্রবন্ধ, প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩)

১১

মন্দির-'টেরাকোটা'য় মহাভারত-কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী

মন্দির- 'টেরাকোটা'য় রামায়ণের রামলীলাকাহিনী যতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, মহাভারতের কাহিনী ততটা হয় নি। এই কাহিনীর দৃশ্যচিত্রের স্বল্পতাই তা প্রমাণ করে। কিন্তু কৃষ্ণলীলাদৃশ্য প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা-অলংকৃত মন্দিরে দেখা যায়। মহাভারতের মুখ্য চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই এর কারণ। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ আপামর জনসাধারণের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব ও তাঁর অলৌকিক লীলা সেকালে সকলের মনকে ভক্তিরসসিক্ত করে তোলে। শ্রীচৈতন্যদেব রাধা-কৃষ্ণের অবতাররূপে স্বীকৃত হন। বাংলার ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা এবং অবতার শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রবর্তিত হয়। সেযুগের শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশে এই ঘটনা বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি করে। মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পে বৈষ্ণবভক্তিবাদের মূল উৎস রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাদৃশ্য প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বিষয়টিকে নিয়ে অসংখ্য টেরাকোটা-ফলক নির্মিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে ভক্তিরসপ্রধান শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কৃষ্ণলীলাকাহিনীই বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত থেকে বাল্যলীলার বিভিন্ন উপাখ্যান 'টেরাকোটা'র বিষয়রূপেও গৃহীত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারত-কথাও সেযুগে প্রায় প্রতিগৃহে পঠিত হোত এবং নানা পূজাপার্বণ অনুষ্ঠানে কথকতার মাধ্যমে মহাভারত তথা কৃষ্ণকাহিনী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এসব কারণে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকাহিনী এবং মহাভারতের কৃষ্ণমন্দির- 'টেরাকোটা' শিল্পীদের কাছে তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি, যতটা রামায়ণের লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবুও, বেশ কিছু টেরাকোটা-মন্দিরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সুদৃশ্য ফলক লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে বাংলা দেশের অন্তর্গত দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীউ মন্দিরের (১৭৫২) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধদৃশ্য ও ভীষ্মের শরশয্যা জ্বলন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই মন্দিরে সমান্তরাল খাঁজকাটা শিখরযুক্ত রথে প্রতিস্পর্ধী যোদ্ধৃবৃন্দ পরস্পর যুধ্যমান। চারপাশে পরিবৃত রয়েছে অশ্বারোহী, গজারোহী, ধনুর্ধারী সৈনিকবৃন্দ। (দ্রষ্টব্য, জর্জ মিশেল সম্পাদিত ব্রিক টেম্পলস্ অফ্ বেঙ্গল, ১৯৮৩, পৃ.১৪৬) বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরেও(১৬৯৪) এই যুদ্ধদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে, সেখানে অর্জুনের সারথিরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীষ্মের শরশয্যাদৃশ্য অপূর্ব। শরশয্যাদৃশ্যে ভীষ্মের আদেশে অর্জুন শরের দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করে পবিত্র গঙ্গাজলের ফোয়ারা পিতামহ ভীষ্মের মুখে দিচ্ছেন। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দিরেও(১৬৫৫) এই দৃশ্য উপস্থিত। এছাড়া, শরশয্যাদৃশ্য আছে ভালিয়ার (হুগলি) রঘুনাথের 'আটচালা' মন্দিরে (১৭৭২)। হদল নারায়ণপুরের (বাঁকুড়া) রাধাদামোদর মন্দিরে (ছোটতরফ) অর্জুনের লক্ষ্যভেদদৃশ্য উপস্থিত। এই মন্দিরেরই সংলগ্ন একটি প্যানেলে শরশয্যা ছাড়াই ভীষ্মকে একটি জলপাত্র দিতে দেখা যায়। ভীষ্মের শরশয্যা-দৃশ্যের একটি আকর্ষণীয় প্যানেল মেদিনীপুর জেলার বাদাড়ের (কেশপুর থানা) জগন্নাথের 'নবরত্ন' মন্দিরে (আ ১৯ শতকের প্রথম ভাগ) এবং আঁটপুরের (হুগলি) রাধাগোবিন্দমন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। এই শরশয্যাদৃশ্যটি আরও বহু মন্দিরে আমরা লক্ষ্য করেছি। অতএব মহাভারতীয় কাহিনীর মধ্যে এই দৃশ্যটি একটি 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়েছিল টেরাকোটা শিল্পীদের মধ্যে, এটা অনুমান করা যায়।

ভীষ্মের শরশয্যা বা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের দৃশ্য ছাড়া মহাভারতের অন্যান্য কিছু কিছু ঘটনা মন্দির'টেরাকোটা'য় রূপায়িত হ'তে দেখা যায়- যেমন, বীরভূম জেলার গণপুরের (মহম্মদবাজার) 'চারচালা' মন্দিরে কৃষ্ণের জন্ম, দুঃশাসনকর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণকর্তৃক দ্রৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্রমন্থন প্রভৃতি ঘটনাবলী 'ফুলপাথরে'র ফলকে দেখানো হয়েছে। (দ্রষ্টব্য, দেবকুমার চক্রবর্তী, *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭২,পৃ. ৩০)। মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু টেরাকোটা-মন্দিরেও মহাভারতীয় কোন কোন জনপ্রিয় কাহিনীর রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন আনন্দপুরের (কেশপুর) বাগেদের রাধাকৃষ্ণ ও দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৮৬৮) টেরাকোটা-সমারোহের মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণদৃশ্যটি রূপায়িত। এছাড়া মহাভারতের কোন কোন কাহিনী অবলম্বনে 'টেরাকোটা'-ফলক দাসপুরে পালেদের লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন (১৭৯১) এবং রাসবিহারী চক্রবর্তী-প্রতিষ্ঠিত দধিবামনের 'পঞ্চরত্নে' (১৮৪৬) লক্ষ্য করা যায়।

মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রকোণা শহরের মিত্রসেনপুর মহল্লায় শান্তিনাথ শিবের নবরত্নে (১৮২৮) 'টেরাকোটা'-সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন ও গোপীদের বিলাপদৃশ্যচিত্র পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণপুরে (পাঁশকুড়া) জানাদের দধিবামনের 'নবরত্ন' মন্দিরে (আঃ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, সমুদ্রমন্থন-দৃশ্য রূপায়িত। নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ মন্দির দিগনগরে রাঘবেশ্বর শিবের 'চারচালা'র বহু টেরাকোটার মধ্যে কৃষ্ণলীলার বহু দৃশ্য উপস্থিত, যেমন কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি।

শেষ-মধ্যযুগের মন্দির'টেরাকোটা'য় মহাভারতের প্রিয় 'বিষয়'রূপে আমরা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণদৃশ্যই বেশি ক'রে লক্ষ্য করি। স্বল্পসংখ্যায় যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের পাশাখেলাও যে 'টেরাকোটা' ফলকে উপস্থিত হয় নি, তা নয়, তবে এরূপ দৃশ্য খুবই বিরল। পক্ষান্তরে, মহাভারতের মুখ্যচরিত্র শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র জীবনলীলা মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পীদের যে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তার সাক্ষ্য কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অজস্র 'টেরাকোটা'ফলক। তবে এই কৃষ্ণলীলার বিচিত্র কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই বেশি পাওয়া যায়।

প্রায় প্রতিটি. টেরাকোটা-অলংকৃত মন্দিরে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যের সন্নিবেশ যেমন সেকালে প্রথাগত হয়ে দাঁড়ায়, তেমন অসংখ্য কৃষ্ণলীলাকাহিনীর মধ্যে অন্তত দু'একটি কাহিনীদৃশ্য 'টেরাকোটা'-ফলকে আবশ্যিকভাবে স্থান পায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কোন কোন কাহিনী অবলম্বনে বহু টেরাকোটাফলক নির্মিত হয় মন্দির অলংকরণের জন্য। রাধাকৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, গোপীবিলাস প্রভৃতির অসংখ্য টেরাকোটাফলক মন্দিরের বহিরঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছিল, বাংলায় 'টেরাকোটা'মন্দিরগুলি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এমনকি, পাথরের মন্দিরগুলিতেও রাধাকৃষ্ণলীলা-ভাস্কর্য অজস্র পরিমাণে স্থান পায়।

প্রথমত, বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার বহু ফলক আমরা লক্ষ্য করি। এগুলি সামনের দিকে কখনও কার্ণিশের নীচে, কখনও বা থামের গায়ে, নীচের দিকের দেওয়ালে অথবা দুপাশের খোপে সাজানো থাকে। বংশীবাদনরত দ্বিভুজ কৃষ্ণকে কখনও এককভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণযুগলকে লক্ষ্য করা যায়। ষোল শতকের শেষ থেকে সতের শতকে কৃষ্ণপ্যানেল-মন্দির অলংকরণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে কৃষ্ণকে কদম্ববৃক্ষতলে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মণ্ডপে বা মন্দিরে রাধা ও গোপীদের সঙ্গে বিলাস করতে দেখা যায়। উদাহরণ, গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ) নরসিংহের চারচালা (১৫৮০), বিষ্ণুপুরের

মদনমোহন, জোড়বাংলা এবং শ্যামরায়, বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব মন্দির (১৬৭৯) এবং জৌগ্রামের (বর্ধমান) রাধাকান্তের মন্দির। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে এই দৃশ্য মন্দিরের সামনের কোণের দিকের প্যানেলে, নীচের প্রস্থসমূহে লক্ষ্য করা যায়, আবার কখনও খিলানের ওপরের অংশেও দেখা যায়। কালনার (বর্ধমান) গোপালবাড়ি (১৮ শতকের মধ্যভাগ) এবং কান্তনগরের (পূর্ব দিনাজপুর, বাংলাদেশ) মন্দিরে এ ধরণের টেরাকোটা অনেক দেখা গেছে। উনিশ শতকের অনেক মন্দিরে আবার দেখা যায়, কৃষ্ণ উচ্চ সিংহাসনে আসীন এবং বংশীবাদনরত, গোপীগণ ছত্রধারণ করে তাকিয়ে আছেন। অথবা কৃষ্ণ বংশীবাদনরত অবস্থায় গোপীদের সঙ্গে নৃত্যরত, যাকে 'রাসমণ্ডলচক্র' বলা যায়। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে (১৬৪৩) এই 'রাসমণ্ডলচক্রে'র সুন্দর দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের অনেক মন্দিরে এই 'মোটিফ'টি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যেমন, অনন্তবাসুদেব (বাঁশবেড়িয়া, হুগলি ১৬৭৯) এবং মালঞ্চের (খড়গপুর) শ্যামাঠাকুরাণী বা দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' (১৭১২)। কালনার (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বর দেউলে (১৮৪৯) বংশীবাদনরত কৃষ্ণ কে তাঁর ভক্ত ও সাঙ্গোপাঙ্গসহ সমান্তরাল প্যানেলে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে। সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরের—পঞ্চবিংশতি রত্ন মন্দিরেও (১৮৪৫) এরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকেই এ ধরণের প্যানেল দেখা যায় বেশি। কখনও কখনও টেরাকোটা-ফলকে রাধাকৃষ্ণকে একই বাঁশী বাজাতে দেখা যায়। যেমন, আঁটপুরের (হুগলি) রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬) এবং বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) গঙ্গেশ্বর-মন্দির এবং পূর্বোক্ত সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরমন্দির। শ্রীধরমন্দিরের প্যানেলে উল্লেখযোগ্য হোল, গাছের কাণ্ডের দুপাশে রাধা ও কৃষ্ণ এবং অন্য একজন গোপীসহ নৃত্যরত। এখানে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীর মোট পাঁচটি ফলকের মধ্যে কেন্দ্রীয় ফলকটিতে বৃক্ষের দুদিকে কৃষ্ণ ও রাধা একই বংশীবাদনরত।

বহু মন্দিরে কৃষ্ণের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান ষড়ভুজমূর্তিকে কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে করেন (দ্রষ্টব্য, মিশেল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৮)। কিন্তু এটি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এক দিব্যরূপ। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ -রূপে প্রসিদ্ধ। এই দিব্যরূপের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, সন্ন্যাসগ্রহণকারী গৌরাঙ্গের দণ্ড ও কমণ্ডলু এবং বংশীবাদনরত কৃষ্ণের সমন্বয় ঘটেছে দেখা যায়। এই ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি সেকালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে, যে দিব্য রূপটি চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত অনুযায়ী শ্রীবাস নবদ্বীপে এবং বাসুদেব সার্বভৌম নীলাচলে দর্শন করেন। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের বেশ বড়ো ফলক বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫) এবং শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৬৪৩) দেখা যায়। হৃদলনারায়ণপুরে রাধাদামোদরের 'নবরত্ন' মন্দিরের (মেজঅরফ) খিলানের ওপর বিদ্যমান, একদিকে সংকীর্তনদৃশ্য, অন্যদিকে এক মুসলমান কর্মচারীকে গৌরাঙ্গের ষড়ভুজরূপে দর্শনদান খুবই আকর্ষণীয়। বদনগঞ্জের (হুগলি) দামোদরমন্দির এবং আরও বহু মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। মেদিনীপুর জেলার বহু 'টেরাকোটা' মন্দিরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ অলংকরণের এক অন্যতম 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়েছিল। যেমন, চন্দ্রকোণার ইন্দামবাজারে চাবড়ীদের রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৭০), চাউলির (ঘাটাল) শীতলানন্দের 'আটচালা' (১৮০৯), ডিহি বলিহারপুরের (দাসপুর) গোস্বামীদের রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮) তমলুকে বর্গভীমার দেউল, চন্দ্রকোণার দক্ষিণবাজারে বিধ্বস্ত 'জোড়বাংলা' (আঃ ১৭ শতক, পাথরে খোদাই ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে জানা যায়), পূর্বগোপালপুরে (পাঁশকুড়া) অধিকারীদের রাধাবিনোদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৭৪) প্রভৃতি। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের আরও অনেক টেরাকোটা-মূর্তি পশ্চিমবাংলার বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণলীলার মধ্যে টেরাকোটা-অলংকরণে রাধা, কৃষ্ণ ও গোপীদের লীলাবিলাসদৃশ্য প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা-মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণলীলার অপরাপর জনপ্রিয় দৃশ্যগুলি হোল, 'নৌকাবিলাস', 'কালীয়দমন', গোপীদের 'বস্ত্রহরণ', 'রাসমণ্ডল' এবং 'নবনারীকুঞ্জর'। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বালকৃষ্ণের ননীভক্ষণ, গোচারণভূমিতে বংশীবাদনরত কৃষ্ণ, পূতনাবধ, যমলার্জুন, প্রভৃতি দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বসুদেবের যমুনাতরণ-দৃশ্যও পাওয়া যায়। আবার অনেক মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন ও গোপীদের বিলাপদৃশ্য অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্যের ফলকগুলি খিলানের ওপরের প্রস্থে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, মূর্তিগুলি হয় দণ্ডায়মান, নয় আসীন এবং নৃত্যভঙ্গিমায়। নিদর্শন, দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির (১৭৯১) এবং রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) দাসেদের গোপীনাথমন্দির (সংস্কার ১৮৪৪)। কোন কোন প্যানেলে বহু গোপী ও বাদকদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সিংহাসনারূঢ় অবস্থায় বর্তমান। যেমন, মাংলই- শ্যামবল্লভপুরের (পাঁশকুড়া) রাসমঞ্চ (১৮৫৯), রাধাকান্তপুরের পূর্বোক্ত মন্দির এবং রামগড়ের (বিনপুর, মেদিনীপুর) কালাচাঁদের 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দির (১৮৫৬)। রাধা ও কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার দৃশ্যফলকও কোন কোন মন্দিরে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত, বড়নগরের গঙ্গেশ্বরমন্দির। ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়, রাধা সখীদের সঙ্গে একাকী আসীনা। নিদর্শন, হেতমপুরের গোপাললক্ষ্মী মন্দির, পূর্বোক্ত রামগড়ের মন্দির এবং সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলামন্দির (১৮৪৯)। কখনও বা উপবিষ্টা রাধার সম্মুখে কৃষ্ণ নতজানু-এরূপ দৃশ্যও পাওয়া যায়, যেমন আলঙ্গিরির (এগরা) রঘুনাথমন্দির। রাসলীলাদৃশ্যে একটি কেন্দ্রীয় চক্রে রাধা, কৃষ্ণ ও একজন গোপীর চারপাশে একটি বৃহত্তর চক্র ও তার চারপাশে বৃহত্তম চক্র। শ্যামরায়ের মন্দিরের রাসমণ্ডলচক্রগুলি সেসময় অন্যান্য মন্দিরের ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছিল, যেমন বাঁশবেড়িয়ায় অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' এবং কান্তনগরের কান্তজীউর 'নবরত্ন'। কাণাশোলে (কেশপুর) ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' ইত্যাদি। 'নবনারীকুঞ্জর'দৃশ্যে গোপীগণ নিজেদের হাতীর মতো আকার ক'রে থাকে যাতে প্রিয় কৃষ্ণ তাদের ওপর উপবেশন করতে পারে। এটি একটি আকর্ষণীয় 'মোটিফ'রূপে টেরাকোটা-শিল্পীদের কাছে গৃহীত হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রে 'নরনারীকুঞ্জর' কৃষ্ণবিহীন অবস্থায় দেখা গেলেও দু'একটি ক্ষেত্রে এইরূপে হস্তীর ওপর হাওদায় উপবিষ্ট কৃষ্ণকে দেখা গেছে। (আলঙ্গিরীর মন্দির, মেদিনীপুর)। অলংকরণের এই 'মোটিফ' বহু মন্দিরে রূপায়িত হয়েছে, যেমন, ঘুড়িষার রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়, মদনমোহন এবং আরও বহু খ্যাত-অখ্যাত মন্দিরে।

কৃষ্ণকাহিনীর বহু দৃশ্যফলক যেমন, কৃষ্ণের জন্ম ও কংসের কারাগার থেকে পলায়ন, যশোদার শিশুবহন, কংসের বহু শিশুহত্যা, গোকুলের বধূদের দ্বারা যমুনার জলে কৃষ্ণের স্নান, পূতনাবধ, তৃণবর্তাসুরবধ, ননীচুরি, শকটাসুরবধ, গোচারণভূমির দৃশ্য, কালীয়দমন, বকাসুরবধ, গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন, দাবাগ্নিভক্ষণ, কৃষ্ণের কদম্ববৃক্ষে আরোহণ ও গোপীদের বস্ত্রহরণ, গোপীগণকর্তৃক দধিভাণ্ডবহন ও কৃষ্ণকে দধিদান, কৃষ্ণের যমুনাতরণ, মথুরা প্রত্যাবর্তন, ষণ্ডাসুর, ঘোটকাসুর ও গজাসুরবধ, মথুরা আগমন, রুক্মিণীর সঙ্গে বিবাহ, কৃষ্ণ-বলরামের মল্লযুদ্ধ, কংসের মৃত্যু, সমুদ্রমন্থন প্রভৃতি অসংখ্য মন্দিরে সজ্জিত হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অজস্র কাহিনীচিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। কৃষ্ণের জন্মদৃশ্যের ফলক কোন কোন মন্দিরে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে, যেমন, সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধর মন্দির (১৮৪৫), হদল নারায়ণপুরের রাধাদামোদরমন্দির (ছোট তরফ) এখানে দেবকী ও বসুদেব চতুর্ভুজ শিশুকে তুলছেন। প্রহরীদের ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুকে নিয়ে

বসুদেবের বহির্গমনদৃশ্যফলক বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ, হালিশহরের নন্দকিশোরের আটচালা (আঠার শতক), বড়নগরের গঙ্গেশ্বর মন্দির প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। কালনায় (বর্ধমান) কৃষ্ণচন্দ্রের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে একটি দৃশ্যফলকে পাওয়া যাচ্ছে, বসুদেব শিশুকৃষ্ণকে যমুনার জল স্পর্শ করাচ্ছেন এবং একটি শৃগাল তাঁকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। আঠার শতকের অনেক মন্দিরের নীচের দিকের প্রস্থে বসুদেব ও কৃষ্ণের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রমন্দির। হাটসেরান্দির (বীরভূম) বিষ্ণুমন্দিরে খিলানের ওপরের প্যানেলে একটি দৃশ্য বসুদেব শিশুকে যমুনার জল ছোঁয়াচ্ছেন এবং এইসঙ্গে যমুনাতরঙ্গে নাগ ফণাবিস্তার করে আছে যা প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীরই দৃশ্যরূপ। এই মন্দিরেই যশোদাকর্তৃক শিশুবদলদৃশ্য এবং ক্রোড়ে স্থাপিত শিশুর যশোদার পরিচর্যা রূপায়িত। কংস বা কংসের সৈনিকদের অন্যান্য শিশুবধদৃশ্যও অনেক ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে, যেমন, দশঘরার (হুগলি) গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯), ভালিয়ার (আরামবাগ) রঘুনাথের 'আটচালা' (১৭৭২), ওড়গ্রাম ও শ্রীরামপুর এবং বিষ্ণুপুরের বিষ্ণুমন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। শিশু কৃষ্ণকে যমুনার পবিত্র জলপূর্ণ ঘটের দ্বারা স্নান করানো এবং তাকে স্বর্ণপিণ্ডের দ্বারা ওজন-এই দৃশ্যগুলি বদনগঞ্জের (হুগলি) দামোদরের 'নবরত্ন' ও আকুই (বাঁকুড়া) এর রাধাকান্তের 'পঞ্চরত্নে' (১৭৬১-৬৮) লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণকর্তৃক পূতনা ও তৃণবর্তাসুরবধের দৃশ্যফলক মন্দিরগাত্রে লক্ষ্য করা যায়। অনেকসময় পূতনার শয়ান অবস্থায় দীর্ঘাকার দেহ এবং কৃষ্ণকর্তৃক তার স্তনদুগ্ধপানে মৃতা রাক্ষসীর চিত্র কোন কোন মন্দিরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন, হদলনারায়ণপুর ছোট তরফের মন্দিরে খিলানের ওপরের অংশের প্যানেলে এই দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। ঝিকিরার (হাওড়া) দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে (১৭৬৯) তৃণবর্তাসুরকে একটি চক্রাকারে দেখানো হয়েছে এবং বালকৃষ্ণ সেই চক্রের মধ্যে থেকে সেই অসুরকে সংহার করছেন। সতের-আঠার শতকের অনেক মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। ননীচুরি, শকটাসুরবধ ও যমলার্জুনভঙ্গদৃশ্যগুলিও বেশ কিছু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। তার মধ্যে ননীভক্ষণ কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অসংখ্য মন্দিরে এই দৃশ্যফলক লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, বিষ্ণুপুর ও গুপ্তিপাড়ার পূর্বোক্ত 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিতে। যশোদার ননীমন্থনকালে বালক কৃষ্ণের ননীপাত্রে হস্তপ্রবেশ, কোন কোন সময় দেখা যায় যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ননী গ্রহণ করতে সাহায্য করছেন। এমনকি তাকে ননী খাওয়াচ্ছেন। এ দৃশ্য ক্ষীরপাই এর (চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর) খড়কেশ্বর শিবের 'আটচালা' (১৮৬১) এবং আরও অনেক উনিশ শতকের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাখালবেশ বা গোচারণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণদৃশ্যে গোরুর পাল ও রাখালদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়। অনেক রাখালকে শিঙ্গাবাদনরত দেখা যায়, কখনও বা রাখালেরা তাদের খাবারের ভাঁড় একটি লাঠিতে বেঁধে কাঁধে ফেলে নিয়ে যাচ্ছে দেখা যায়। এই রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের টেরাকোটা-ফলক কৃষ্ণলীলার এক জনপ্রিয় 'মোটিফ'-রূপে গৃহীত হয়। তাই কৃষ্ণলীলার মধ্যে এই মোটিফটি বহু স্থানেই পাওয়া যায়। যেমন, বিষ্ণুপুর, বাঁশবেড়িয়া, গুপ্তিপাড়া, আঁটপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরসমূহে এবং দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে এই দৃশ্য পাওয়া যায়। এই সঙ্গে কৃষ্ণের গরুচরানো ও গোদোহনদৃশ্যও দাসপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরে এবং ইলামবাজারের (বীরভূম) লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরে (১৮৪৬) লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরে গোষ্ঠলীলা, গিরিগোবর্ধনধারণ ও রাসলীলাদৃশ্যও পাওয়া যায়।

কালীয়দমন, বকাসুর ও অঘাসুরবধদৃশ্যও অনেক মন্দিরে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কালীয়দমন

খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারণ, এই 'মোটিফ'টি কৃষ্ণলীলাদৃশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে, আঠার-উনিশ শতকের বহু মন্দিরে দেখা যায়, কৃষ্ণ কালীয় অসুরের ফণার ওপর নৃত্যরত অবস্থায় তাকে সংহার করছেন। ঐ অসুরের স্ত্রীগণ কৃষ্ণের চারপাশ বেষ্টন করে অছে। নাগিনীদের স্ত্রীদেহ সুস্পষ্ট। এই দৃশ্য সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলার 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৮৪৯) লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরে কৃষ্ণলীলার অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে গোষ্ঠলীলা, গোপীদের বস্ত্রহরণ এবং নৌকাবিলাসদৃশ্যও আকর্ষণীয়। এখানে অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে কমলেকামিনী বা গণেশজননী, রামায়ণকাহিনীর মধ্যে দশানন, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ-দৃশ্যগুলিও খুবই আকর্ষণীয়। মন্দিরটি দাসপুর থানার একটি গণ্ডগ্রামে অবস্থিত হলেও টেরাকোটার উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের জন্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বকাসুর ও অঘাসুরের বধদৃশ্যের কিছু টেরাকোটা-ফলক কোন কোন মন্দিরে দেখা গেছে, যেমন পূর্বোক্ত আকুই এর মন্দির। কৃষ্ণের নিকট চতুর্মুখ ব্রহ্মার নতিস্বীকারের দৃশ্যফলকও কোন কোন মন্দিরে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা রাখালবালক ও গাভীগুলিকে একটি গুহায় লুকিয়ে রাখায় কৃষ্ণ বংশীবাদনের দ্বারা তাঁকে মোহিত করেন। ব্রহ্মা সেগুলিকে মুক্ত করে দেন। এই দৃশ্য বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়, মদনমোহন ও বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। আঁটপুর, ভালিযা, দশঘরা, কালনার কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বোক্ত মন্দিরগুলিতে রাখাল ও গোরুগুলিকে একটি বাক্সের মতো পাত্রে আটকে রাখতে দেখা যায় তাদের মাথাগুলি শুধু বেরিয়ে থাকায়।

কৃষ্ণলীলার অপর একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ' শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন-উত্তোলন। গোবর্ধন পর্বতকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বযং নিজের হাতে পর্বতটিকে তুলে ধরেন যাতে পর্বতের অধিবাসী বিভিন্ন প্রাণী, রাখাল ও গোপীগণ রক্ষা পান। কখনও কখনও শিব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা আবির্ভূত হয়েছেন, যেমন, জিবটার(বাঁকুড়া) দামোদরের পঞ্চরত্ন (বাঁকুড়া)। আরও বহু স্থানে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণলীলাদৃশ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোল, গোপীদের বস্ত্রহরণ। এ দৃশ্য প্রায় সব 'টেরাকোটা' মন্দিরেই উপস্থিত। টেরাকোটা-শিল্পীদের কাছে এই 'মোটিফ'টি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই দৃশ্যে কৃষ্ণকে কদম্ববৃক্ষে আরূঢ় হয়ে বংশীবাদনরত দেখা যায় এবং স্নানরতা গোপীদের বস্ত্রগুলি কদম্বের ডালে ঝুলন্ত দেখা যায়। কোন কোন টেরাকোটা প্যানেলে লক্ষ্য করা গেছে যে, গোপীরা জলে নগ্না অবস্থায় দণ্ডায়মান, এমনকি, তারা বস্ত্র উদ্ধারের জন্য গাছে উঠতেও উদ্যত। দাসপুর থানার কোটালপুরে শ্রীধরের 'পঞ্চরত্নে' (১৮১৫) এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। অপর একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ' গোপীদের দধিভাণ্ডবহন ও কৃষ্ণকে দধিপ্রদান। বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রত্যাবর্তন, মথুরায় প্রবেশ ও রুক্মিণীর বিবাহদৃশ্যগুলি কমবেশি দেখা যায়। তবে সর্বপ্রথমটি জনপ্রিয় মোটিফরূপে গৃহীত হয় এবং অজস্র মন্দিরে এই দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি। নৌকাবিলাসদৃশ্যের প্যানেলে কৃষ্ণ, রাধা এবং গোপীগণকে একটি দীর্ঘাকার বক্র নৌকায় আসীন দেখা যায়। নৌচালক বা নাবিককেও দাঁড়হাতে দেখা যায়। কোন কোন সময় কৃষ্ণও স্বয়ং নাবিকরূপে অবস্থান করেন। আনন্দপুরের হেট্‌লাপাড়ার (কেশপুর) সরকারদের রঘুনাথবিষ্ণুর 'পঞ্চরত্নে' (১৮৯৩) কান্তনগরের (বাংলাদেশ) পূর্বোক্ত কান্তজীউর মন্দিরে এবং আরও অসংখ্য মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মথুরাগমনদৃশ্যে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও বলরাম রথে সমাসীন, রথের ঘোড়াগুলি পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান, অক্রূরকে সারথিরূপে দেখা যাচ্ছে, গোপীরা ক্রন্দনরতা, মূর্ছিতা এবং এমনকি, রথ

আটকাবার জন্যে রথের সামনে নিজেদের নিঃক্ষিপ্ত করছে, তাদের মাথা পিছনের দিকে এমনভাবে নোয়ানো যে চুল মাটি স্পর্শ করছে, গোপীগণ কাতর ক্রন্দনে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। কোন সময় কৃষ্ণবিরহে গভীর শোকে তাদের সাথীদের হস্তযুগলে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। এইরূপ করুণদৃশ্য উনিশ শতকের মন্দিরে বেশি পাওয়া যায়।

টেরাকোটা-ফলকে কৃষ্ণের অরিষ্টবধ, কেশিবধ ও কুবলয়পীড়বধ দৃশ্যগুলিও কোন কোন মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। কংস অরিষ্ট নামক ষাঁড়, কেশী নামক ঘোড়া ও কুবলয়পীড় নামক হস্তীকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাপথে তাঁকে বধ করার জন্য পাঠায়। কৃষ্ণ অরিষ্টের শিং ধরে তাকে সংহার করেন। পক্ষান্তরে, কেশী পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলে কৃষ্ণ তাকেও বধ করেন এবং কুবলয়পীড় নামক হস্তীর শুঁড় ধরে তাকেও হত্যা করেন। জোড়বাংলা (বিষ্ণুপুর) মন্দিরের একটি প্যানেলে এবং গুপ্তিপাড়ার পূর্বোক্ত মন্দিরে, ঝিখিরার (হাওড়া) দামোদরের 'আটচালা' (১৭৬৯) এবং কালনার কৃষ্ণচন্দ্রের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে এই দৃশ্যগুলি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া, আরও বহু স্থানে এগুলি পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমনদৃশ্যে মথুরার পুরনারীগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মালা দিয়ে বা কপালে টীকা দিয়ে। হদলনারায়ণপুরে মেজ তরফের মন্দিরে দেখা যায় মথুরা পৌছে কৃষ্ণ তাঁর পায়ের নূপুর ঠিক করছেন। বাদকবৃন্দ উপস্থিত। কখনও কখনও কোন টেরাকোটা-প্যানেলে রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহদৃশ্যও লক্ষ্য করার মতো।

এর পর কৃষ্ণের কংসের প্রাসাদ দখলের অভিযানদৃশ্যে কংসের প্রহরীদের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দশঘরা (হুগলি) ও কান্তনগরের মন্দিরে বহু জনসমাগমের সম্মুখে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর চরম আকর্ষণীয় দৃশ্য কংসবধ। আঠার শতকের মন্দিরে ভিত্তিভূমিসংলগ্ন দেওয়ালের প্যানেলে কংসবধদৃশ্য এবং কখনও কখনও খিলানের উপরিভাগের প্রস্থে এই দৃশ্য পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত, আকুই ও সোনামুখীর মন্দির এবং বড়নগরের 'চারবাংলা'-গ্রূপের উত্তরদিকের 'বাংলা'। এই দৃশ্যে কৃষ্ণ কংসকে তার সিংহাসন থেকে চুল ধরে টেনে নামাচ্ছেন। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় দৃপ্তভাবটি পরিস্ফুটিত, উনিশ শতকের মন্দিরে শুধুমাত্র কেশাকর্ষণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত, পূর্বোক্ত সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরমন্দির।

কৃষ্ণকাহিনীর মধ্যে 'সমুদ্রমন্থন'দৃশ্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক এবং এটি বহু মন্দিরে অন্যতম 'মোটিফ' রূপে গৃহীত হয়। এই দৃশ্যে একটি মহানাগকে মেরুপর্বতগাত্রে বেষ্টন করে দেব ও দানবেরা সমুদ্রকে মন্থন করছে দেখা যায়। 'টেরাকোটা'-ফলকে মহাসমুদ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে তরঙ্গের মতো কতগুলি আঁকাবাঁকা রেখায়। সমুদ্রমন্থনের সময় কৃষ্ণের আবির্ভাব, কখনও বা উল্লম্ব মেরুদণ্ডের উপরিভাগে চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখা যায়, যেমন, বাগরুইএ (কেশপুর) লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (আঃ ১৯ শতক), কাণাশোলে (কেশপুর) ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন', জিবটার (বাঁকুড়া) দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)। জিবটা, মাংলই (পাঁশকুড়া) এবং রামগড়ের (বিনপুর) মন্দিরে সমুদ্রমন্থনের সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্রকে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যাতে অসুরদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য বোঝা যায়। যেমন, ইন্দ্র তাঁর বাহন ঐরাবতের ওপর আসীন।

মন্দির 'টেরাকোটা'-অলংকরণে কৃষ্ণলীলাদৃশ্যের বিশাল ব্যাপ্তির সঙ্গে অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিও স্থান পেয়েছিল, যেমন, বিষ্ণু, বিষ্ণুর দশাবতার, শিব, দুর্গা, কালী, চণ্ডী এবং অপরাপর

দেবদেবী। যদিও মন্দির'টেরাকোটা'য় রাম ও কৃষ্ণের প্রাধান্য, তথাপি বিষ্ণুর দশাবতার ও শিবকাহিনীর বহু টেরাকোটাফলক অসংখ্য মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। তবে রামায়ণ, মহাভারতের কিছু দৃশ্য এবং মহাভারতের এবং বিভিন্ন পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীদৃশ্যরূপই টেরাকোটা-সজ্জায় মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। শিবকাহিনীর মধ্যে হরপার্বতীর বিবাহ জনপ্রিয় 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়। কোন কোন সময় এককভাবে বৃষভারূঢ় শিব ও নন্দী-ভৃঙ্গীর মূর্তি স্থান পেয়েছে। আবার, দুর্গা ও কালীর মূর্তি এককভাবে প্রায় প্রতিটি 'টেরাকোটা' মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে কার্ত্তিকগণেশাদিসহ দশভুজা মূর্তি মন্দিরসজ্জায় একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ' রূপে গৃহীত হয়। কোন কোন মন্দিরে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকাহিনীর বহু উপাখ্যান রূপায়িত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিলন্তপাড়ার (সবং, মেদিনীপুর) মাইতিদের জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের (১৮১১) উল্লেখ করা যেতে পারে। কালীর একটি অপূর্ব মূর্তিফলক আঁটপুরে (হুগলি) রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে।

বিষ্ণু ও দশাবতার-মূর্তিতে প্রথমে চতুর্ভুজ বিষ্ণু তাঁর বাহন উড্ডীয়মান গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন, যেমন, বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫), গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ) নরসিংহের 'চারচালা' (১৫৯০), গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আঠার শতকের শেষ), বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব (১৬৭৯), বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) 'চারবাংলা'-গ্রূপের উত্তরদিকের মন্দির। পূর্বোক্ত সোনামুখীর মন্দিরে গরুড় বিষ্ণুর পদদ্বয় ধারণ করে আছে দেখা যায়। বিষ্ণুর চারটি বাহুতে প্রথাগতভাবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম স্থাপিত। বিষ্ণুর অপর একটি প্রসিদ্ধ রূপ অনন্তশায়ী। এই দৃশ্যে বিষ্ণু কুণ্ডলীপাকানো বহু ফণাযুক্ত অনন্তনাগের ওপর শয়ান, লক্ষ্মী পদসেবারতা। মহাসমুদ্র চিহ্নিত হয়েছে মৎস্য, কচ্ছপ এবং জলের তরঙ্গ রেখার দ্বারা। উদাহরণ, আঁটপুর, ঘুড়িষা, সোনামুখী প্রভৃতি আরও অনেক স্থানের মন্দির।

বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তিফলকগুলি বহু মন্দিরের সামনের দুপাশে উল্লম্ব খোপগুলিতে সাজানো হোত, অনেক সময় কার্ণিশের নীচে ধনুকাকৃতি অংশেও বসানো থাকত। সতের শতক থেকে দশাবতার ফলকগুলি দেওয়াল-প্যানেলে বসানো হতে থাকে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি— বিষ্ণুর এই দশ অবতারের মধ্যে 'বুদ্ধ'-অবতারের বদলে জগন্নাথমূর্তি স্থাপিত হয়েছে দেখা যায় এবং এই প্রথাই প্রায় সারা বাংলার মন্দিরে প্রচলিত হয়। মৎস্য ও কূর্মমূর্তিতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর অর্ধমূর্তিও দেখা যায়। বিষ্ণুর বরাহমূর্তি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একসময়। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়-মন্দিরে (জোড়বাংলা) জলমগ্না পৃথ্বীদেবীকে বরাহাবতার বিষ্ণুর উদ্ধারদৃশ্যটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্তিও বেশ জনপ্রিয়। আঠার-উনিশ শতকের মন্দিরে বামনমূর্তিগুলিকে পরিব্রাজকবেশী ছত্রধারীরূপে দেখানো হয়েছিল। হলধারী বলরাম এবং পরশুধৃত পরশুরাম, ধনুর্বাণের দ্বারা রামচন্দ্র ও অশ্বারূঢ় অবস্থায় কল্কি অবতারকে দেখা যায়। প্রায়শই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার টেরাকোটাফলক লক্ষ্য করা যায়।

একক শিবমূর্তি, হরপার্বতীর বিবাহ, হরপার্বতীমূর্তি টেরাকোটাসজ্জারূপে বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-মন্দিরে চতুর্ভুজ শিবমূর্তির হাতে ডুগডুগি, মস্তকে জটাজাল ও সর্পসঙ্কুল, অন্যান্য হস্তে বিভিন্ন অস্ত্র। পরবর্তীকালের অনেক মন্দিরে শিব দ্বিভুজ, শিঙ্গাবাদনরত, সঙ্গে একটি ডুগডুগি, ত্রিশূল ও মড়ার মাথার খুলি। বাঁশবেড়িয়া, ঘুড়িষা (রঘুনাথ মন্দির), গুপ্তিপাড়া এবং বড়নগরে পশ্চিম দিকের 'চার বাংলায় শিব ও পার্বতী উভয়ে বৃষারূঢ়। লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায়ের 'নবরত্নে' (১৮০১), বালির দামোদরমন্দিরে এবং চন্দ্রকোণার গাজিপুরের শিবমন্দিরে পার্বতীর সঙ্গে শিব সিংহাসনে

আসীন। নন্দীও উপস্থিত। সুরুলের (বীরভূম) একটি দেউলমন্দিরে (শিখর খাঁজকাটা) শিবের হাতে বাদ্যযন্ত্র এবং তিনি পার্বতীর সঙ্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁর সান্নিধ্যে আছেন বরাহরূপী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কালী, গঙ্গা এবং নন্দী। বিষ্ণুপুরের শ্রীধরমন্দিরে নৃত্যরত শিবের একটি অপূর্ব নটরাজ মূর্তি এবং শিব-পার্বতীর বিবাহদৃশ্য আকর্ষণীয়।

'মন্দির' টেরাকোটা'য় চণ্ডী, দুর্গা ও কালীমূর্তি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার সাক্ষ্য রয়েছে অজস্র ফলকে। প্রাচীন একটি দুর্গামূর্তির ফলক লক্ষ্য করা যায় ষোল শতকের শেষ দিকে নির্মিত গোকর্ণের নৃসিংহ-মন্দিরে (১৫৯০)। এখানে একটি ফলকে চতুর্ভুজা দুর্গার হাতে বর্শা, দেবী অসুরের কেশ আকর্ষণ করছেন, দেবীর বাহন সিংহের দ্বারা অসুর আক্রান্ত। সতেরো শতকে নির্মিত যেসব দুর্গামূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়, তাতে দেখা যায় দেবী দশভুজা সিংহের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা, বিভিন্ন হাতে বহু অস্ত্র-শস্ত্র ঢাল, বর্শা, খড়গ প্রভৃতি। নিদর্শন, বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা, ঘুড়িষার রঘুনাথ, হরিপালের রাধাগোবিন্দ প্রভৃতি। আঠার শতকের মন্দিরে, বিশেষ করে, হাওড়া ও হুগলি জেলায় যেসব মন্দির নির্মিত হয়,তার দুর্গা-'টেরাকোটা'ফলকে একটি বিশালাকার সিংহের ওপর দেবী অধিষ্ঠিতা, দেবী বর্শার সাহায্যে অসুরের বক্ষ বিদারণরতা এবং অসুর সিংহের দ্বারা আক্রান্ত। উনিশ শতকের কোন কোন মন্দিরে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকে রাম ও রাবণের সম্মুখসমরে উভয়ের মধ্যস্থলে আবির্ভূতা হতে দেখা যায়। এটি লঙ্কাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে অকালবোধনে রামচন্দ্রের সম্মুখে দেবীর আবির্ভাবের দ্যোতক। এরূপ অতুলনীয় 'টেরাকোটা'-প্যানেল কালনার প্রতাপেশ্বরদেউলে (১৮৪৯) লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের কোন কোন মন্দিরে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গার টেরাকোটা-ফলক পাওয়া যায়, যেমন মাংলইএ (পাঁশকুড়া) মাইতিদের রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)।

শ্যামরায় ও কেষ্টরায়ের মন্দিরে এবং ঘুড়িষায় মুণ্ডমালাবিভূষিতা চতুর্ভুজা কালীমূর্তির টেরাকোটাফলক পাওয়া যায়। দেবীর হস্তে খড়গ এবং নৃমুণ্ড এবং তিনি শিবের ওপর দণ্ডায়মানা। আঁটপুরের পূর্বোক্ত কালী ছাড়া দশঘরার গোপীনাথ এবং কান্তনগরের মন্দিরে এবং আরও বহু স্থানে 'টেরাকোটা' কালী মন্দিরসজ্জার জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল।

চণ্ডীকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন মনে ক'রে কাল্পনিক কিছু কিছু টেরাকোটাফলক নির্মিত হলেও লৌকিক চণ্ডীর 'কমলেকামিনী' রূপটি টেরাকোটা-শিল্পীদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যার অজস্র নিদর্শন মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সমগ্র বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রাপথে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় পদ্মের ওপর উপবিষ্টা 'কমলে-কামিনী' মূর্তিই চণ্ডীরূপে উভয়কে রক্ষা করেছিলেন। সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় ধনপতি ও শ্রীমন্ত উভয়েই তাঁদের সিংহলযাত্রাকালে যে দেবী চণ্ডীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি একটি হস্তীকে একদিকে উদ্গীরণ ও নিগীরণ করছিলেন। এরূপ অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে উভয়ে বিস্ময়বিমূঢ় হন। কালক্রমে এই কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলগানের মাধ্যমে বাঙালিচিত্তে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। টেরাকোটাশিল্পীরা এটিকে 'মোটিফ'রূপে গ্রহণ করেন। সতের শতকের শেষ থেকে আঠার-উনিশ শতকের অজস্র 'টেরাকোটা'-মন্দিরে 'কমলেকামিনী' 'মোটিফ'টি খিলানের ওপরের প্রস্থে, কখনও বা, স্তম্ভগাত্রে বা নীচের দেওয়ালে স্থান পেয়েছিল। কমলে-কামিনীর অসংখ্য 'টেরাকোটা'-ফলক লৌকিক চণ্ডীর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। তবে বেশির ভাগ টেরাকোটায় দেবীকে গণেশজননীরূপে দেখান হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিভুজা এক দেবী পদ্মের ওপর উপবিষ্টা এবং তাঁর ক্রোড়ে গণেশমূর্তি। জরতী-বেশী দেবী

চণ্ডীকে আবার শ্রীলঙ্কার রাজা শালবাহনকর্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রীমন্তকে মশানে জহল্লাদের হাত থেকে রক্ষা করতে দেখা গেছে। এরূপ টেরাকোটাও কোন কোন মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছিল, যেমন, সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৯)।

চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু- ফুল্লরা কাহিনীতে যে গোধিকারূপিণী চণ্ডীর কথা আছে, তার অল্পকিছু 'টেরাকোটা'ফলকও লক্ষ্য করা গেছে কোন কোন মন্দিরে। যদিও তা সংখ্যায় নগণ্য। লৌকিক অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ, ষষ্ঠী প্রভৃতির টেরাকোটাফলক নেই বললেই চলে। শীতলা ও ষষ্ঠীর টেরাকোটাফলক ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়, যেমন, বালীদেওয়ানগঞ্জের দামোদরের 'আটচালা'য় (১৮২২) ষষ্ঠীর টেরাকোটা-প্যানেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে দেবী বিড়ালবাহনা এবং শিশুদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা। মকরবাহনা গঙ্গার কিছু কিছু টেরাকোটা লক্ষ্য করা গেছে অনেক মন্দিরে, যেমন, আঁটপুর, বড়নগরের 'চারবাংলা'র উত্তরদিকের মন্দির এবং আরও আনেক মন্দিরে।

সহায়ক গ্রন্থ

Michell, George (ed.) : *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983.

১২

'টেরাকোটা'য় সমাজচিত্র

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক দেবদেবীর লীলা অবলম্বনে অসংখ্য টেরাকোটা-ফলক বা প্রস্তরভাস্কর্যের সমাবেশ ছাড়াও মন্দির-অলংকরণে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আছে শুধু মানুষ ও তার জীবনধারার বিচিত্র অভিব্যক্তি। দেবদেবী ও তাঁদের লীলামাহাত্ম্য এখানে অনুপস্থিত। মধ্যযুগের মন্দিরটেরাকোটা-শিল্পে দেবতার লীলা ও মানুষের জীবনধারা দুটিরই পাশাপাশি সহাবস্থান, বিশেষ করে, দেবস্থান মন্দিরে, এমন ঘটনা অন্যত্র কোথাও বিরল। একদিকে যেমন নানা ধর্মসম্প্রদায়ের দেবদেবীর পাশাপাশি অবস্থান সেকালের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচায়ক, (বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, তান্ত্রিক সব দেবদেবীরই মূর্তিফলক মন্দির অলংকরণে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী আলোচনায় তা পরিস্ফুট।), অন্যদিকে বাস্তব জীবনের বহুমুখী চিত্রও মন্দিরের দেওয়ালে খুঁজে পাওয়া যায়। এরমধ্যে আছে দৈনন্দিন জীবন, আমোদপ্রমোদ— যেমন শিকার, ভ্রমণ, নৌযাত্রা, দরবারগৃহ বা সভাগৃহ, নাচগানবাজনা, অপরাধীর শাস্তিবিধান, বন্যজীবজন্তু, গৃহপালিত প্রাণী, পাখী, সাধুসন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা, লতাপাতাফুল এবং সর্বোপরি 'মিথুনদৃশ্য'। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক সরল সহজ জীবনের প্রতিচ্ছবি বহু টেরাকোটাফলকে লক্ষ্য করা যায়। এগুলিতে শুধুমাত্র সমকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়নি, এতে চিরন্তন মানবজীবনের এক স্পর্শকাতর চিত্রও পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলার মন্দির-টেরাকোটায় তাই বিষয়বস্তু ও তার চরিত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে দেখা যায়। প্রাক্-মুসলিম যুগে প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু স্থানের যেসব 'টেরাকোটা'-ফলক পাওয়া গেছে, যেমন পাহাড়পুর, মহাস্থান ও ময়নামতীতে (বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলার চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর চব্বিশপরগণা) ও কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) প্রভৃতি স্থানে, সেগুলির সঙ্গে একালের টেরাকোটা-ফলকগুলির তুলনা করলে এই চরিত্র বোঝা যাবে। একথা সত্য, ময়নামতী ও পাহাড়পুরের বৃহদাকার কিছু কিছু টেরাকোটা-ফলকে সেকালের সমাজের কিছু চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন যষ্ঠিধৃত দণ্ডায়মান দ্বারী, কুস্তিকসরত ও নানা শরীরক্রিয়ারত মল্লবীর, গৃহপ্রবেশরতা নারী, কূপে জল আহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী, স্ত্রী ও পুরুষযোদ্ধা, রথারোহী ধনুর্ধর, দীর্ঘশ্মশ্রু ও ঈষৎ নতপৃষ্ঠ ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, লাঙ্গলধারী কৃষক, মৎস্যবাহিনী বা মৎস্যকর্তনরতা নারী, নৃত্য ও সঙ্গীতরতা নারী, শিকারবাহী ব্যাধ, গীতবাদ্যরত পুরুষ, ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ, অস্থিচর্মসার, ন্যাঙ্গটপরিহিত ও স্কন্ধদেশে প্রলম্বিত যষ্ঠির দুইপ্রান্তে পুটুলি ঝুলানো পথিক সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াই, নানা কৌতুককর ঘটনা প্রভৃতি। দেবদেবীমূর্তিও বেশ কিছু ফলকে পাওয়া যায় যেমন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ এবং বেশিসংখ্যায় শিবের মূর্তি। এইসব ফলকে 'বৌদ্ধ দেবদেবী, বিশেষভাবে মহাযান-বজ্রযানবর্গের কয়েকটি দেবদেবীও আছেন, যেমন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যাত দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় নগণ্য বলিলেও চলে'। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, 'দেজ', ২য় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ ৬৫৩।

পাহাড়পুর (রাজসাহী) ও ময়নামতীর (কুমিল্লা) ফলকগুলি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন ঃ 'এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার পরিচয় সামান্যই, কিন্তু লক্ষণীয়, ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দপ্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও

প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের ও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিসম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষবোধ।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃ ৬৫৩)। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর এই টেরাকোটাশিল্প খ্রীস্টীয় অষ্টম নবম শতকের বলে ঐতিহাসিকদের মত। এ শিল্প সুপ্রাচীন কাল থেকেই ছিল। বাংলায় সমগ্র গাঙ্গেয় ভূমি জুড়েই ছিল এবং 'গ্রামে গ্রাম্য জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল । নীহাররঞ্জন রায়ের মতে 'সমসাময়িক বাঙলার লোকায়ত সামাজিক জীবনের যথার্থ বস্তুময় স্পন্দিত পরিচয় এই ফলকগুলিতে যতটা পাওয়া যায়, প্রস্তর প্রতিমাশিল্পে ততটা কিছুতেই নয়। রাজপ্রাসাদ ও অভিজাতচক্রের পরিধি হইতে দূরে সাধারণ মানুষের নিত্যকোলাহলময় জীবনধারা কিভাবে প্রবাহিত হইত, সমসাময়িক ব্যক্তি ও সামাজিক মানসের কী ছিল প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান এই মৃৎফলকগুলি।' (রায়,পৃ ৬৫৩)।

অষ্টম-নবম শতকের এই টেরাকোটাগুলির পর বহু শতাব্দী পরে টেরাকোটা-শিল্পের অভ্যুদয় ঘটল ষোল শতকের শেষ ও সতের শতক থেকে। বাংলার নদনদীর পলিমাটিতে গড়া ইঁট দিয়ে তৈরি মন্দিরগুলিতে 'টেরাকোটা' ফুল, লতাপাতা, দেবদেবীর মূর্তি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে দৃশ্যফলব মন্দিরসজ্জায় ক্রমে বিপুলপরিমাণে ব্যবহৃত হ'তে থাকল। কিন্তু এগুলির মধ্যে 'লোকায়ত' ভাবটাই পরিস্ফুট হোল বেশি, কি দেবদেবীমূর্তিতে, কি সামাজিক দৃশ্যফলকে। অনুমান করা যায়, পনের শতক থেকে এই টেরাকোটা শিল্পের নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রারম্ভিক পর্বে মূর্তির বদলে ছিল ফুল-লতাপাতার কাজ বা নক্‌শা, জ্যামিতিক রেখাবিন্যাস প্রভৃতি। মসজিদের মূর্তিবিহীন অলংকরণের অনুকরণে বা সেকালের রাজশক্তির কঠোর অনুশাসনের দ্বারা কতকটা বাধ্য হয়েই মন্দিরসজ্জায় মূর্তিবিন্যাস ততটা হয়নি। পরে এই নিয়ম যখন অনেকটা শিথিল হোল, তখন মূর্তির সন্নিবেশ দেখা দিতে লাগল মন্দিরগাত্রে। এর মূলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তি-আন্দোলন অনেকটা কাজ করেছিল, সেকথা আগে বলা হয়েছে।

'টেরাকোটা' শিল্পের এই পুনরভ্যুদয়ে যে নতুন মাত্রা যুক্ত হোল, তার ফলে সবরকম গোঁড়ামিমুক্ত এক নতুন শিল্প জন্মলাভ করল। সামাজিক জীবনদর্পণের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন চরিত্র ছাড়াও প্যানেলে এক সম্পূর্ণ দৃশ্যচিত্রের সন্নিবেশ করা হ'তে থাকল। সামাজিক জীবনচিত্রগুলির ফলক সাধারণতঃ প্রায় সব 'টেরাকোটা'-মন্দিরের নীচের ভিত্তিপ্রস্থে, কখনও বা থামের গায়ে সন্নিবেশিত হোল। খিলান-প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থগুলিতে বা কার্ণিশের নীচে বা সামনের দেওয়ালের দুপাশে দেবদেবীর মূর্তি ও লীলাদৃশ্য স্থাপিত হোল। প্যানেলের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের এক একটি ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যেমন শিকারদৃশ্য। এখানে শিকারী সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি বা রাজাজমিদারের পাল্‌কি বা ঘোড়ায় করে বনের দিকে যাত্রা, সঙ্গে লোকলস্কর এবং হাতী-ঘোড়া, পালকি বা ঝাম্পানের নীচে শিকারী কুকুর। শিকারীর ঘোড়ার বা হাতীর ওপর থেকে বাঘ বা অন্য কোন বন্য জন্তুকে বা হরিণকে বন্দুক বা বর্শার দ্বারা আক্রমণ, শিকারী কুকুরেরও আক্রমণ, কখনও বা ব্যাঘ্র বা হিংস্র পশুর কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ, ব্যাঘ্র বা হরিণ শিকারশেষে লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে প্রত্যাবর্তন-দৃশ্যগুলি প্যানেলে পর পর সন্নিবেশিত দেখা যায়। যুদ্ধযাত্রারও এইরূপ দৃশ্য ফলকগুলিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্ব আলোচিত দেবদেবীলীলাদৃশ্যও এরূপে 'প্যানেলে' দেখানো হয়েছে যাতে কোন বিশেষ ঘটনা সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়, যদিও তা করতে হয় অনেকটা সংক্ষেপে। কিন্তু মূল ভাবটি বোঝার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না। মধ্যযুগের এই 'টেরাকোটা'-শিল্পকে অনেকে লোকশিল্পরূপে আখ্যাত করেছেন। মূর্তিগুলির অঙ্গ

বিন্যাস, মুখের ভাব, পোষাক-আসাক, চলার গতি, দেহসৌষ্ঠব সবই সাধারণ লোকজীবনের প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে যত্নপূর্বক পরিশীলন বা শাস্ত্রীয় নিয়মের ধরাবাঁধা সীমাবদ্ধতা নেই। একারণে, প্রাচীন বাংলার পূর্বোক্ত লোকায়ত 'টেরাকোটা' শিল্পের সঙ্গে এগুলির কিছুটা তুলনা করা যায়। তবে আকার- আয়তনে, রেখাবিন্যাসে এবং নব পরিকল্পনায় এগুলির মধ্যে এক স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগে বাংলায় যে অসংখ্য 'টেরাকোটা'-মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে বহু মন্দিরে উপরিউক্ত সামাজিক চিত্রের অনেক ফলক লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহন, কেষ্টরায় ও শ্যামরায়ের মন্দির উল্লেখযোগ্য। মদনমোহন মন্দিরের নীচের প্যানেলে পশুপাখির মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ড্রাগনের মতো একটি প্রাণীর মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া আছে সংকীর্তনদল ও বাদ্যকরের 'টেরাকোটা'ফলক। শ্যামরায়ের মন্দিরে হাতীর ওপর হাওদায় উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পালকিবাহকের পালকিবহন ও ভিতরে রমণী প্রভৃতি দৃশ্য। কেষ্টরায়ের মন্দিরে বাদ্যকর, নর্তকীর মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। শ্যামরায় ও কেষ্টরায়মন্দিরে শিকারদৃশ্যের পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়- যেমন, রাজা বা জমিদারের শিকারযাত্রায় তাঁর পতাকাবাহক, তরবারীহস্তে পদযাত্রীর দল, তীরধনুক নিয়ে শিকারীগণ, কখনও বা তারা হাতী, ঘোড়া এবং উটের ওপর আরূঢ়, শিকার অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, ষাঁড় বা অন্য কোন বন্য জন্তুকে লাঠি দিয়ে আক্রমণ, নিহত জন্তুকে দণ্ডে ঝুলন্ত অবস্থায় নিয়ে গমন। এর মধ্যে আছে বন্য হরিণ, কৃষ্ণসার, সিংহ, বন্যশূকর, এমনকি হাতীও আছে।

সতের-আঠার শতকের মন্দিরেই শিকারদৃশ্য বেশি দেখা যায়। এই দৃশ্যে প্রায়ই দেখা যায়, হাতী এবং ঘোড়ার পিঠে থেকে শিকারী বন্যজন্তুকে বর্শা বিদ্ধ করছে। অশ্বারোহী শিকারী, ধনুর্ধারী, কুকুর ও যোদ্ধা ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে শিকারকে আক্রমণোদ্যত। ষোল এবং সতেরো শতকের মন্দিরের তলার দেওয়ালে (বেস্ ফ্রিজ্) এই ধরণের দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে, যেমন বৈদ্যপুরের (বর্ধমান) কৃষ্ণমন্দির, মেল্লকের (হাওড়া) মদনগোপালের আটচালা (১৬৫১), হরিপুরগড়ের রসিকরায়ের মন্দির।

বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেবের (১৬৭৯) মন্দিরে বিষ্ণুপুর মন্দিরের পূর্বোক্ত দৃশ্যগুলির সঙ্গে আর একটি দৃশ্য যুক্ত হয়েছে যেখানে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়োনো অশ্বের উপর আরোহী বন্যজন্তুকে আক্রমণ করছে, কখনও বা পদাতি ঘোড়াগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সতেরো শতকের অপরাপর মন্দিরেও এইরূপ শিকারদৃশ্য দেখা যায়, কোন কোন দৃশ্যে আবার খালিহাতে সিংহ বা অন্য কোন পশুর সঙ্গে যুদ্ধ-রত দেখা যায়, যেমন, গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রমন্দির, কোথাও বা কৃষ্ণসার হরিণ বা বন্যশূকরকে ছুরিকাবিদ্ধ করতে দেখা যায় অথবা শিকারকে ফাঁদে আটকাতে দেখা যায়, যেমন, জৌগ্রামের রাধাকান্ত মন্দির । শিকার ধরার সময় ধামসা বাজানোরও সেসময় নিয়ম ছিল।

আঠার শতকের মন্দিরে শিকারদৃশ্যে হাতী-ঘোড়ার সঙ্গে উটও উপস্থিত। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ঘোড়া ও তার আরোহী শিকারকে আক্রমণোদ্যত। শিকারীরা উট ও হাতীর পিঠ থেকে শিঙ্গা বাজায় এবং নীচে পদাতিরা ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে আক্রমণোদ্যত। অমরাগড়ির (হাওড়া) রাধামাধবের 'আটচালা'য় (১৭৬৪) এই দৃশ্য ও বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতিকেও দেখা যায়। এদের পরনে সাহেবী পোষাক। বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) 'চারবাংলা'র উত্তরদিকের মন্দিরে বাঘ ও সিংহ মানুষকে আক্রমণ করছে। মালঞ্চের দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' মন্দিরে (১৭১২) দেখা যায়, নিহত শিকারকে দণ্ডে ঝোলানো হয়েছে। উনিশ শতকের মন্দিরেও এইরূপ দৃশ্য দেখা গেলেও শিকারীর সঙ্গে কুকুর প্রায়ই দেখা যায়। ধনুর্ধারী, অশ্বারোহীদের পশুর প্রতি বর্শা নিঃক্ষেপ করতে দেখা যায়। বন্দুকধারী শিকারীর দল এবং হাতীর ওপর

আরোহীকেও দেখা যায়। দশঘরার (হুগলি) গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯) এবং কেন্দুলির (বীরভূম) রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' মন্দিরে (১৬৮৩) প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে শিকারদৃশ্যের মধ্যে দেখা যায়, শিকারীরা হাতী বা ঘোড়ার ওপর বসে ঢাল ও খাঁড়া নিয়ে, আর পশুরা লড়াই করছে। আঠার শতকেব কিছু মন্দিরের দুইকোণ থেকে লম্বায়মান উদ্‌গত 'টেরাকোটা'-গুলিতে আরোহীরা ওপরে ওপরে সমাসীন হয়ে সিংহ বা অন্য কোন অদ্ভুত বন্যপশু বা প্রাণীকে বর্শার দ্বারা আক্রমণোদ্যত। দৃষ্টান্ত, আসণ্ডার শ্রীধর, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ, গুড়াপের নন্দদুলাল, কেঁদুলির রাধামাধব, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র ও লালজীউর মন্দিরগুলি।

শিকারদৃশ্য ছাড়া নৌদৃশ্যের (বোটিং সীন) বহু টেরাকোটাফলক লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে হার্মাদ রণতরী বা পর্তুগীজ জলদস্যুদের জলযুদ্ধ, নৌকাভ্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাসদৃশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য। সেকালে বিচিত্র ধরণের নৌকায় কৃৎকৌশলের বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিও পূর্বোক্ত শিকারদৃশ্যের মতো নীচের দিকে সন্নিবেশিত হোত। ষোল শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগীজরা এদেশে আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে। পরে তাদের মধ্যে অনেকে জলদস্যুরূপে উপকূলবর্তী এলাকায় লুটপাট করত। এ নিয়ে বহু টেরাকোটাফলক তৈরি হয়েছিল। এছাড়া সেকালে বাঙালি সদাগরেরাও বিচিত্র ধরণের নৌকা নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করত, যেমন ধনপতি সদাগর, চাঁদসদাগর। সেকালের নৌকার আকার-বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। যুরোপীয় যুদ্ধজাহাজগুলি ছিল বিশালাকার, দ্বিতল, বন্দুকধারী ফিরিঙ্গী সৈনিকে ও নানা অস্ত্রসম্ভারে পূর্ণ, ওপরে উড্ডীয়মান পতাকা, জাহাজকক্ষের জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকা মানুষের মুখগুলো দেখা যায়। দেশজ বক্রাকৃতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী নৌকার প্রতিচ্ছবিও 'টেরাকোটা'ফলকে রূপায়িত হয়েছে। কান্তনগরের মন্দিরে দীর্ঘ বক্রাকৃতি নৌকার ওপর একটি কক্ষে হুঁকাপানরত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং পাশের কক্ষে মহিলা ও কয়েকজন পরিচারক, সেকালে অভিজাতদের নৌকাভ্রমণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উনিশ শতকের 'টেরাকোটা'-মন্দিরে উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর নৌকা লক্ষ্য করা গেলেও আগের তুলনায় সেগুলি অনেকটা সাধারণ, আড়ম্বরবর্জিত, যেমন আমরা নদীনালায় এখন নৌকা দেখে থাকি। দৃষ্টান্ত, শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) দেউল মন্দির। এরূপ সহজ সরল নৌকা বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। সতের শতক থেকে উনিশ-শতকের মধ্যে নির্মিত অসংখ্য মন্দিরে নৌদৃশ্য খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

উপরিউক্ত দৃশ্যফলকগুলি ছাড়া সমকালীন সমাজের বিভিন্ন মানুষের প্রতিচ্ছবি ও অন্যান্য ঘটনার দৃশ্যাবলীও আমরা পাই। সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষ, যেমন যোদ্ধা, অশ্বারোহী, নর্তক, বাদ্যকার, পরিচারিকা, সাধুসন্ন্যাসী, মোহান্ত, লিঙ্গপূজা। যুদ্ধদৃশ্যের অনেক 'টেরাকোটা'-ফলক সতের শতকের 'টেরাকোটা' শিল্পে স্থান পেয়েছিল। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় ও কেষ্টরায়ের মন্দিরে এই দৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যোদ্ধাদের বক্রাকৃতি খড়গ ও ঢাল, তীর-ধনু, দণ্ড ও বর্শা, কেউ কেউ শিঙ্গাবাদনরত, এমন কি, কেউ কেউ পতাকা বহন করে চলেছে।

বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব, দিগনগরের (নদীয়া) রাঘবেশ্বর এবং ঘুড়িষার (বীরভূম) রঘুনাথমন্দিরে এই দৃশ্য দেখা গেছে। এছাড়া, মেদিনীপুরের অনেক মন্দিরে, যেমন দাসপুরের সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬), রাধাকান্তপুরের দাসেদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (আ ১৮ শতক) মন্দিরে এই দৃশ্য আছে। মিথুনদৃশ্যের প্রচুর 'টেরাকোটা' ফলকও লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধদৃশ্যে কখনও কখনও পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত, মকরমুখ রথে ধনুর্ধারীরা আরূঢ়, সেই রথ সজোরে বিশালকায় অশ্ব টেনে

নিয়ে যাচ্ছে। যেমন, বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে দেখা যায়। কিছু কিছু যোদ্ধাদের পরণে অদ্ভুত ধরণের আলখাল্লা দেখা যায়, যেমন বাঁশবেড়িয়া ও আরও বহু স্থানের মন্দিরে। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায় (জোড়বাংলা) এবং দশঘরার গোপীনাথ মন্দিরের প্রবেশপথ-খিলানের ওপরে এবং কার্ণিশের নীচে বক্রাকৃতি প্যানেলে যোদ্ধাদের মূর্তি বসানো আছে। আঠার-উনিশ শতকের টেরাকোটায় এইরূপ যোদ্ধমূর্তি ও যুদ্ধদৃশ্য পাওয়া যায়, তাদের হাতে বন্দুক এবং কখনও কখনও তাদের পরণে সাহেবী পোষাক। যেমন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ, রামগড়ের (মেদিনীপুর) কালাচাঁদ, শ্রীবাটীর (বর্ধমান) ভোলানাথ শিব এবং শঙ্করশিবের মন্দির। অথবা কখনও বা তাদের পরণে মুসলমানদের মতো আঁটোসাঁটো পোষাক ও মাথায় টুপি বা ফেজ। যেমন, বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের মন্দির। কোনসময় য়ুরোপীয় কামান দাগার দৃশ্য যা সচরাচর দেখা যায় না যেমন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ ও শ্রীরামপুরের বিষ্ণুর আটচালা মন্দির। ক্বচিৎ ফিরিঙ্গির হাতে বন্দী কোন ভারতীয়কে দেখা যায়। নিদর্শন সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরমন্দির (১৮৪৫)।

প্রায়ই দেখা যায়, যোদ্ধারা ঘোড়ায় বা হাতীতে চ'ড়ে তীরধনুক নিয়ে অবস্থান করে। দৃষ্টান্ত, বৈদ্যপুরের কৃষ্ণমন্দির। গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রমন্দিরে ও বিষ্ণুপুরের মন্দিরে দেখা যায়, যোদ্ধারা হাতী ও ঘোড়া ছাড়াও অদ্ভুত আকারের সিংহের ওপর আসীন। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে যুদ্ধের বাহনরূপে হাতী ও ঘোড়ার সঙ্গে উটও উপস্থিত হয়েছে, যেমন, দাঁইহাটের (বর্ধমান) শিবমন্দির, বড়নগরের 'চারবাংলা'-গ্রূপের মন্দির প্রভৃতি। মেদিনীপুরেরও বহু মন্দিরে এই উট দেখা যায়, যেমন, রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) দাসেদের গোপীনাথমন্দির, চেঁচুয়া-গোবিন্দনগরের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১) এবং আরও অনেক মন্দির। কখনও বা যোদ্ধারা তেজী ঘোড়াকে বাগে আনতে ব্যস্ত। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়-মন্দির। কোন কোন মন্দিরে যোদ্ধবাহিনীর যুদ্ধযাত্রার পূর্ণদৃশ্য উপস্থিত হয়েছে দেখা যায়। মেদিনীপুরের সতেরো-আঠার শতকের অনেক মন্দিরে নীচের দিকে ভিত্তিবেদির সংলগ্ন দেওয়ালে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আঁটোসাঁটোভাবে পোষাক পরা যোদ্ধাবৃন্দ, সামনে পতাকাবাহী যোদ্ধা, পিছনে হস্তী ও অশ্বারোহী সৈনিক অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত এবং হাতী বা ঘোড়ার ওপর উপবিষ্ট রাজা বা জমিদার। দৃষ্টান্ত, রাধাকান্তপুরের দাসেদের গোপীনাথ মন্দির (আ আঠার শতকের প্রথম দিক, সংস্কারকাল ১৮৪৪)। এই মন্দিরের 'ভিত্তিবেদিসংলগ্ন প্যানেলের এক স্থানে সেকালের এক প্রবল প্রতাপশালী রাজার যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য অভিনব। অনুমান হয়, সতেরো শতকের শেষদিকে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে শোভা সিংহের সেই ঐতিহাসিক অভিযান এতে রূপায়িত।' (মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, প্রণব রায়, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ২০১-২০২)। এই মন্দিরে নদী বা সমুদ্রবক্ষে রণতরী ও নৌযুদ্ধ এবং শিকারদৃশ্যও বর্তমান। দাসপুর অঞ্চলের বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে এইসব দৃশ্য উপস্থিত।

যুদ্ধাভিযান ও যুদ্ধদৃশ্য ছাড়া নর্তক ও বাদ্যকরদেরও অনেক 'টেরাকোটা'ফলক লক্ষ্য করা গেছে। সতেরো শতকের বহু মন্দিরের সামনের দিকের অনেকটা এদের মূর্তিফলক দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-মন্দিরের সামনের দিকে নীচের অংশে, থামের গায়ে এবং দেওয়ালে এই মূর্তিগুলি লক্ষ্য করা যায়, এমনকি আবৃত বারান্দার দেওয়াল, গর্ভগৃহ এবং ভিতরের ছাদেও এগুলি লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরে বেশির ভাগই নর্তকী, পদযুগল সমেত ও দুইবাহু মস্তকের ওপর বিস্তৃত। বাদ্যকরদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আছে। তারা ঢোল, করতাল ও অন্যান্য যন্ত্রসহ বর্তমান।

এই ধরণের নর্তক ও বাদ্যকরদের দল সারিবদ্ধভাবে সতেরো শতকের অনেক মন্দিরে দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত 'টেরাকোটা'মন্দিরগুলিতে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। মালঞ্চের (খড়গপুর) দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' মন্দিরে (১৭১২) বাদ্যকরদের লম্বা 'রামশিঙ্গা' বাজাতে দেখা যায়। আবার, উনিশ শতকের কোন কোন মন্দিরে তাদের হাতে বেহালা দেখা যায়। এ-সময়ের মন্দিরের কোন কোনটিতে সাহেবী পোষাকে য়ুরোপীয় বাদ্যভাণ্ড('ড্রাম') বাজাতে দেখা যায়। সুপুরের (বীরভূম, বোলপুর) কোন কোন মন্দিরে বাদ্যভাণ্ড-বাদক ও অন্যান্য বাদকদের বহু মূর্তিফলক খিলান-প্রবেশপথের ওপরে বর্তমান।

সাধুসন্ন্যাসী ও বৃদ্ধব্যক্তিদের বহু মূর্তিফলক মন্দিরগাত্রে লক্ষ্য করা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীচের দিকে, দেওয়ালে ও স্তম্ভগাত্রে এদের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে শ্মশ্রুধারী 'নাঙ্গা' সাধুদের ভিক্ষার জন্য হস্তপ্রসারিত (উদাহরণ, বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব, কখনও প্রণামরত, কখনও বা মালাজপরত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁরা অনেক সময় একটি লাঠির ওপর ভর দিয়ে অথবা একপায়ে দণ্ডায়মান। তাদের দেহ থেকে অনেক সময় ছুঁচালো মুখ লম্বা গোঁজের মতো বস্তু প্রসারিত হয়েছে-সম্ভবতঃ তা বিভূতি বা জ্যোতির স্ফুরণ৷ কোন কোন সময় তাঁরা লিঙ্গপূজারত। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসীর 'মোটিফ' বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোন সময় তাঁদের দেখা যায় আহার প্রস্তুত করতে, কোনসময় তাঁরা বাদ্যভাণ্ড বাদনরত অথবা বীণা বাদনরত। হুগলির আঁটপুর ও দশঘরার মন্দিরে এই দৃশ্য দেখা যায়, অথবা তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গনরত বা একপায়ে দণ্ডায়মান, কোন সময় ভাঙ্ বা সিদ্ধি প্রস্তুতে ব্যস্ত। উদাহরণ, মালঞ্চের পূর্বোক্তমন্দির। দাসপুরে দধিবামনের 'পঞ্চরত্নে' (পরিত্যক্ত, ১৮৪৬) ঋষিগণ একটি আশ্রমে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশ পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। এটি যজ্ঞের দৃশ্য।

'টেরাকোটা'য় পরিচারিকাদের দৃশ্যও আকর্ষণীয়। তারা কোন সময় খাদ্যপ্রস্তুত, কোন সময় মাথায় খাদ্যভাণ্ডবহন অথবা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচর্যারত। হুগলির প্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী মন্দিরে মৎস্যকর্তনরত এক পরিচারিকার মূর্তি খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আঁটপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরে মহিলাদের পাশাখেলায় লিপ্ত দেখা যায়, কখনও বা তারা সুতোকাটায় লিপ্ত। কোন কোন 'টেরাকোটা'ফলকের প্যানেলে জানালার ধারে বসা ('বাতায়নবর্তিনী') বা উন্মুক্ত জানালার বাইরে মাথা বাড়িয়ে বসে থাকতে মহিলাদের দেখা যায়। (কালনার প্রতাপেশ্বর দেউল, ১৮৪৯), আনন্দপুরের (কেশপুর, মেদিনীপুর) রঘুনাথবিষ্ণুর মন্দির, চন্দ্রকোণা-গাজিপুরের শিবমন্দির। নদীয়ার দিগনগরের রাঘবেশ্বরমন্দিরে (১৬৬৯) ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা নগ্না স্ত্রীমূর্তি ও তার পাশে একটি হরিণকে একটি গাছের তলে দেখা যায়। এটিকে কেউ কেউ প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত 'শালভঞ্জিকা' মূর্তি মনে করেন। এই 'মোটিফ'টি পরবর্তীকালের আরও অনেক মন্দিরে দেখা যায়, যেমন পূর্বোক্ত হদলনারায়ণপুরে 'মেজ তরফে'র রাধাদামোদর মন্দির, কল্যাণপুরের (বাগনান, হাওড়া) দামোদরের 'নবরত্ন' মন্দির (১৭৮৬)। অবশ্য, শেষোক্তটিতে স্ত্রীমূর্তি বস্ত্রালংকারসজ্জিতা। বহু 'টেরাকোটা'ফলকে মহিলাদের চুল আঁছড়ানো, চুলবাঁধা, চন্দন ও সিন্দূর দ্বারা অলংকরণ জনপ্রিয় বস্তুরূপে গৃহীত হয়।

'মিথুনদৃশ্য' মন্দির-'টেরাকোটা'য় এক আবশ্যকীয় 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি 'টেরাকোটা'-অলংকৃত মন্দিরে এই দৃশ্য কোন-না-কোনভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, আঠার ও উনিশ শতকের মন্দিরগুলিতে এই দৃশ্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। আসণ্ডার (হাওড়া) শ্রীধরের নবরত্ন

(১৭৮৯), আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের আটচালা (১৭৮৬), দশঘরার বিশ্বাসদের গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (১৭২৯), কল্যাণপুরের (হাওড়া) দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬), লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায়ের নবরত্ন (১৮০১), লোয়াদার (ডেবরা, মেদিনীপুর) গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৫) প্রভৃতি মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। 'মিথুনদৃশ্যে'র মধ্যে তপস্বীলীলাদৃশ্যও পাওয়া যায়, যেমন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দমন্দিরে দেখা যায় যে, একজন নৃত্যরত নগ্ন তপস্বীকে একটি স্ত্রীলোক আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। আবার, দিগনগরের (নদীয়া) রাঘবেশ্বরের 'চারচালা' মন্দিরে (১৬৬৯) লক্ষ্য করা যায়, এক সুন্দরী স্ত্রীকে একজন তপস্বী জপমালা প্রদান করছে। পূর্বোক্ত লাওদার (দাসপুর) মন্দিরে পশুমৈথুনদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গনদৃশ্য প্রায় মন্দিরেই পাওয়া যায়। তপস্বীলীলার মধ্যে নারীপুরুষের মিলনদৃশ্য বা ভৈরবভৈরবীর যৌন মিলন অনেক মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। সেকালে মঠের মোহান্ত বা কোন কোন তপস্বীর সঙ্গে কোন নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে যে যৌনসম্পর্ক গড়ে উঠত, 'টেরাকোটা'ফলকে যেন তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মন্দিরে 'মিথুনদৃশ্যে'র উপস্থিতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলনদৃশ্যের সন্নিবেশ ওড়িশার মন্দিরগুলিতে, বিশেষ করে, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর এবং কোণার্কের মন্দিরে সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঐ মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। ওড়িশার আরও বহু মন্দিরে ঐ মিথুনদৃশ্য আছে। বাংলার মধ্যযুগের 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিতে এর প্রভাব খুব বেশি করে পড়ে, বিশেষ ক'রে, চৈতন্যোত্তর যুগের ইঁট ও পাথরের মন্দিরগুলিতে যার অজস্র নিদর্শন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দুই চব্বিশপরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূমের মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। 'মিথুনদৃশ্য'কে পারিভাষিক শব্দে 'মণি' বলা হয়। মন্দিরের বহিরঙ্গে এর সন্নিবেশের ফলে বজ্রপাত প্রভৃতির ভয় থাকে না। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের ফলে 'মণি'র সন্নিবেশ বিশেষভাবে লক্ষ্য কবা যেতে থাকে 'টেরাকোটা'-অলংকরণে বা প্রস্তরভাস্কর্যে।

'টেরাকোটা'শিল্পে আঠার শতক থেকে য়ুরোপীয়দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, সতেরো শতকের কোন কোন মন্দিরে পোর্তুগীজ জলদস্যুদের নৌযুদ্ধ টেরাকোটা-অলংকরণে প্রতিফলিত হতে থাকে। আঠার শতকে য়ুরোপীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে, ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, ডেনীয় ও পোর্তুগীজরা এদেশের নানা স্থানে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য কুঠি তৈরি ক'রে বসবাস করতে থাকে। নদীতীরবর্তী এলাকায় বহু কুঠি সেকালে তৈরি হয়েছিল। সেখানে তারা রেশম ও নীলকুঠি তৈরি করে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে থাকে। এদেশের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কিছু কিছু দেশীয় আচার-আচরণ তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার ইংরেজশাসনে বহু ফিরিঙ্গী সৈন্য মোতায়েন থাকত নানা স্থানে। বহু টেরাকোটা-ফলকে আমরা লক্ষ্য করেছি হুঁকোপানরত অনেক সাহেবকে, যাদের আরামকেদারার নীচে থাকত পোষা কুকুর। তারা এদেশীয় নারীদের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করত। এরও বহু ফলক আমরা পেয়েছি। বন্দুকধারী গোরাসৈন্যের দল কুচকাওয়াজরত, তাদের পরণে বিলাতী পোষাক ও জুতো। কোন কোন 'টেরাকোটা'ফলকের প্যানেলে দেখা গেছে, সাহেব রেল ইঞ্জিন চালাচ্ছে, যেমন আনন্দপুরের (কেশপুর, মেদিনীপুর), হেটলাপাড়ায় সরকারদের রঘুনাথ বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৯৩)। হেতমপুরের (দুবরাজপুর, বীরভূম) চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরে সপরিবারে সাহেবদের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) ভোলানাথশিবের 'পঞ্চরত্নে' টুপিমাথায় সাহেবদের মূর্তি ও আবক্ষমূর্তি সন্নিবেশিত হয়েছে দেখা যায়।

সাহেব-সুবোর দৃশ্য ছাড়াও আরও বহু দৃশ্য 'টেরাকোটা'-অলংকরণে স্থান পেয়েছিল- যেমন,

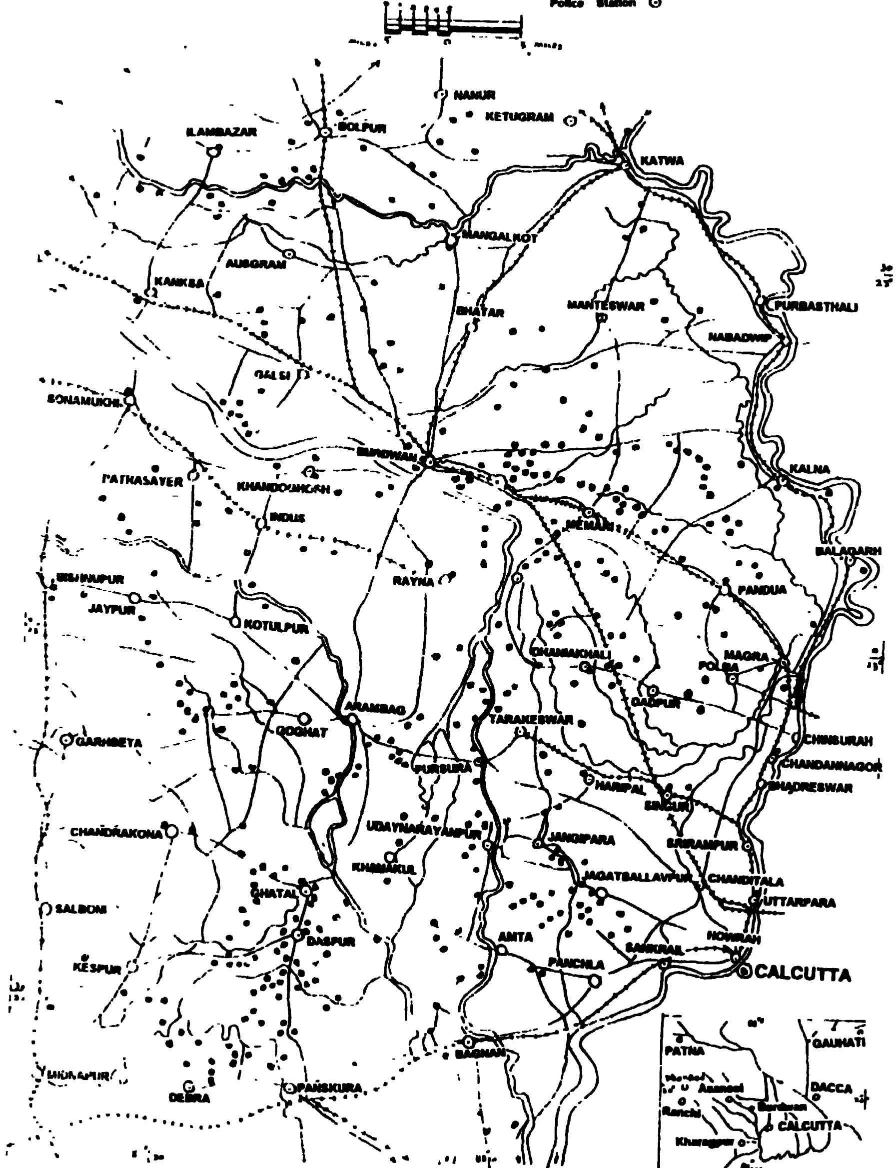
দানবাকৃতি মানুষ (বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়, দিগনগরের রাঘবেশ্বর, ঘুড়িষার রঘুনাথ, শ্রীবাটীর শঙ্করশিব মন্দির। গ্রীকপুরাণের 'সেন্টর'জাতীয় প্রাণী (নীচের অংশ হরিণের ন্যায় এবং ওপরের অর্ধাংশ মনুষ্যাকৃতি) হাতে ঢাল ও তরোয়ালসহ মন্দিরখিলানের ওপর প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে। কখনও বা একে তীরধনুক নিয়ে বধ করার দৃশ্যও দেখা যায়। লক্ষ্মণকর্তৃক মারীচবধদৃশ্য এখানে স্পষ্টতই 'টেরাকোটা' শিল্পীদের মনে স্থান পেয়েছিল। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের জোড়বাংলা ও শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্নে' অদ্ভুত ধরণের কয়েকটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। যেমন, শ্যামরায়ের মন্দিরে পক্ষযুক্ত মৎস্যদেহ মনুষ্যমূর্তি ও দুই হাতে ধনুর্বাণ, বাগরুই এ (কেশপুর, মেদিনীপুর) লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (আ উনিশ শতকের প্রথম দিক) এক প্রাণী যার দেহের নিম্নভাগ মনুষ্যদেহ ও সিংহের লেজসমন্বিত এবং উর্ধ্বভাগ হাতী ও সিংহের মস্তকসমন্বিত অবস্থায় দেখা যায়।

ফুল-লতাপাতার বাস্তব চিত্র, নকশা ও কাল্পনিক কিছু কিছু ফুলের সমারোহ অসংখ্য মন্দিরে পাওয়া যায়। যেসব মন্দিরে মূর্তিসমাবেশ করা যায় নি, সেখানে ফুল লতাপাতা দিয়ে কোনভাবে অলংকরণ করা হয়েছে। তাই ফুল-লতাপাতা মূর্তির বিকল্প হিসেবে অনেক মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে টেরাকোটা মূর্তিসন্নিবেশের একেবারে আদিপর্বে পনের-ষোল শতকের মন্দিরে ফুললতাপাতার নকশাই অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হোত। মূর্তিসন্নিবেশের পরও এগুলি অনেকসময় মূর্তিফলকের চারপাশে নকশার জন্য অথবা এককভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সর্পিলগতি লতার বহু চিত্রও আমরা পাই। এছাড়া, জ্যামিতিক নকশাও লক্ষ্য করা গেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা 'টেরাকোটা'-অলংকরণে একদিকে দেবদেবীলীলাদৃশ্য, অন্যদিকে সামাজিক চিত্রপটের বিপুল সমারোহের বিষয় জানতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়ে দেবলীলার কিছু কিছু জনপ্রিয় 'মোটিফ' এবং সামাজিক চিত্রপটের জনপ্রিয় দৃশ্যগুলির একটি তালিকা উপস্থিত করা হচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থ

Michell, George (ed): *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983.


BENGAL HEART LAND MAP
BRICK MONUMENTS
Monument Location
Police Station
ILAMBAZAR
BOLPUR
NANUR
KETUGRAM
KATWA
MANGALKOT
AUSGRAM
KANKSA
BHATAR
MANTESWAR
PURBASTHALI
NABADWIP
GALSI
SONAMUKHI
BURDWAN
PATHASAYER
KHANDOGHOSH
INDUS
KALNA
MEMARI
BALAGARH
BISHNUPUR
RAYNA
PANDUA
JAYPUR
KOTULPUR
DHANIAKHALI
MAGRA
POLBA
DADPUR
ARAMBAG
TARAKESWAR
GARHBETA
GOGHAT
CHINSURAH
CHANDANNAGOR
PURSURA
HARIPAL
BHADRESWAR
SINGUR
CHANDRAKONA
UDAYNARAYANPUR
JANGIPARA
SRIRAMPUR
KHANAKUL
JAGATBALLAVPUR
CHANDITALA
GHATAL
UTTARPARA
SALBONI
DASPUR
AMTA
HOWRAH
KESPUR
PANCHLA
SANKRAIL
CALCUTTA
BAGNAN
PATNA
GAUHATI
DACCA
Ranchi
PANSKURA
DEBRA
MIDNAPUR

১৩
মহাভারতকথা ও কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী
(জেলাভিত্তিক তালিকা)

স্থান	মন্দির ও প্রতিষ্ঠাকাল	দৃশ্যফলক
বাঁকুড়া		
কাদাসোল (বড়জোড়া)	ঘড়ুইদের বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (উনিশ শতকের প্রথমদিক)	রাসমণ্ডল, কৃষ্ণলীলা ও দশাবতার
কোতুলপুর	শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)	কৃষ্ণলীলা,
	'গিরিগোবর্ধন' মন্দির	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণকালী
	হালদারদের 'দালান'	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার
জিবটা (কোতুলপুর)	রায়েদের দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার
পাত্রসায়ের	রামরঘুবীরের 'আটচালা'	কৃষ্ণলীলা
পাহাড়পুর (ইঁদাস)	নন্দীদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ উনিশ শতকের মধ্যভাগ)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, অন্যান্য পৌরাণিকদৃশ্য
বাঁকাদহ (বিষ্ণুপুর)	রাধাদামোদরের 'আটচালা' (১৮৪৫)	কৃষ্ণ ও গোপীগণ, শিববিবাহ
শহর বাঁকুড়া	পাঠক পাড়ায় রাধাবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (আ আঠার শতক)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী
বালসি (পাত্রসায়ের)	'আটচালা' শিবমন্দির	গোষ্ঠলীলা, রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণ মানভঞ্জনদৃশ্য

	চন্দদের 'পঞ্চরত্ন'	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ ও গোপী
বিষ্ণুপুর	রাসমঞ্চ (আ ১৬০০)	সংকীর্তনদৃশ্য
	কালাচাঁদের 'একরত্ন' (১৬৫৬) (পাথর)	পৌরাণিক দেবদেবী, কৃষ্ণলীলা
	রাধামাধবের 'একরত্ন' (১৭৩৭)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার
	রাধাশ্যামের 'একরত্ন' (১৭৫৮) (পাথর)	বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, রাধাকৃষ্ণ
	মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪)	মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং ভীষ্মের শরশয্যা ও অন্যান্য কাহিনী
	শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩)	অজস্র কৃষ্ণলীলাদৃশ্য ও পৌরাণিক কাহিনী
	বসুপাড়ায় শ্রীধরের 'নবরত্ন'	কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্য
	কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫)	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী
মেটাল্যা (গঙ্গাজলঘাটি)	বাকুপাড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৭১৮)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও পৌরাণিক-কাহিনী
রাউতখণ্ড (জয়পুর)	'দে'-দের' পঞ্চরত্ন' (নাপিতপাড়া)	পৌরাণিক ও
রাজগ্রাম (বাঁকুড়া)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' (আ উনিশ শতকের মধ্যভাগ)	বিভিন্ন দেবলীলাদৃশ্য, গজকচ্ছপবাহী গরুড়, বনদুর্গা

	কুণ্ডুদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (আ উনিশ শতকের মাঝামাঝি)	কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক বিষয়
সোনামুখী	বাজারপাড়ায় তন্তুবায়পরিবারের শ্রীধরের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮৪৫)	কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক কাহিনী
হদলনারায়ণপুর (পাত্রসায়ের)	মণ্ডলদের 'ছোট তরফের' নবরত্ন (আ আঠার শতক)	কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক দৃশ্য
	দামোদরের 'নবরত্ন' (ছোটতরফ) (আ ১৮ শতক)	ভীষ্মের শরশয্যা, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ
	'মেজতরফের' রাধাদামোদরের 'নবরত্ন'	মহাভারতকথা, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, লৌকিকদেবদেবী, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ
	'বড়তরফের' সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ	অনন্তশায়ী বিষ্ণু, গজলক্ষ্মী রাধাকৃষ্ণ, মহিষমর্দিনী দুর্গা শিববিবাহ, গোষ্ঠিলীলা
	'বড়তরফের' রাধাদামোদরের ' পঞ্চরত্ন' (১৮০৬)	দশাবতার, পৌরাণিকদৃশ্য

মেদিনীপুর

অযোধ্যা, রঘুনাথবাড়ি (চন্দ্রকোণা)	লালজীউর 'আটচালা' (পাথর, আ১৮ শতক)	কৃষ্ণ-বলরাম, কৃষ্ণ ও দুপাশে গোপী, দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধ-অবতারে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ
আজুড়িয়া (দাসপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৮৭১)	শ্রীকৃষ্ণলীলা, গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাসমণ্ডলচক্র, পূতনাবধ, কমলেকামিনী , 'স্টাকো'র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর

	মনসার 'চারচালা' (আ ১৯ শতক)	দশাবতার, যশোদার দধিমন্থন, গঙ্গা, শিব ও শ্রীচৈতন্য, পঞ্চানন শিব
	শীতলার দেউল (আ ১৯ শতক)	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, যশোদার দধিমন্থন, বকাসুরবধ
আনন্দপুর (কেশপুর)	রাধাকৃষ্ণ ও দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৬৯)	নৌকাবিলাস, গোষ্ঠবিহার, গৌরনিতাইয়ের সংকীর্তন, গণেশ
	রঘুনাথবিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৯৩)	নৌকাবিলাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
	রায়েদের শিবের 'চাঁদনি' (পাথরে তৈরি)	সিদ্ধার্থ ও হংস, বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ, গণেশ
আলুই (ঘাটাল)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৮৬০)	দশাবতার, দশভুজা মহিষমর্দিনী
ইলামবাজার (চন্দ্রকোণা)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৭০)	বিভিন্ন টেরাকোটা
	শান্তিনাথ শিবের 'পঞ্চরত্ন'	জগদ্ধাত্রী, কালী, কৃষ্ণবলরাম, ষড়ভুজগৌরাঙ্গ
ঈশ্বরপুর (ঘাটাল)	শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন'	দশাবতার, নারায়ণ, কৃষ্ণবলরাম, কার্তিক-গণেশাদিসহ দশভুজা
উত্তর গোবিন্দনগর (দাসপুর)	ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০)	কৃষ্ণ-অদর্শনে শ্রীমতীর অচৈতন্যাবস্থা, রাধাকৃষ্ণ, ললিতা, গোপীগণের বস্ত্রহরণ

কাশাশোল (কেশপুর)	ঝাড়েশ্বরের পঞ্চরত্ন (১৮৩৪)	কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নিদ্রামগ্ন প্রহরী, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, নৌকাবিলাস, সমুদ্রমন্থন
কুশপাতা-গোবিন্দপুর (ঘাটাল)	পালিতদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (আ ১৮ শতকের শেষ, বর্তমানে লুপ্ত)	দশাবতার, নারদের ঢেঁকিতে গমন
ঘাটাল-কোন্নগর (ঘাটাল শহর)	সিংহবাহিনীর 'চারচালা' (১৪৯০)	ক্ষুদ্রাকৃতি কৃষ্ণমূর্তি
ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা)	রাধাদামোদর ও শীতলার পঞ্চরত্ন (১৮১৭)	কৃষ্ণ ও যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের ননীভক্ষণ, গোষ্ঠবিহার, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণবলরামের দ্বারকাযাত্রা, ঢেঁকিতে নারদ, কালী, দশভুজা মহিষমর্দিনী, শিবদুর্গা, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের নামসংকীর্তন
খুনবেড়িয়া (গোয়ালতোড়)	দুটি 'আটচালা'	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণবলরাম, বুদ্ধাবতারে জগন্নাথ
খোরদা -বিষ্ণুপুর (দাসপুর)	পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৮-৪৯)	দশভুজা দুর্গা,কমলেকামিনী দশাবতার
গম্ভীরনগর (শহর ঘাটাল)	'দে'দের 'পঞ্চরত্ন' তুলসীমঞ্চ (১৮১২)	কৃষ্ণলীলা, বৈষ্ণবলীলা, রাধাকৃষ্ণ
গড়ময়না (ময়না)	লোকেশ্বর শিবের 'আটচালা'	গোষ্ঠবিহার, নৌকাবিলাস
গোবিন্দনগর, চেঁচুয়া (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য

গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া)	তারকনাথের 'আটচালা' (১৮৮১)	কার্ত্তিকগণেশাদিসহ দশভুজা মহিষমর্দিনী, শিবদুর্গা, কমলেকামিনী, দশাবতার গোপীদের বস্ত্রহরণ, গৌরনিতাই
গোঁসাইবাজার (শহর চন্দ্রকোণা)	শান্তিনাথ শিবের 'আটচালা' (আ ১৯ শতক)	গরুড়বাহন বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্মা
	'দে'পরিবারের বিষ্ণুর পরিত্যক্ত 'চাঁদনি' (আ ১৮ শতক)	যশোদার দধিমন্থন, গোষ্ঠলীলা, নৌকাবিলাস, হিরণ্যকশিপুবধ
গোঁসাইবেড় (পাঁশকুড়া)	রাধাবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৮ শতকেরপ্রথমার্ধ)	রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলাসম্পর্কিত
গৌরা (দাসপুর)	হাঁড়াদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮২৪)	শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন
ঘোষপুর (কেশপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯শতকের প্রথমার্ধ)	নৌকাবিলাস, অনন্তনাগশয্যা, মহিষমর্দিনীদুর্গা কার্ত্তিকেয়াদিসহ
চাউলি (ঘাটাল)	জানাদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	কার্ত্তিকেয়াদিসহ মহিষমর্দিনী, কৃষ্ণলীলা, রাসমণ্ডলচক্র
	শীতলানন্দশিবের 'আটচালা' (১৮০৯)	দশাবতার, ষড়ভুজগৌরাঙ্গ
চাঁইপাট (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (নায়েকপাড়া, ১৭৫৯)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
	রাজরাজেশ্বরের 'নবরত্ন' (১৮২৮)	কৃষ্ণলীলা

জনার্দনপুর (দাসপুর)	সীতারামের 'দেউল' (১৮১৪)	সংকীর্তনরত ভক্ত, রাধাকৃষ্ণজপরত ভক্ত
জলচক (পিংলা)	রামচন্দ্রের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	গৌরনিতাই ও পার্ষদগণ
	রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন'	দশাবতার মূর্তি
জয়ন্তীপুর (চন্দ্রকোণা)	শ্যামচাঁদের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৫)	মানভঞ্জন,কৃষ্ণকে স্বর্ণপিণ্ড দিয়ে ওজন, কৃষ্ণের দ্বারকাগমনে গোপীদের শোক, দ্বারকায় রাজ্যাভিষেক, দ্বাদশ গোপীর রাসলীলা
জোতমুরি (দাসপুর) :	গঙ্গাধরশিবের 'আটচালা' (১৮২৮)	কার্ত্তিকগণেশাদিসহ শিবদুর্গা, গঙ্গা
ডিহি বলিহারপুর (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	কৃষ্ণবলরাম, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, দশাবতার, নৌকাবিলাস, কদম্ববনে কৃষ্ণের বিহার, গৌর-নিতাই
তমলুক	বর্গভীমার দেউল (আ ১৭ শতক)	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, মূষিকবাহন গণেশ, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, কার্ত্তিক, সরস্বতী, শিবদুর্গা, বকাসুরবধ, মকরবাহন গঙ্গা, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন
তিলন্তপাড়া (সবং)	জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১১)	মহাভারত ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনী, চণ্ডীকাহিনী — মহিষাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভবধ ইত্যাদি

		দৃশ্য, কমলেকামিনী, সমুদ্রমন্থন। কৃষ্ণকথা—দেবকীর প্রসববেদনা, কংসকর্তৃক মহামায়াকে হত্যার চেষ্টা, উগ্রসেনের নিষেধ, বসুদেবের যমুনাতরণ, কৃষ্ণকর্তৃক তৃণবর্তাসুর ও ঘোটকাসুরবধ
দলপতিপুর (ঘাটাল)	সঙ্কর্ষণ-রাধাদামোদরের 'নবরত্ন' (১৮০৩)	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, যশোদার দধিমন্থন, গোপীদের বস্ত্রহরণ
দক্ষিণবাজার (শহর চন্দ্রকোণা)	বিধ্বস্ত জোড়বাংলা (আঃ ১৭ শতক)	কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, দুইভক্ত
দ্বন্দীপুর (ঘাটাল)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, দশভুজা, কৃষ্ণবলরাম, সমুদ্রমন্থন
দাসপুর	সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬)	গোপীগণের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি, কালীয়দমন, বকাসুরবধ
	পালেদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯১)	মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী, মহিষমর্দিনী, কালী
	দধিবামনের 'পঞ্চরত্ন' (পরিত্যক্ত, ১৮৪৬)	মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহিনী
নবগ্রাম (ঘাটাল)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯)	রাধাকৃষ্ণ, পূতনাবধ, ধেনুকাসুরবধ

পাইকপাড়ি (ডেবরা)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (বর্তমানে 'একরত্নে' পরিণত) (১৭৭০)	হংসবাহনা বেদমাতা গায়ত্রী, কালী, দশাবতার,
পুরুষোত্তমপুর (ডাক বলিহারপুর)	ব্রজরাজকিশোরের 'একরত্ন' (১৭৭২)	রাধাকৃষ্ণ, গোপীবিলাস, কীর্তনীয়া
পূর্বগোপালপুর (পাঁশকুড়া)	রাধাবিনোদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৭৪)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ
বাগরুই (কেশপুর)	লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	বিষ্ণুর অনন্তনাগশয্যা, কার্তিকগণেশাদি সহ চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী, কৃষ্ণলীলা, জটিলা-কুটিলা, শ্রীচৈতন্যের সপারিষদ সংকীর্তন, কংসচানূরমর্দন, বৃষকেতুবধ
বাদাড় (কেশপুর)	জগন্নাথের 'নবরত্ন' (আ ১৮ শতকের প্রথম দিক)	ভীষ্মের শরশয্যা, নারায়ণ ও গজকচ্ছপের যুদ্ধ, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ধার, রথারূঢ় সূর্যদেবের আবির্ভাব এবং কৃতাঞ্জলি ভক্তবৃন্দের স্তুতি, সূর্য-মণ্ডলস্থিত গায়ত্রীমূর্তি
বালিতোড়া (দাসপুর)	শ্রীধরজীউর 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ (১৮৫২)	গৌর-নিতাইয়ের নাম-সংকীর্তন, রাসলীলা
বৃন্দাবনপুর (দাসপুর)	মহাপ্রভুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮২৭)	দ্বাদশ গোপালের বড়ো মূর্তি
বৈষ্ণবচক (খড়গপুর লোক্যাল)	শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৬১)	কৃষ্ণলীলা, যমলার্জুন

ব্রাহ্মণবসান (দাসপুর)	শ্রীধরের 'আটচালা' (আ ১৯ শতক)	দশভুজা মহিষমর্দিনী কার্ত্তিকগণেশাদিসহ, কৃষ্ণলীলা, যশোদার দধিমন্থন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা, গোপীদের বিলাপ
ভট্টগ্রাম (গোয়ালতোড়)	দামোদরের 'আটচালা' (১৮৬৭)	রাধাকৃষ্ণ, গোপীদের বস্ত্র-হরণ, দশভুজা মহিষমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী
মালঞ্চ (খড়গপুর লোক্যাল)	শ্যামাঠাকুরাণীর আটচালা (১৭১২)	রাসমণ্ডলচক্র
মাংলই (পাঁশকুড়া)	রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ
	সতেরোচূড়া রাসমঞ্চ (১৮৫৯)	কৃষ্ণলীলা— গোপীদের বস্ত্রহরণ বালকৃষ্ণের ননীচুরি, সমুদ্রমন্থন, মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর কয়েকটি দৃশ্যফলক, ঋষিগণের মহামায়ার স্তব ও দেবীর আবির্ভাব
মিত্রসেনপুর (শহর চন্দ্রকোণা)	রাধাকৃষ্ণের চাঁদনি (১৭৮০) শান্তিনাথশিবের 'নবরত্ন' (১৮২৮)	রাধাকৃষ্ণ, সংকীর্তনদৃশ্য, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, কৃষ্ণের দ্বারকা গমন ও গোপীদের বিলাপ, গৌর-নিতাই ও অদ্বৈতাচার্যের সংকীর্তন দৃশ্য, 'স্টাকো'র হরপার্বতী ও কার্ত্তিক গণেশ
রঘুনাথবাড়ি (গড়বেতা)	রঘুনাথের নববত্ন (পাথরের, আ ১৭ শতক)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার (ভাস্কর্য)
রাজহাটি (পাঁশকুড়া)	যুগলকিশোরের 'দেউল' (পরিত্যক্ত আ ১৯ শতক)	নৃসিংহ, রামসীতা, বলরাম, রাধাকৃষ্ণ
রাণাপুর (দাসপুর)	রঘুনাথের 'নবরত্ন' (১৮০১)	কৃষ্ণলীলা

রাধাকান্তপুর	গোপীনাথের 'একরত্ন'	শিববিবাহ ও অন্যান্য
(দাসপুর)	(আ ১৮ শতক, সং১৮৪৪)	
	দত্তদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন'	রাসলীলা ও কৃষ্ণলীলার
	(পরিত্যক্ত, ১৮৪৬)	দৃশ্য, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি
রাধানগর	গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (পাথরের)	কীর্তনীয়াদল এবং
(ঘাটাল)	(পরিত্যক্ত, ১৭১৮)	গৌরনিতাইয়ের সংকীর্তনদৃশ্য,
		গোপী-মণ্ডল ও কৃষ্ণ
রামগড়	কালাচাঁদের 'সপ্তদশরত্ন'	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
(বিনপুর)	(১৮৫৬)	
রামচন্দ্রপুর	একটি পরিত্যক্ত 'নবরত্ন'	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
(ময়না)	(আ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	
রামজীবনপুর	(দত্তপাড়া) লক্ষ্মীজনার্দনের 'চাঁদনি'	পৌরাণিক ও কৃষ্ণলীলা,
	(১৮১৪)	গৌরনিতাই ও অদ্বৈতা-
		চার্যের মূর্তি
	রঘুনাথের 'নবরত্ন'	রাধাকৃষ্ণ
(পাঁশকুড়া)	(১৭৯৬)	
লাওদা	বাঁকারায়ের 'নবরত্ন'	হরিনামসংকীর্তনদৃশ্য,
(দাসপুর)	(১৮০১)	দশাবতার (বুদ্ধাবতারে শ্রীচৈতন্য)
লালগড়	রাধামোহনের 'জোড়বাংলা'	চতুর্ভুজা কালী,
(বিনপুর)	(আ ১৯ শতক)	মহাদেব, মৃদঙ্গবাদনরত সংকীর্তক
	রাধামোহনের দ্বিতল 'চাঁদনি'	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ,
		ছিন্নমস্তা, দশভুজা
		মহিষমর্দিনী
		(স্টাকো)
লোয়াদা	রাধাকৃষ্ণের পঞ্চরত্ন	দশাবতার
(ডেবরা)	(১৮০৫)	
শ্যামসুন্দরপুর	অধিকারীদের রাধাকৃষ্ণের	দ্বাদশ গোপী ও
(শহর চন্দ্রকোণা)	'পঞ্চরত্ন'	রাধাকৃষ্ণ

শ্যামসুন্দরপুর (পাঁশকুড়া)	বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (পরিত্যক্ত) (১৮১৩)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি
শ্রীধরপুর (দাসপুর)	সামন্তদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের শেষ)	নারায়ণের অনন্তনাগশয্যা, পূতনাবধ। কৃষ্ণলীলা— নবনারীকুঞ্জর, গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন, রাসমণ্ডলচক্র
	বেরাদের সীতারামের 'পঞ্চরত্ন' (পরিত্যক্ত, আ ১৯ শতক)	দশাবতার, কৃষ্ণ ও গোপীলীলা
সত্যপুর (ডেবরা)	শীতলানন্দ রাধাকৃষ্ণের 'নবরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	টেরাকোটা ফুল
	'নবরত্ন' রাসমঞ্চ	গোপীমূর্তি, রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার, ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ
সুরৎপুর (দাসপুর)	শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৯)	কৃষ্ণলীলা, অর্ধোন্মুক্ত ভিনিসীয় দরজায় 'স্টাকো'র নারীমূর্তি
সোনাখালি (দাসপুর)	পঞ্চাননের 'আটচালা'	স্টাকোর নন্দীভৃঙ্গী
সৌলান (দাসপুর)	অধিকারীদের শ্যামসুন্দরের 'পঞ্চরত্ন' (আঁ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, অষ্টগোপাল
	'নবরত্ন' রাসমঞ্চ (১৮১৭)	কার্ত্তিকগণেশাদি সহ দশভুজা মহিষমর্দিনী
হবিবপুর (শহর মেদিনীপুর)	শিবের 'আটচালা'	কৃষ্ণবলরাম, রাধাকৃষ্ণ
হরিনাগেড়িয়া (ঘাটাল)	বিশ্বেশ্বরের 'দেউল'	শিবদুর্গা, কার্ত্তিকগণেশাদি মূর্তি

হরেকৃষ্ণপুর (পাঁশকুড়া)	দধিবামনের 'নবরত্ন'	শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, সমুদ্রমন্থন
	দধিবামনের 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ (১৮৫৬)	গৌরনিতাইয়ের নামসংকীর্তন, মৃদঙ্গবাদনরত সংকীর্তনদল

হাওড়া

অমরাগড়ি (আমতা)	গজলক্ষ্মীর 'আটচালা' (১৭২৯)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য,
	দধিমাধবের 'আটচালা' (১৭৬৪)	কার্তিকগণেশাদি সহ দুর্গা
আসণ্ডা (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথজীউর 'নবরত্ন' (১৭৮৯)	কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য, পৌরাণিক কাহিনী
ইছানগরী (জগৎবল্লভপুর)	গড়চণ্ডীর আটচালা (ভগ্ন, আ ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
ইছাপুর (জগৎবল্লভপুর)	রাসমঞ্চ (পরিত্যক্ত)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম
কল্যাণপুর (বাগনান)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬)	
কুমারপুর (জগৎবল্লভপুর)	রাসমঞ্চ (আ ১৯ শতকের মধ্যভাগ)	গৌর-নিতাই, রাধাকৃষ্ণ, শিব
খালনা (আমতা)	দামোদরজীউর 'চাঁদনি'	দশাবতার, কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য
গণেশপুর (শ্যামপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৮২০)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী, দশাবতার

জগৎবল্লভপুর	শিবের 'আটচালা' (১৭৬৩)	কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য
জয়পুর (আমতা)	শ্রীধরজীউর 'আটচালা' (১৭৮৪)	কৃষ্ণলীলা, কীর্তনীয়ার দল, দশাবতার ও অন্যান্য, পৌরাণিক দেবদেবী
ঝিখিরা (আমতা)	দামোদরজীউর 'আটচালা' (১৭৬৯) (পশ্চিমপাড়ায়) দামোদরের 'আটচালা' (১৭৭৬)	দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবী
রাউতাড়া (আমতা)	সীতারামের 'আটচালা' (১৭০০)	কৃষ্ণলীলা ও নানা পৌরাণিক দেবদেবী, কার্ত্তিকগণেশাদি সহ দুর্গা
	দামোদরের 'আটচালা' (১৭৬২)	দশাবতার, পৌরাণিক দেবদেবী
সীতাপুর (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথজীউর 'পঞ্চরত্ন' রাসমঞ্চ (আ ১৮ শতকের মধ্যভাগ)	দশাবতার, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, কৃষ্ণলীলা

হুগলি

আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬)	ভীষ্মের শরশয্যা, রাসলীলা, রাধাকৃষ্ণের ভোজনদৃশ্য, পূতনাবধ, শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি, কালী, ফুল লতাপাতার নক্শা
ইদলবাটি (গোঘাট)	(পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭২৭)	বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পশুপক্ষী, ফুল-লতাপাতার নকশা

ইলছোবা (পাণ্ডুয়া)	শিবের 'বারোচালা'	পৌরাণিক দেবদেবীমূর্তি
উত্তরপাড়া	'তারামন্দির' এলাকায় শিবের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৪)	কৃষ্ণ ও রামলীলা
কলিম্ব (খানাকুল)	শিবের দুটি 'আটচালা' (১৭৭৩ ও ১৭৯৮)	পৌরাণিক দেবদেবী,
কৃষ্ণপুর (পোলবা)	ঘোষেদের 'আটচালা' (১৭৬২)	রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার প্রচলিত দৃশ্য
খানাকুল-কৃষ্ণনগর (খানাকুল)	রাধাবল্লভের 'একরত্ন' (১৮১২)	ফুল ও লতাপাতা
গুপ্তিপাড়া (বলাগড়)	রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আঃ ১৮ শতকের গোড়া)	গরুড়বাহন বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ, গোপীগণ, কৃষ্ণলীলা
	বৃন্দাবনচন্দ্রের 'আটচালা' (১৮১০)	ফুল লতাপাতা
জঙ্গলপাড়া (পুরশুড়া)	পরিত্যক্ত 'আটচালা' ও মঙ্গলচণ্ডীর 'আটচালা' (আ ১৮ শতক)	বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী রামায়ণকাহিনী, পশুপক্ষী ও ফুল-লতাপাতা
তারকেশ্বর	তারকেশ্বরের 'আটচালা' (১৭২১?)	লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য, মহাভারত কাহিনী
দশঘরা (ধনিয়াখালি)	বিশ্বাসদের গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯)	সংস্কারকালীন কয়েকটি ফলক — দশভুজা মহিষ-মর্দিনী, রাম-রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি রাক্ষস ও রামলক্ষ্মণের যুদ্ধ
পারুল (আরামবাগ)	বিশালাক্ষীর 'আটচালা' (১৮৫৯)	বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি
বদনগঞ্জ (গোঘাট)	শ্রীধরলালজীউর দ্বিতল 'চাঁদনি' (১৮০৬)	বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি,

	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৮১০)	ঐ
বালি-দেওয়ানগ (গোঘাট)	দুর্গার 'জোড়বাংলা-নবরত্ন'	গণেশাদিসহ দুর্গা
বাঁশবেড়িয়া	অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯)	নৌকাবিলাস, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, রাসমণ্ডলচক্র, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, শিব
বৈঁচিগ্রাম	(বারোয়ারীতলায়) শিবের 'আটচালা'	রাসমণ্ডলচক্র ও মহিষ-মর্দিনীদুর্গা
ভালিয়া (আরামবাগ)	রঘুনাথের আটচালা (১৭৭২)	রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবীমূর্তি
সুখাড়িয়া (বলাগড়)	আনন্দভৈরবীর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮১৩)	কালী, কৃষ্ণকালী, অষ্টভুজা সিংহবাহিনী, পঞ্চমুখ গণেশ, দশভুজা মহিষমর্দিনী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বকাসুরবধ, পূতনাবধ, কালীয়দমন, দুটি সিংহোপরি গণেশজননী

বীরভূম

ইলামবাজার	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৬)	রাসমণ্ডল, গিরিগোবর্ধন-ধারণ, গোষ্ঠলীলা, মহিষাসুরমর্দিনী, শিবদুর্গা, মথুরায় গমনোদ্যত কৃষ্ণ-বলরাম, সংকীর্তনদৃশ্য
	একটি 'দেউল'	রামসীতা, গোষ্ঠলীলা, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, মহিষা-সুরমর্দিনী, যুগ্ম সিংহের উপর উপবিষ্টা জগদ্ধাত্রী

উচকরণ (নানুর)	চারটি 'চারচালা' (১৭৬৮)	দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, গোপীগণসহ কৃষ্ণ, মহিষাসুরমর্দিনী, বৃষারূঢ় শিবপার্বতী
গণপুর (মহম্মদবাজার) (কালীতলা)	শিবের চারচালা (১৪ টি ১৭৬৭-১৭৭৯)	দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী, বিষ্ণুর অনন্তনাগশয্যা, রাসমণ্ডল, কার্ত্তিক-গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার, কৃষ্ণ-লীলার বিভিন্ন দৃশ্য, পৌরাণিক দেবদেবী
	অপর পাঁচটি 'চারচালা'	কৃষ্ণের জন্ম, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণের দ্রৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্র-মন্থনের ঘটনাসমূহ, মোহিনীকর্তৃক দেবাসুরের মধ্যে অমৃত বন্টন এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী, ফুল লতাপাতা ও পশুপক্ষী
	একটি 'আটচালা' বিষ্ণুমন্দির (১৭৬৯)	মহিষাসুরমর্দিনী, গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ
ঘুরিষা (ইলামবাজার)	(বড় মঠের) রঘুনাথজীর 'চারচালা' (১৬৩৩)	বৃষারূঢ় শিব, কালী, ছিন্ন-মস্তা এবং অন্যান্য দশ-মহাবিদ্যা, রাবণ. রাম, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, বলরাম, মনসা, বৃষপৃষ্ঠে হরপার্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী, গোপীদের বস্ত্রহরণ, নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, গজেন্দ্রমোক্ষ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বলরাম, কালীয়দমন, গোষ্ঠলীলা

	গোপাল ও লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৭৩৮)	সংকীর্তনরত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, সিংহাসনারূঢ় রামসীতা, দুর্গা, দশাবতার, দশমহাবিদ্যা
চন্দনপুর (বোলপুর)	একটি দেউল (১৮৬৪)	দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, রামসীতা, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনপরিত্যাগের দৃশ্য
জয়দেব-কেন্দুলী (ইলামবাজার)	রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' (১৬৮৩)	দশাবতার, দশদিকপাল, কৃষ্ণলীলার দৃশ্য
তারাপুর (তারাপীঠ)	তারামায়ের 'আটচালা' (১৮১৮)	সপরিবারে মহিষাসুরমর্দিনী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা, 'অশ্বত্থামাহত' কাহিনীদৃশ্য, রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য, কৃষ্ণলীলা, গজ-লক্ষ্মী, মনসাদেবী
দুবরাজপুর, ময়রাপাড়া	'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দির	দশাবতার, কৃষ্ণলীলাদৃশ্য রামসীতা, শিব, অন্নপূর্ণা, শিববিবাহ
	ওঝাপাড়ায় শিবের ত্রয়োদশরত্ন	রামায়ণকাহিনী, নৃসিংহ, নারদ
	'নামোপাড়া'য় 'নবরত্ন'	মহিষাসুরমর্দিনী, কালী, শিববিবাহ
সেরাণ্ডী (বোলপুর)	নারায়ণের 'ত্রয়োদশরত্ন'	রাধাকৃষ্ণ, শিব
সিউড়ি	রাধাদামোদরের 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের প্রথমদিক)	কালীয়দমন, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডল, গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, সংকীর্তন,

		অনন্তশয্যায় বিষ্ণু, বাহন-পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বায়ু, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, গণেশ
সুরুল (বোলপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন'	রামায়ণকাহিনী, লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলার দৃশ্যাবলী, ক্ষুদ্রাকার পদ্মফুল, পত্রলতা
	দুটি 'দেউল' (১৮৩১)	রামসীতা, দশাবতার, কার্ত্তিকাদিসহ মহিষমর্দিনী দুর্গা
	পশ্চিমপাড়ার 'দেউল' (১৮৬১)	সিংহাসনে উপবিষ্টা রামসীতা, বীণাহস্তে শিব, পার্বতীকর্তৃক গণেশকে আদর, কার্ত্তিক, যম ও দশাবতার
হেতমপুর (দুবরাজপুর)	চন্দ্রনাথ অষ্টকোণা শিবমন্দির (১৮৪৭)	গণেশজননী, জগদ্ধাত্রী,

নদীয়া

কামালপুর (চাকদহ)	জীর্ণ 'আটচালা' (আ ১৮ শতক)	কালী, রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবী
তেহট্ট (তেহট্ট)	কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা (১৬৭৮)	চতুর্ভুজ নারায়ণ, 'আটচালা' প্রতিকৃতি শিব-মন্দির, হংসপংক্তি
দিগুনগর (কোতোয়ালী)	রাঘবেশ্বরের 'চারচালা' (১৬৬৯)	দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, কৃষ্ণরাধিকা, গোপীদের বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, রাম, বলরাম, বৃষভপৃষ্ঠে শিব,
দোগাছি	ভগ্ন (চারচালা ?) মন্দির	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য

বীরনগর (উলা) (রাণাঘাট)	রাধাকৃষ্ণের 'জোড়বাংলা' (১৬৯৪)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, পৌরাণিক দেবদেবী, কার্ত্তিক-গণেশাদি সহ মহিষমর্দিনী দশভুজা
মাটিয়ারী (কৃষ্ণগঞ্জ)	রুদ্রেশ্বর শিবের 'চারচালা' (১৬৬৫ ?)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, গোপীদের বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস
রাণাঘাট (রাণাঘাট)	(পালচৌধুরী বাড়ির) শিবের আটচালা (দুটি)	কালী, দশভুজা, বিভিন্ন দেবদেবীমূর্তি
শান্তিপুর (শান্তিপুর)	জলেশ্বর শিবের 'চারচালা' (আঃ ১৮ শতকের গোড়া)	ভীষ্মের শরশয্যা, রামায়ণ কাহিনী, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, গরুড়বাহন বিষ্ণু, হরপার্বতী, নারদ, কালী, সরস্বতী, গণেশ
	অদ্বৈতপ্রভুর 'আটচালা' (হাটখোলাপাড়া, আ ১৮ শতকের প্রথমার্ধ)	পৌরাণিক দেবদেবী — কার্ত্তিকগণেশাদি সহ দশভুজা মহিষমর্দিনী, দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, নারদ, কালী, যম

সহায়ক গ্রন্থ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত পুরাতত্ত্ববিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ

Michell, George (ed) *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983

রায় প্রণব ঃ— (নদীয়ার) পুরাকীর্তি-স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 'নদীয়া' গ্রন্থে দীর্ঘ প্রবন্ধ ও আলোকচিত্র। প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩)

১৪
সমাজচিত্র
(জেলাভিত্তিক তালিকা)

বাঁকুড়া

স্থান	মন্দির ও প্রতিষ্ঠাকাল	দৃশ্যপ্যানেল
পাত্রসায়ের	রামরঘুবীরের 'আটচালা'	বিভিন্ন সামাজিকদৃশ্য
পাহাড়পুর (ইঁদাস)	নন্দীদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (আ: উনিশশতকের মধ্যভাগ)	সামাজিকদৃশ্য
শহর বাঁকুড়া	পাঠকপাড়ায় রাধাবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (আ: আঠার শতক)	বিভিন্ন সামাজিকদৃশ্য
বিষ্ণুপুর	মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪)	কীর্তনদল, ড্রাগনের মতো পৌরাণিক জীব ও অন্যান্য সামাজিক দৃশ্য, পশুপক্ষী
	শ্যামরায়ের'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩)	বিভিন্ন সামাজিকদৃশ্য
	'বসুপাড়া'য় শ্রীধরের 'নবরত্ন' কেষ্ট রায়ের জোড়বাংলা (১৬৫৫)	বন্দুকধারী ফিরিঙ্গিসৈন্য, শিকারদৃশ্য, বন্যজীবজন্তু, স্থল ও নৌযুদ্ধদৃশ্য হংসপংক্তি, গৃহপালিতপশু
মেটাল্যা (গঙ্গাজলঘাটি)	বসুপাড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণের পঞ্চরত্ন (১৭১৮)	সামাজিক দৃশ্য
রাজগ্রাম (বাঁকুড়া)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' (আঃ উনিশ শতকের মধ্যভাগ)	গণ্ডারপৃষ্ঠে আরোহী, বাঘের পিঠে ভৈরব
সোনামুখী	শ্রীধরের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮৪৫)	পশুপক্ষী ও সামাজিকদৃশ্য, ফুলকারি নকশা
হৃদলনারায়ণপুর (পাত্রসায়ের)	মণ্ডলদের 'ছোট তরফে'র 'নবরত্ন' (আঃ আঠার শতক)	সামাজিক দৃশ্য, ফুলকারি নকশা
	'মেজতরফে'র রাধাদামোদরের 'নবরত্ন'	সামাজিক দৃশ্য

	'খড়তরফে'র রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৬)	বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য

মেদিনীপুর

আজুড়িয়া (দাসপুর)	'মনসার চারচালা' (আ: ১৯ শতক)	নগ্নপুংমূর্তি, মিথুনদৃশ্য,
আনন্দপুর (কেশপুর)	রঘুনাথবিষ্ণুর পঞ্চরত্ন (১৮৯৩)	রেলওয়ের ওপর সাহেবের স্টীম ইঞ্জিনচালনা, বন্দুকধারী সৈন্য, ব্যাঘ্রশিকার,
আমনপুর (কেশপুর)	ঘোষেদের শিবের 'চাঁদনি' (১৮৪০)	মিথুনদৃশ্য
	রায়েদের শ্রীধরের 'চাঁদনি'	য়ুরোপীয়দের প্রতিকৃতি
আমলাট (সুতাহাটা)	শিবের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯১৭)	নারীপুরুষ, মৃদঙ্গ ও করতাল বাদনরত স্টাকোর মূর্তি
আমোদপুর (খড়গপুর)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন'	গৌর-নিতাই
উত্তর গোবিন্দনগর (দাসপুর)	ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০)	ধনপতি-শ্রীপতির সিংহল-যাত্রা ও কমলেকামিনী
উত্তরধানখাল (দাসপুর)	শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৮৯)	মিথুনমূর্তি
কাটান (ঘাটাল)	প্রামাণিকদের শ্রীধরের দ্বিতল	মিথুনদৃশ্য
কাণাশোল (কেশপুর)	ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৪)	বাবাজী বা মোহন্তের পদ-সেবারতা রমণী, গোরা সৈন্যদল, কেদারায় উপবিষ্ট য়ুরোপীয় সেনানায়ক, জমিদার ও বাঈজী, মিথুন-দৃশ্য

	'আটচালা' ভোগমন্দির (১৮৫১)	মিথুনদৃশ্য
কুশপাতা-গোবিন্দপুর	পালিতদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (আ আঠার শতকের শেষ, বর্তমানে লুপ্ত)	যুবতির কেশপরিচর্যা
কৃষ্ণপুর (ঘাটাল)	দামোদর ও সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৮২৭)	মিথুনদৃশ্য
	সিংহবাহিনীর 'নবরত্ন' (১৮৭৭)	সাহেব-মেম মিথুন, প্যান্ট ও জ্যাকেট পরিহিত বন্দুক-ধারী দুই দ্বারী
কোন্নগর (ঘাটাল শহর)	সিংহবাহিনীর 'চারচালা' (১৪৯০)	বৃহদাকার দ্বারীমূর্তি, পোড়া-মাটির ফুল ও নকশা
ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা)	রাধাদামোদর ও শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (দয়ালবাজার, ১৮১৭)	রমণীর কেশপরিচর্যা, নারীর শিবলিঙ্গপূজা
(গোয়ালতোড়)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'আটচালা' (আ আঠার শতক)	মিথুনদৃশ্য
গঙ্গাদাসপুর (চন্দ্রকোণা)	উমাপতিশিবের 'আটচালা' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	মিথুনদৃশ্য
গম্ভীরনগর (শহর ঘাটাল)	'দে'পরিবারের 'পঞ্চরত্ন' তুলসীমঞ্চ (১৮১২)	হাতী ও ঘোড়ায় চড়ে হরিণশিকার, অশ্বপৃষ্ঠে ব্যাঘ্রশিকার, সাহেব ও তার সামনে বন্দুকধারী গোরাসৈন্য, দুজন অশ্বারোহীর হরিণ ও বন্যবরাহশিকার, উটে দুজন আরোহী, শিকারীকে ব্যাঘ্রের আক্রমণ, জনৈক অপরাধীকে ব্যাঘ্রমুখে নিঃক্ষেপ

গড় ময়না (ময়না)	লোকেশ্বরশিবের 'আটচালা'	পতাকাধারী মুসলমান সৈনিক,অশ্বারোহীর শিকার কয়েকজন অশ্বারোহী, হার্মাদ রণতরী, হংসপংক্তি
গোবিন্দনগর, চেঁচুয়া (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দ ও রাধারমণের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১)	সাহেবের শিকারদৃশ্য হাতীর ওপর বন্দুকধারী শিকারী অশ্বারোহী দুই যোদ্ধার সম্মুখযুদ্ধ, হার্মাদ রণতরী, মুঘল সেনার যুদ্ধযাত্রা, ঝাম্পানে লোকলস্কর পরিবৃত জমিদার-নীচে শিকারীকুকুর ও ভালুকনাচ, দ্বিতল প্রাসাদকক্ষে উপবিষ্টা রমণী, হুকাসেবনরত সাহেব
গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া)	তারকনাথের 'আটচালা' (১৮৮১)	অর্ধোন্মুক্ত ভিনিসীয় দরজায় দণ্ডায়মান নারী
গোয়ালতোড়	সনকার 'চারচালা' (আ ১৭ শতক)	মিথুনদৃশ্য
গোসাঁইবাজার (শহর চন্দ্রকোণা)	'দে'দের বিষ্ণুর চাঁদনি (পরিত্যক্ত,আ ১৮ শতক)	তামাকুসেবনরত এক বাবু
গৌরা (দাসপুর)	হাঁড়াদের লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন (১৮২৪)	মিথুনদৃশ্য
ঘোষপুর (কেশপুর)	পলমলদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	মিথুনদৃশ্য
চাউলি (ঘাটাল)	শীতলানন্দের 'আটচালা (শিবের মাড়ো, ১৮০৯)	মিথুনদৃশ্য

	জানাদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	ঝাম্পানে জমিদারের গমন, অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈন্য, জলদস্যু, বন্যজন্তু-শিকার
চাঁইপাট (নায়েকপাড়া)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৫৯)	ব্যাঘ্রশিকার, হাতীর পিঠে-চড়ে কুমীরশিকার, কুচকাওয়াজরত সৈনিক, নগ্না স্ত্রীলোক
	রাজরাজেশ্বরের 'নবরত্ন' (১৮২৮)	নগ্নানারী, মিথুনদৃশ্য
জলচক (পিংলা)	রামচন্দ্রের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	ভাঙপ্রস্তুতকারী তপস্বী, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত, শকুন্তলা বা জনৈক রমণীর হরিণশাবককে খাওয়ানো, মিথুনদৃশ্য,নগ্ন স্ত্রীপুরুষ, নগ্নাবস্থায় প্রসাধনরতা নারী
জোতমুরি (দাসপুর)	গঙ্গাধর শিবের 'আটচালা' (১৮২৮)	মিথুনদৃশ্য
তমলুক	বর্গভীমার 'দেউল' (আ ১৭ শতক)	লীলাপদ্মহস্তা নায়িকা
তিলন্তপাড়া (সবং)	জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১১)	পোর্তুগীজ জলদস্যুদের বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য, চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেব-মেমের সম্ভোগদৃশ্য, নীচে কুকুর, জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদব্রজে গমন, পরিচারক ছত্রধারী, শিকারদৃশ্য, অশ্বারোহী সাহেবের

		হরিণশিকার, উটের পিঠে বাজনা বাজিয়ে বনে হরিণ-'খেদা' দৃশ্য, রতিবিলাস।
দ্বন্দ্বীপুর (ঘাটাল)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	হার্মাদ রণতরী, গোরাসৈন্য, ফরাসবিলাসী জমিদার ও তার পারিষদবৃন্দ, শিকার-দৃশ্য, অর্ধোন্মুক্ত দরজায় গাউন ও আধুনিক বেশধারিণী নারী, বেশ্যামূর্তি
দাসপুর	সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬)	শিকারদৃশ্য, ফরাসবিলাসী জমিদারের ঝাম্পানে যাত্রা, হার্মাদ রণতরী ও নৌযুদ্ধ, ফুললতাপাতার সূক্ষ্মকাজ
নবগ্রাম (ঘাটাল)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯)	শঙ্খবাদনরতা স্ত্রী, গায়িকা, সন্ন্যাসী, বাদক, জনৈক স্ত্রীলোকের টিয়াপাখিকে আহারদান
পলাশপাই (দাসপুর)	শ্রীধরজীউর 'দেউল' (১৮৩৪)	মিথুনদৃশ্য, সাহেব-মেমের মূর্তি
পাইকপাড়ি (ডেবরা)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (এখন 'একরত্ন', ১৭৭০)	প্যান্ট ও শার্টপরা পুরুষমূর্তি, শঙ্খবাদনরতা নারীমূর্তি
পিংলা	উত্তরনাড়ায় শিবের 'দেউল' (১৮৬৯)	নারীসহ বিলাসী জমিদার
	বোসপাড়ায় চণ্ডীর 'চাঁদনি' (১৮৫৫)	অনাবৃত বক্ষ ঘাঘরাপরা

পুরুষোত্তমপুর (ডাক বলিহারপুর)	ব্রজরাজকিশোরের 'একরত্ন' (১৭৭২)	অশ্বারোহণে ব্যাঘ্রশিকার, ঝাম্পানে জমিদারের মৃগয়া,পোর্তুগীজ জলদস্যুদের জলযুদ্ধ, মৃগদল অনুসরণকারী শিকারী, পলায়মান মৃগদল
পূর্বগোপালপুর (পাঁশকুড়া)	রাধাবিনোদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৭৪)	মিথুনদৃশ্য, পশুমৈথুন
বাগরুই (কেশপুর)	লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (পরিত্যক্ত আ ১৯ শতক)	
বৈষ্ণবচক (খড়গপুর লোক্যাল)	শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৬১)	ধনপতি ও শ্রীপতির সিংহলযাত্রা এবং কমলেকামিনীদৃশ্য, দুটি বিশাল নারীমূর্তি উর্ধ্বাঙ্গে স্তনবাস ও নিম্নাঙ্গে ঘাঘরা
ভট্টগ্রাম (গোয়ালতোড়)	রের 'আটচালা (১৮৬৭)	সাহেবসুবো, গোরাপল্টন
মালঞ্চ (খড়গপুর লোক্যাল)	শ্যামাঠাকুরাণীর 'আটচালা' (১৭১২)	শিকার ও যুদ্ধদৃশ্য, বাঈজী-নাচ
রঘুনাথবাড়ি (গোয়ালতোড়)	রঘুনাথের 'নবরত্ন' (পাথরে তৈরি, আ ১৭ শতক)	শিকার ও অন্যান্য সামাজিক দৃশ্য
রাজনগর (পাঁশকুড়া)	ঝাড়েশ্বরের 'দেউল (আ ১৯ শতক)	বাউলসন্ন্যাসী, বেহালা-বাদনরতা নারী, লোলচর্মা বৃদ্ধা, স্ত্রীলোকের কেশ পরিচর্যা, শিবলিঙ্গপূজা, সাধুর ভাঙঘোঁটা, মিথুনদৃশ্য

রাজহাটি (পাঁশকুড়া)	যুগলকিশোরের দেউল (পরিত্যক্ত, আ ১৯ শতক)	বিজয়দৃশ্য
রাধাকান্তপুর (দাসপুর)	দাসেদের গোপীনাথের একরত্ন' (আ ১৮ শতকের প্রথম, সংস্কার১৮৪৪)	যুদ্ধযাত্রার দৃশ্যের একটি প্যানেল, রণতরী, নৌযুদ্ধ, শিকারদৃশ্য, চড়ক, খেজুর রসের জন্য খেজুরগাছে আরোহণ
	রঘুনাথের পঞ্চরত্ন (দত্তদের) (পরিত্যক্ত, ১৮৪৬)	বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য
রামগড় (বিনপুর)	কালাচাঁদের 'সপ্তদশরত্ন' (১৮৫৬)	বন্দুকধারী গোরাসৈন্য, অশ্বযানে সাহেব-মেমের যাত্রা
লস্করদীঘি (পাঁশকুড়া)	পণ্ডাদের রঘুনাথের 'নবরত্ন' (১৭৯৬)	মিথুনদৃশ্য
লাওদা (দাসপুর)	বাঁকারায়ের 'নবরত্ন' (১৮০১)	উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপের মৈথুনদৃশ্য, পশুমৈথুনদৃশ্য
লালগড় (বিনপুর)	রাধামোহনের দ্বিতল 'চাঁদনি' (আ ১৯ শতক)	মিথুনদৃশ্য
	দুর্গার 'চাঁদনি'	নর্তকী
লোয়াদা (ডেবরা)	রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৫)	ময়ূরের সর্পবধ, নগ্না নারী-মূর্তি
শিরোমণি (মেদিনীপুর)	সিংহবাহিনীর 'একরত্ন' (পরিত্যক্ত, আ ১৯ শতক)	দুটি দণ্ডায়মান দ্বারী ও দ্বিতলগৃহ
শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা (পাঁশকুড়া)	বিষ্ণুর পঞ্চরত্ন (পরিত্যক্ত, ১৮১৩)	মিথুনদৃশ্য

শ্রীধরপুর (দাসপুর)	সামন্তদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের শেষদিক)	মাতৃক্রোড়ে শিশু, দধিভাণ্ড বহনরত গোপ, অশ্বারোহীর ব্যাঘ্রশিকার, বৃদ্ধের স্কন্ধে উপবিষ্টা বৃদ্ধা
	নীলকণ্ঠ শিবের ভগ্ন 'পঞ্চরত্ন'	মিথুনদৃশ্য
সত্যপুর (ডেবরা)	সত্যেশ্বরের 'দেউল' 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ	রাজারাণী, মিথুনদৃশ্য মিথুনদৃশ্য
সুরৎপুর (দাসপুর)	শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৯)	ধনপতি-শ্রীপতির সিংহলযাত্রা ও কমলে-কামিনীদৃশ্য, মিথুনদৃশ্য
সোনাখালি (দাসপুর)	পঞ্চাননের 'আটচালা' (১৭৭৩)	মিথুনদৃশ্য, পশুমৈথুন
সৌলান (দাসপুর)	অধিকারীদের শ্যামসুন্দরের 'পঞ্চরত্ন' (আ: ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	কমলেকামিনীদৃশ্য
হবিবপুর (শহর মেদিনীপুর)	শিবের 'চারচালা'	মিথুনদৃশ্য
হরিনাগেড়িয়া (ঘাটাল)	বিশ্বেশ্বরের 'দেউল'	সাহেব-মেমের মিথুনদৃশ্য

হাওড়া

অমরাগড়ি (আমতা)	গজলক্ষ্মীর 'আটচালা' (১৭২৯)	বন্দুকধারী গোরাসৈন্যের কুচকাওয়াজ, রণভেরী ও বাদ্যভাণ্ডসহ বাদক এবং ঢাল-তরোয়ালহাতে দেশি পদাতি, হরিণদল, বিকশিত পদ্ম ও কল্পলতা, হংসপংক্তি ও গোরুর পাল

	দধিমাধবের 'আটচালা' (১৭৬৪)	য়ুরোপীয় অর্ণবপোত ও নাবিক, হাতী বা ঘোড়ার পিঠে বসে শিকার, বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতি, ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণ, পালকিতে করে জনৈক বাবুর গমন, মিথুনদৃশ্য, বিভিন্ন শিকারদৃশ্য
আসণ্ডা (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথজীউর 'নবরত্ন' (১৭৮৯)	বন্দুকসহ গোরা-সৈন্য, বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতি, পালকিতে ভ্রমণ, মল্লযুদ্ধ, মিথুনদৃশ্য
ইছানগরী (জগৎবল্লভপুর)	গড়চণ্ডীর (ভগ্ন) 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	মোহান্ত, প্রহরী, যোদ্ধৃবৃন্দ, সুন্দরী রমণী
কল্যাণপুর (বাগনান)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬)	গৃহবধূর ঢেঁকিতে ধানভানা, ধোবার কাপড় পরিষ্কার,নাপিতের ক্ষৌরকর্ম, কামারের হাপর চালানো ও লোহা পিটানো, তাঁতি মেয়ের চরকায় সুতোকাটা, মিথুনদৃশ্য
কুমারপুর (জগৎবল্লভপুর)	রাসমঞ্চ (আ ১৯ শতকের মধ্যভাগ)	জপমালাহস্তে সাধু, মাতৃস্তন্যপানরত শিশু, বর্শাধারী দ্বারী, বাদ্যযন্ত্রসহ বাদিকাবৃন্দ
খালনা (আমতা)	দামোদরজীউর চাঁদনি	শিশুকোলে স্ত্রী,পাখাহাতে স্ত্রীলোক, নর্তকী, কলসি-কাঁখে গৃহবধূ, মল্লবীর,মৈথুনরত স্ত্রীপুরুষ, বন্দুকধারী সাহেব, বিভিন্ন ভঙ্গিতে মোহান্ত

জগৎবল্লভপুর	শিবের আটচালা (১৭৬৩)	শিকার ও যুদ্ধযাত্রাদৃশ্য
ঝিখিরা (আমতা)	শ্যামসুন্দরের 'আটচালা' (১৬৯১)	শিকারদৃশ্য, পোর্তুগীজ জলদস্যুকর্তৃক ধৃত এদেশের স্ত্রী-পুরুষ-বোঝাই জাহাজ, মিথুনদৃশ্য, হংসমৈথুনদৃশ্য
	দামোদরজীউর 'আটচালা' (১৭৭৬)	ফরসিবিলাসী জমিদার ও তার সামনে যুদ্ধরত দুই মল্ল
মেল্লক (বাগনান)	মদনগোপালের 'আটচালা' (১৬৫১)	বেদেনীদের কলাকৌশল, মোহান্ত
রাউতাড়া (আমতা)	সীতারামের 'আটচালা' (১৭০০)	অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী, বর্শাহাতে অশ্বারোহী শিকারী, পালকিতে ক'রে জমিদারবাবুর যাত্রা, যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত অশ্ব, ফরসি-বিলাসী বাবু,পাত্রমিত্র-সমেত ধনী বা জমিদারের নৌকাভ্রমণ, মোহান্ত, বাদক-বাদিকা
সীতাপুর (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথজীউর 'পঞ্চরত্ন' রাসমঞ্চ (আ ১৮ শতকের মধ্যভাগ)	জমিদার বা বাবুর পদ-সেবারত স্ত্রী, নর্তকী,বন্দুক-হাতে শিকারী, হাতীর পিঠে শিকারী, হরিণশিকারী মিথুনদৃশ্য

হুগলি

আকনাপুর (তারকেশ্বর)	দুটি 'আটচালা' (পরিত্যক্ত, ১৭৫৮ ও ১৭৬০)	প্রথমটিতে (১৭৫৮) রাজদরবার এবং প্রমোদ-

		ভ্রমণের জন্য দেশীয় নৌকা এবং অন্যটিতে কামান-সজ্জিত য়ুরোপীয় জাহাজ ও অত্যাচারের দৃশ্য
আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া)	রাধাগোবিন্দের আটচালা (১৭৮৬)	য়ুরোপীয় দ্বিতল যুদ্ধ-জাহাজ ও অত্যাচারী দস্যু
ইলছোবা (পাণ্ডুয়া)	শিবের 'বারোচালা' (আ ১৮ শতক)	; ও ফুললতাপাতার নকশা ও প্রতিকৃতি, য়ুরোপীয় রণতরী, ডেকের ওপর কামানধারী
	ঘোষেদের শিবের 'আটচালা' (১৭২৬)	ফুল-লতাপাতা
কলিম্ব (খানাকুল)	শিবের আটচালা (১৭৭৩)	রাজদরবার
কয়াপাট (গোঘাট)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' (১৮০৭)	রাজদরবার, পশুপক্ষী
কাঁকড়াকুলি (ধনিয়াখালি)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'আটচালা' (১৭৩৩)	য়ুরোপীয় রণপোত, গোলা-বর্ষণরত লোক
কৃষ্ণপুর (পোলবা)	ঘোষেদের 'আটচালা' (১৭৬২)	রাজদরবার, পশুপক্ষী, য়ুরোপীয় বাণিজ্যপোত, কেবিনে হস্তী, ফুল-লতাপাতা
খেদাইল (আরামবাগ)	দামোদরের 'আটচালা' (১৭৬৭)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, কামানসহ সৈনিক
গুপ্তিপাড়া (বলাগড়)	চৈতন্যদেবের জোড়বাংলা (আ ১৬ শতক)	কয়েকটি পদ্মফুল

	রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আ ১৮ শতকের গোড়ার দিক)	দেশীয় প্রমোদতরণী, নাবিক, দরবারগৃহে অভিজাতব্যক্তি, বাদক, নর্তক-স্ব-স্ব কর্মরত
কোটালপুর (জাঙ্গীপাড়া)	(পরিত্যক্ত) আটচালা (১৭৭৪)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, 'ডেকে' অদ্ভুত আকৃতির লোক, নীচে কামান, সৈন্যদের চারদিকে ছোট ছোট নৌকা
গোবিন্দপুর (পূর্ব-জাঙ্গীপাড়া)	পালেদের চণ্ডীর 'আটচালা' (১৭২৭)	দেশীয় প্রমোদতরণী, সভাগৃহ ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি, সশস্ত্র প্রহরী
জঙ্গলপাড়া (পুরশুড়া)	মঙ্গলচণ্ডীর 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের শেষ)	য়ুরোপীয় রণতরী, ডেকে সৈন্য, নীচে কেবিন ও কামান
তারকেশ্বরের 'আটচালা'	(১৭১১ বা ১৭২১ ?)	ঝাম্পানে জমিদারের অন্যত্র গমন এবং বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য
দশঘরা (ধনিয়াখালি)	বিশ্বাসদের গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (১৭২৯)	১৯৩৭ সালের নতুন টালিতে আছে-স্ত্রীলোকের চরকাকাটা, মিথুনদৃশ্য, সপারিষদ ও ভক্তবৃন্দসহ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের নামসংকীর্তন
দ্বারহাট্টা (হরিপাল)	রাজরাজেশ্বরের 'আটচালা' (১৭২৮)	পোর্তুগীজ বা হার্মাদ রণ-তরী, ডেক ও কেবিনের ওপর লোক এবং নীচে কামান - য়ুরোপীয়দের ক্ষুদ্র তরণী, একমাত্র মাস্তুল ও

		দুটি কামানসহ দেশীয় প্রমোদ তরণী, ওপরের কক্ষে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সশস্ত্র প্রহরী
পারুল (আরামবাগ)	রঘুনন্দনের 'আটচালা' (১৭৬৮)	রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী, ফুল-লতাপাতা
পুরুষোত্তমপুর (সিঙ্গুর)	বিশালাক্ষীর আটচালা (১৭৪০)	য়ুরোপীয় রণতরী—ভেতরে সশস্ত্র সৈন্য, নীচে কামান ও সেই সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী-সহ আরও ছোট ছোট নৌকা
প্রসাদপুর (পাণ্ডুয়া)	পালেদের (পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭৬৪)	ফিরিঙ্গী জাহাজ-ডেক ও কেবিন
বদনগঞ্জ (গোঘাট)	শ্রীধরলালজীউর দ্বিতল 'চাঁদনি' (১৮০৬) এবং দামোদরের 'নবরত্ন' (১৮১০)	রাজদরবারের দৃশ্য
বরিজহাটি (চণ্ডীতলা)	মল্লেশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৮ শতকের গোড়া)	জীবজন্তু ও সামাজিক দৃশ্য
বাখরপুর (পুরশুড়া)	ভট্টাচার্যদের 'আটচালা'	রাজদরবার, পশুপক্ষী ও ফুল লতাপাতা
বাঁশবেড়িয়া	অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯)	যুদ্ধদৃশ্য, অশ্বারোহী সৈনিক, নৌদৃশ্য, সমুদ্রযাত্রা, সাধুর নিকট রাজার দীক্ষা-গ্রহণ, ব্যাঘ্র, হরিণ
বাহিরগড় (জাঙ্গীপাড়া)	দামোদরের 'আটচালা' (১৭৪৩)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, ডেকের ওপর লোক, নীচে কামান

বৈঁচিগ্রাম (পাণ্ডুয়া)		এখানে আঠার শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বহু 'টেরাকোটা'মন্দিরে সুন্দর সুন্দর ফলকে নানা সামাজিক দৃশ্য আছে।
ভালিয়া (আরামবাগ)	রঘুনাথের 'আটচালা' (১৭৭২)	বহু 'ডেক'যুক্ত য়ুরোপীয় যুদ্ধ জাহাজ, রাজদরবার, পশুপক্ষী এবং ফুল-লতাপাতা
মামুদপুর (গোঘাট)	রায়েদের বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৬)	দড়াদড়িসহ দেশীয় নৌকা, ওপরে সশস্ত্র সেনা, ডেকের নীচে কেবিনে লোক, জলদস্যুতা বা দাসব্যবসার জন্য জোড়া দেশীয় নৌকা
রাজবলহাট (জাঙ্গীপাড়া)	শ্রীধর-দামোদরের 'আটচালা' (১৭২৪)	এখানে কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ খুবই উল্লেখ-যোগ্য-সশস্ত্র সৈন্য, পশু, ফুল লতাপাতা, রাজদরবার
	রাধাকান্তের 'আটচালা' (১৭৩৩)	বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য
রামনগর (আরামবাগ)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'আটচালা' (১৭৪১)	একজোড়া দেশীয় নৌকা, জলদস্যুতার দৃশ্য
শোণ্ডালুক (পুরশুড়া)	গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৮ শতকের গোড়া)	একজোড়া দেশীয় নৌকা— একটিতে লোকপরিপূর্ণ
শ্রীরামপুর	(পরিত্যক্ত) রাধাবল্লভের 'আটচালা' (আ ১৭ শতক) (পরবর্তীকালে 'হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা')	ফুল, লতাপাতা ও বাতিদান

সাহাগঞ্জ-খামারপাড়া (চুঁচুড়া)	একটি পরিত্যক্ত আটচালা (১৭২৫)	বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য
সুখাড়িয়া (বলাগড়)	আনন্দভৈরবীর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮১৩)	মালাজপরত কৌপিনধারী মোহান্ত, পাশে ভাঙঘোঁটা কৌপিনধারী সন্ন্যাসী, শিবলিঙ্গপূজা, ময়ূরকে খাওয়ানো, ফরসিবিলাসী জমিদার, তরোয়ালধারী অশ্বারোহীর হরিণ শিকার, ঘোড়ার গাড়িতে জমিদারের গমন - সামনে লোকলস্কর, তিনটি হাতীর ওপর হাওদায় পাগড়ীধারী ব্যক্তিবর্গ।
হাটবসন্তপুর (আরামবাগ)	জয়চণ্ডীর আটচালা (১৭৩৭)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, ডেকের ওপর লোক, নীচে কামান

বীরভূম

ঘুরিষা (ইলামবাজার)	দত্তদের গোপাল ও লক্ষ্মী-জনার্দনের 'নবরত্ন' (১৭৩৮)	ফিরিঙ্গী সৈন্য, য়ুরোপীয় বেশভূষায় জনৈকা মহিলা
তারাপুর (তারাপীঠ)	তারামায়ের 'আটচালা' (১৮১৮)	শিকারদৃশ্য, শোভাযাত্রা, যুদ্ধের দৃশ্যাবলী, বলিদানের দৃশ্য
দুবরাজপুর, ময়রাপাড়া	'এয়োদশরত্ন' মন্দির	দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা-সমূহ
	ওঝাপাড়ায় শিবের 'ত্রয়োদশরত্ন'	হাতীর পিঠে শিকারী ও নৌকায় ভ্রমণ

সুরুল (বোলপুর)	দুটি দেউল	য়ুরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিতা নারী, অন্তঃপুরিকা
	পশ্চিমপাড়ার 'দেউল' (১৮৬১)	অশ্বারোহী, গজসিংহমূর্তি, বাতায়নবর্তী সাহেব ও মেম
হেতমপুর (দুবরাজপুর)	চন্দ্রনাথের অষ্টকোণাকৃতি শিবমন্দির (১৮৪৭)	সামাজিক দৃশ্যাবলী, য়ুরোপীয় শৈলীর বিভিন্ন মূর্তি — কবি, জননায়ক,

নদীয়া

কামালপুর (চাকদহ)	জীর্ণ 'আটচালা' (আ ১৮ শতক)	মিথুনদৃশ্য
দিগনগর (কোতোয়ালী)	রাঘবেশ্বরের 'চারচালা' (১৬৬৯)	পালকিতে করে বাবু বা জমিদারের যাত্রা, অশ্বারোহী শিকারী, হাতী ও উটের পিঠে সওয়ার, মিথুনদৃশ্য, হংসপংক্তি, শালভঞ্জিকা, সাধু, সৈনিক
দোগাছি (কোতোয়ালী)	ভগ্ন (চারচালা) মন্দির	মিথুনদৃশ্য, মোহান্ত
বীরনগর (উলা) (রাণাঘাট)	রাধাকৃষ্ণের জোড়বাংলা (১৬৯৪)	সাঙ্গোপাঙ্গসহ পালকিতে 'বাবুর' গমন, নৌকায় প্রমোদ-ভ্রমণ, শিকারদৃশ্য, সৈন্যদল, বাণিজ্যতরী
মাটিয়ারী (কৃষ্ণগঞ্জ)	রুদ্রেশ্বর শিবের 'চারচালা' (১৬৬৫ ?)	বর্মধারী সশস্ত্র বাদশাহী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য ও যুদ্ধদৃশ্য, সাহেবদের ব্যাঘ্র ও হরিণশিকার, প্রাণভয়ে হরিণের পলায়ন,

		সাজসজ্জাযুক্ত হস্তী। বাদশাহী সৈন্যের আধিক্য এখানে লক্ষ্য করা যায়। ফুল লতাপাতার নকশা ও জ্যামিতিক নকশা
রাণাঘাট	(পালচৌধুরী বাড়ির) শিবের দুটি আটচালা	ফুল লতাপাতার নকশা, সামাজিক বিভিন্ন দৃশ্য, প্রতিকৃতি শিবমন্দির
শান্তিপুর (শান্তিপুর)	জলেশ্বরের 'চারচালা' (আ ১৮ শতকের প্রথমদিক)	বন্দুকধারী ফিরিঙ্গী সৈন্য বা সাহেব, তীরন্দাজ ব্যাধ বা শিকারী, বণিক, ঢালসজ্জিত যোদ্ধা বা বীর, মিথুনদৃশ্য
শান্তিপুর	'হাটখোলাপাড়া'য় (মধ্যমগোস্বামীবাড়ি) অদ্বৈতপ্রভুর 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের প্রথমার্ধ)	তীরন্দাজ ব্যাধ ও হরিণ-পালের পলায়নদৃশ্য, শিকারদৃশ্য, ঝাম্পান বা পালকিতে 'বাবু' বা জমি-দারের যাত্রা, ফুল-লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা

সহায়ক গ্রন্থ

Michell, George (ed) : *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত পুরাতত্ত্ব : পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ

রায়, প্রণব (নদীয়ার) পুরাকীর্তি (স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে **'নদীয়া'** গ্রন্থে প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ, প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারি. ১৯৭৩)

গ্রন্থপঞ্জী

কৃত্তিবাস ঃ *রামায়ণ* (গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত), ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং, কলকাতা ১৯৯৪
ঘোষ, বিনয় ঃ *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, ৩য় খণ্ড, ১৯৮০
চক্রবর্তী, দেবকুমার ঃ *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭২
চক্রবর্তী, রতনলাল ঃ *বাংলাদেশের মন্দির*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ঃ *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, ১৯৯০
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার ঃ *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৭১
ঐ ও সুধীররঞ্জন দাস (সম্পাদিত) ঃ *নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পঃ বঃ সরকার ১৯৭৫
বন্দোপাধ্যায়, অমিয়কুমার (সম্পাদিত) ঃ *হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) পঃ বঃ সরকার, ১৯৭৬
ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (দেবলা মিত্র-সম্পাদিত) ঃ *হুগলি জেলার পুরাকীর্তি*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৯৩
মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার ঃ *গৌড়লেখমালা* (তারিখ অজ্ঞাত)
রায়, নীহাররঞ্জন ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
রায়, প্রণব ঃ *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৬
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, মহামহোপাধ্যায় (সং) ঃ *রামচরিতম্* of সন্ধ্যাকরনন্দী
সেন, দীনেশচন্দ্র ঃ *বৃহৎ বঙ্গ*, ২য় খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৩
সেন, সুকুমার ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫

Ahmed Nazimuddin : *Epic Stories in Terracotta depicted on Kantanagar Temple*, Bangla Desh, The University Press limited, Dacca, 1990
Banerjee, Adris : *Temples of Tripura*.1968
Bhattasali, N.K. : *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*
Bose, Nirmal Kumar : *Canons of Orissan Architecture*, 1932
Brown, Percy : *Indian Architecture* (Buddhist and Hindu) Vol. I, 19"1
Do *Indian Architecture* (Islamic Period) 1975
Das, Sudhir RanJan : *Rajbadidanga*, Chiruti, Jadupur, The Asiatic Society, 1968
Deva Krishna : *Temples of North India*. National Book Trust, Second Edition, 1977.
Indian Archaceology 1963-64
M. Abid Ali Khan, Khan Sahib : *Memoris of Gaur and Pandua*, Reprint, 1986
Majumder, N.G. : *Inscriptions of Bengal*, Vol.III
Majumder, R.C. : *History of Mediaeval Bengal*, 1974
Majumder, R.C. :*History of Ancient Bengal*
Mccutchion, David J. : *Late Mediaeval Temples of Bengal*, The Asiatic Society, 1972
Michell, George (ed) : *Brick Temples of Bengal from the Archives of David Mccutchion*, Princeton University Press, New Jersey, 1983
Michell, George : *The Hindu Temple*, London, 1977
Progress Report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle 1914-15

Haque, Julekha : *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bengal Portrayal of a Society,* the Asiatic Society of Bangla Desh, 1980

Watters : *Yuan Chwang,* Vol. II

Articles : প্রবন্ধ

ম্যাককাচ্চন, ডেভিড: 'বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ,' *পশ্চিমবঙ্গ,* ৭ই জুলাই, ১৯৭২

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ ও রায়, প্রণব : ৩৬৮ অব্দের নব আবিষ্কৃত খণ্ডিত মাধবপুর শিলালেখ, *সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা,* ৯৫ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা

Mukherjee, B.N. and Roy, P. : *'Madhavpur Fragmentary Insrciption of the year 368', Indian Museum Bulletin,* Calcutta, 1990

Saraswati, S.K. : Temples of Bengal, *Journal of the Indian Society of Oriental Art,* 1934

Do : Temple Architecture in the Gupta Age, *Journal of the Indian Society of Oriental Art,* Vol. VII, 1940

Sanyal, Hitesh Ranjan : Temple Promotion and Social Mobility (*'History and Society'* - Essays in Honour of Prof. Nihar Ranjan Roy, 1978)

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ও

ক

খ

প

য

র